মানিক

*

জন্মশতবর্ষ সংখ্যা

*

চারুপল্লী (বোলপুর) পাঠচক্রের নিবেদন

প্রকাশক ঃ
শ্রীধর ঘোষ
চারুপল্লী, বোলপুর, বীরভূম
পিন-৭৩১২০৪

প্রথম প্রকাশ–শুভ ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪০০
পূনর্মুদ্রণ–৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৯

মুদ্রাকর
প্রিন্ক প্রিন্টার্স, ইলামবাজার
জেলা - বীরভূম

প্রচ্ছদ : কমল মালাকার
অন্যান্য ছবি অঙ্কনে
শ্রীজয়দেব দাস

মূল্য ৮০ টাকা

কিছু বক্তব্য

এই গ্রন্থের প্রচ্ছদ ছবিটি স্নেহময় গাঙ্গুলীর স্বপ্ন নির্দেশ অনুসারে অঙ্কিত। প্রচ্ছদে দেখানো হয়েছে– জ্যোতির সমুদ্রে নীল রেখাদ্বারা সীমায়িত অঙ্গুষ্ঠবৎ (বুড়ো আঙ্গুলের আকৃতি) ঘন জ্যোতি–দেহস্থ প্রাণশক্তির সংকলন (collection)। আত্মা সাক্ষাৎকারের সময় এরূপ দেখা যায়। এই আত্মাসাক্ষাৎকারীর চিন্ময় রূপ অসংখ্য মানুষের অন্তরে ফুটে ওঠে। তখন বোঝা যায় আত্মা বা ভগবান হল মনুষ্যজাতির প্রাণশক্তির সারীভূত রূপ (collected life power of whole human race)। বেদের ভাষায়, your soul is the inner self of all human beings, মানুষ ব্রহ্ম।

বিভিন্ন স্বপ্নের শেষে প্রদত্ত ব্যাখ্যাগুলি পাঠচক্রে আলোচনা ও সহমতের ভিত্তিতে গৃহীত হয়েছে।

শ্রীজীবনকৃষ্ণের জীবন সম্পর্কে উল্লিখিত কিছু তথ্য তাঁর ঘনিষ্ঠ সঙ্গলাভকারী মানুষদের কাছ থেকে শোনা। কোনও তথ্য স্বকপোল-কল্পিত নয়, বা উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয়।

এই বইয়ের বহুস্থানে শ্রীজীবনকৃষ্ণ বিরচিত 'ধর্ম ও অনুভূতি', শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'শ্রীজীবনকৃষ্ণকথা' ও ত্রৈমাসিক 'মাণিক্য' পত্রিকাগুলি থেকে বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে উদ্ধার চিহ্নের প্রয়োগ করা হয় নি (কখনো বা সূত্র অনুল্লেখিত থেকে গেছে)। তজ্জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট ঋণ স্বীকার করছি।

শ্রীমতী শোভনা চট্টোপাধ্যায় শ্রীজীবনকৃষ্ণের স্বহস্ত লিখিত চিঠিটি ছাপাবার অনুমতি দিয়ে চিরঋণী করেছেন।

আশা রাখি এই গ্রন্থ মনুষ্যজাতির আত্মিক উদ্‌বোধনে ও আত্মজ্ঞান-চর্চায় সহায়ক হবে।

——প্রকাশক

নূতন সংস্করণের ভূমিকা

কবিগুরু বলেছেন–

ভাবো তারে, অন্তরে যে বিরাজে, অন্য কথা ছাড়ো না।

সংসার সংকটে, ত্রাণ নাহি কোনমতে, বিনা তার সাধনা।

তিনি চিরপুরাতন আবার চিরনূতন। প্রায় ত্রিশ বছর আগে বেশ কিছু সাধারণ মানুষের দর্শন-অনুভূতির ডালা সাজিয়ে অন্তর পুরুষের যে অর্ঘ্য মানিক গ্রন্থ রূপে নিবেদিত হয়েছিল আজও তার মূল্য নিঃশেষিত হয়ে যায়নি ভগবৎ প্রেমতৃষাতুর মানুষজনের কাছে। তাই অনেকের আগ্রহ লক্ষ্য করে সেদিনের সেই ছোট্ট নৈবেদ্যই নূতন করে পরিবেশনের উদ্যোগ নেওয়া হ'ল। এখন নূতন তীর্থ জেগে উঠছে, নূতন জ্ঞানের প্রকাশ হচ্ছে - তবু একবার পুরাতনকে ফিরে দেখা অনাবশ্যক বোধ হবে না - আশা করি।

— প্রকাশক

KEEP IN MIND

Mankind aught to be taught that religions are but the varied expression of THE RELIGION which is oneness.

* *

We have to go beyond the intellect. The proof of religion is in direct perception.

...If all the men in the world told it did not exist you would not believe them, because you know that the evidence of your own eyes is superior to that of all the doctrines and documents in the world.

* *

Spiritual knowledge is the only thing that can remove our miseries for ever and other knowledge satisfies wants only for a time. He who gives spiritual knowledge (ব্রহ্মজ্ঞান) is the greatest benefactor of mankind. Next to spiritual help comes intellectual help (বিদ্যাদান), the gift of secular knowledge. This is far higher than the giving of food and clothes (অন্ন বস্ত্র দান)।

—Swami Vivekananda

প্রস্তাবনা

গত বছর জ্যৈষ্ঠ মাসে শ্রীমতী বিশাখা চট্টোপাধ্যায়ের একটি স্বপ্নে শ্রীভগবানের এই ইচ্ছা প্রকাশ পেল যে আগামী ৭ই জ্যৈষ্ঠ হাতে লেখা 'মানিক' পত্রিকা ছাপার হরফে প্রকাশিত হবে। এরপর আরও কয়েকজনের স্বপ্নে সেই ছাপা পত্রিকার প্রকৃতি, তার গুরুত্ব, প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে নানা নির্দেশ এসেছে। স্বপ্ন নির্দেশকে শিরোধার্য করে এই পাঠচক্রে আশ্রিত বহু মানুষের মধ্যে শ্রীভগবানের অভিনব স্বপ্ন লীলার কিছু পরিচয় এখানে তুলে ধরা হল। এই রকম পাঠচক্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে এবং বিদেশেও বহুস্থানে গড়ে উঠেছে। এই পত্রিকায় একটিমাত্র পাঠচক্র সম্পর্কে অবহিত হয়ে চিন্তাশীল পাঠক সহজেই উপলব্ধি করতে পারবেন শ্রীজীবনকৃষ্ণের আবির্ভাবে নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। জানবেন কত মানুষ খুঁজে পেয়েছেন তাদের মনের মানুষকে, চিরজীবনের সম্বললাভ হয়েছে তাদের। বাইরে বহু হলেও আত্মিক জগতে আমরা সকলে এক–এই উপলব্ধির আলোকে জীবনে পরম শান্তির স্পর্শ পাচ্ছে তারা। এতদিন যা ছিল মনীষীদের ঐকান্তিক কামনা আজ তা বিচিত্র পথে কিভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে সেকথা জেনে অনেকেই আনন্দ পাবেন। বহু মানুষের বহু বিচিত্র অনুভূতি থেকে আত্মজিজ্ঞাসুরা খুঁজে পাবেন অনেক প্রশ্নের উত্তর।

এই গ্রন্থে খুব সংক্ষেপে শ্রীজীবনকৃষ্ণের জীবন সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল। ধারাবাহিক সাধন ও তার পরিণতি ও ইতিহাসের পাতা থেকে দেবস্বপ্নের মহিমার উল্লেখ স্বপ্ন সাধনার গুরুত্ব সম্বন্ধে পাঠককে অবহিত হতে সাহায্য করবে। এই পাঠচক্র গড়ে ওঠার ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত করে হাতে লেখা মানিক পত্রিকা থেকে কিছু স্বপ্নলব্ধ শিক্ষা ও শ্রীজীবনকৃষ্ণ সম্বন্ধে কিছু স্মৃতিকথা পরিবেশন করা হ'ল।

শতবর্ষের আলোয় শ্রীজীবনকৃষ্ণের আবির্ভাবের তাৎপর্য বিশেষভাবে অনুধাবন করার প্রয়োজন আছে। আজ থেকে একশ বছর আগে শ্রীজীবনকৃষ্ণের জন্মলাভের অব্যবহিত পরেই (দশদিন পর) স্বামী বিবেকানন্দ সমুদ্র পাড়ি দিলেন আমেরিকার উদ্দেশ্যে। সেখানে চিকাগো ধর্ম মহাসভায় বক্তৃতা দিয়ে বিশ্বভ্রাতৃত্বের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করলেন বিশ্ববাসীকে। সমগ্র বিশ্বে মানুষের ধর্মচেতনায় এল এক নতুন প্রবাহ। সে বছরই কবিগুরু লিখলেন–'এবার ফিরাও মোরে'। উপলব্ধি করলেন–'আগুন লেগেছে

কোথা! কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি জাগাতে জগৎ-জনে!' আশা প্রকাশ করলেন– হয়ত ঘুচিবে দুঃখনিশা, তৃপ্ত হবে এক প্রেমে জীবনের সর্বপ্রেমতৃষা॥' স্বামীজিও পরবর্তীকালে বললেন, বিশ্বভ্রাতৃত্ব নয়, বিশ্বএকত্বই বেদান্তের মূলকথা- 'Vedanta formulates not universal brotherhood but universal oneness (C.W. Vol. VIII) ...আমরা ইচ্ছা করি বা না করি আমরা যে একত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছি তাহা একদিন না একদিন প্রকাশিত হইবে।' জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে আবালবৃদ্ধবণিতার অন্তরে শ্রীজীবনকৃষ্ণের রূপ ফুটে উঠে সেই একত্বের প্রকাশ ঘটল জগতে। স্বামীজির ভবিষ্যৎবাণী সত্য হ'ল।

স্বামীজির কথায়–সকল মানুষের মধ্যে point of union এবং সকল ধর্মের মধ্যে point of harmony হিসাবে আমরা পেয়েছি একজন মানুষকে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—তিনি সর্বজনীন সর্বকালীন মানব। সেই মানবের উপলব্ধিতেই মানুষ আপন জীবসীমা অতিক্রম করে মানবসীমায় উত্তীর্ণ হয়। সেই মানবকেই মানুষ নানা নামে পূজা করেছে। সকল মানবের ঐক্যের মধ্যে নিজের বিচ্ছিন্নতাকে পেরিয়ে তাকে পাবে আশা করে তার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানিয়েছে- স দেবঃ স নো বুদ্ধা শুভয়া সংযুনক্তু।

এই পত্রিকা ভগবৎচর্চার অনুশীলনের সহায়ক হোক, হতাশ প্রাণে নতুন আশা সঞ্চার করুক, আরও বেশী সংখ্যক মানুষের অন্তরে শ্রীজীবনকৃষ্ণের প্রকাশ হোক- বর্ষিত হোক শান্তির বারি।

——— : ———

'উৎসর্গ'
('মানিক' প্রথম সংখ্যা থেকে)

হে জীবনকৃষ্ণ, আজ ৭ই জ্যৈষ্ঠ তোমার আবির্ভাবকে স্মরণ করার পবিত্রদিন, ধর্মজগতে নানামতের কুহেলিকায় নানাপথের বেড়াজালে সাধারণ মানুষ যখন দিগ্‌ভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট, বৈধী ক্রিয়াকর্ম যখন প্রাণহীন নিয়মরক্ষার নামান্তর, পূজাপার্বণের উপলক্ষ্য যখন চিত্ত বিনোদন, বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রভাবে প্রচলিত ধর্মের ভিত্তি যখন শিথিল তখন ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই তোমার অভ্যুদয়। মানুষের হৃদয়বীণায় তুমি বাজালে নতুন রাগিণী। এক মত এক পথ। "মানুষের দেহটি একটিমাত্র পথ, আর তিনি কৃপা করে সেই মানুষদেহে প্রকাশ পান এই হল মত। এক মত এক পথ—মানুষের দেহে শ্রীভগবানের প্রকাশ।"

তুমি সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম। হে অন্তর্যামী, তোমার আবির্ভাবে ধর্মজীবনের নতুন পথ আলোকিত হয়েছে। মানুষের অন্তরে, হৃদয় মন্দিরে উদ্ভাসিত হয়ে তুমি আমাদের বহির্মুখী মনকে অন্তর্মুখী করেছ। স্বপ্নলীলার বৈচিত্রময় অনুভূতিতে আমরা পেয়েছি ধর্ম জীবনের অমৃত আস্বাদন, ধন্য হয়েছে আমাদের মানবজীবন। তোমার অমৃতবাণী অনুধ্যান করে আমরা পেয়েছি নবজীবনের সঞ্জীবনী সুধা। তুমি তন্ত্রমন্ত্রের অতীত, ক্রিয়াকর্মের ঊর্ধ্বে। তুমি স্বয়ম্ভু, তুমি স্বয়ং প্রকাশ। আজ এই শুভদিনে তোমাকে জানাই আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি।

তুমি মানুষের কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করোনি। জগত থেকে যা কিছু পেয়েছো অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছো জগতে। ধূলার ধরণী শক্তিময়ী হয়েছে তোমার তেজে। তুমি যে লীলাকুসুম প্রস্ফুটিত করেছ আমাদের হৃদয়কাননে তারই মালা গেঁথে তোমার উদ্দেশ্যে নিবেদন করলাম। তুমি কৃপা করে গ্রহণ কর।

তোমার কৃপাধন্য

৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯১ **পাঠচক্রের আশ্রিতগণ**

নিবেদন

('মানিক' সপ্তদশ সংখ্যা থেকে)

"শ্রীজীবনকৃষ্ণ! সহজ, সাধারণ, আদর্শে অটল নিখুঁত এক জীবন। তাঁর আদর্শ জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিকগুলি হল অপরিগ্রহ, নারীসঙ্গবর্জন এবং কাজের বাইরে সমস্ত সময়টুকু ভগবৎচর্চা করে কাটানো। ভগবৎচর্চার পদ্ধতিও ছিল অতি সরল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ ও যৌগিক ব্যাখ্যা আলোচনা, কিছু সময় ধ্যান আর বিভিন্ন মানুষের দেবস্বপ্ন বিশ্লেষণ করে ভগবৎমহিমার প্রকাশ। দিনের মধ্যে ৮/১০ ঘন্টা কথামৃত পাঠ করেও তাঁর আশ মিটত না। তবে জপতপ পুজো আর্চার কোন বালাই তাঁর ছিল না। সন্ন্যাসী নারীর অন্তরে থাকবে, দুই অর্থে-ই শ্রীরামকৃষ্ণের এই বাণী তাঁর জীবনে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। ঘরে বসেই মেয়েরা তাঁকে অন্তরে দর্শন করতেন কিন্তু তাঁর কাছে আসা নিষেধ ছিল। এমনকি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়াদের ক্ষেত্রেও এ নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হয়নি। আর অপরিগ্রহের ক্ষেত্রেও যে দৃষ্টান্ত গড়ে উঠেছিল তাঁর জীবনে তার দ্বিতীয় নজির খুঁজে পাওয়া যায় না বিশ্বের কোথাও। অন্যের কাছ থেকে সামান্য পাখার হাওয়াটুকুও তিনি গ্রহণ করতে পারতেন না। টাকা পয়সা তো দূরের কথা। একদিন একজনের দেশলাইয়ের কাঠি নিয়ে কান খুঁটছেন, অমনি শ্রীরামকৃষ্ণের কন্ঠে দৈববানী শুনলেন, 'অন্যের জিনিস নিয়েছিস কেন ? এক্ষুণি ফিরিয়ে দে।'

মহামানবের জীবনের সবদিক তুলে ধরার সামর্থ্য ও সুযোগ নেই আমাদের। এক কথায় বলতে পারি তাঁর মহিমান্বিত জীবনের বৈশিষ্ট্যটি হল জীবনের সকল প্রকার আনন্দের আকর্ষণকে অগ্রাহ্য করে পরিপূর্ণ আনন্দের প্রকাশ যে আত্মায় সেই আত্মজ্ঞান চর্চায় বা ভগবৎচর্চার মধ্য দিয়ে সমস্ত সময় (পেট চলার মত রোজগার করার পর বাকী সময়) অতিবাহিত করা এবং ভিতর থেকে আপনা থেকে জেগে ওঠা বিশিষ্ট গুণাবলী (অপরিগ্রহ ইত্যাদি) অবলম্বনে জীবন পরিচালনা করা।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, যার মন প্রাণ ঈশ্বরে গত হয়েছে তিনিই সাধু। এই সাধু জীবনের আদর্শ হিসাবে আমরা পেয়েছি শ্রীজীবনকৃষ্ণের জীবন। যিনি সৎপথে খেটে খেয়েছেন, খাওয়া দাওয়া পোষাকে আশাকে আর পাঁচজনের চেয়ে আলাদা নন। বিবিদিষার কাঠিন্য বর্জিত অতি সাদাসিধে যাঁর সাধন জীবন। শ্রীভগবান যাঁর একমাত্র কাম্য এবং যার কাছে জাগতিক সকলপ্রকার ভোগের আয়োজন ছিল আকর্ষণ শূন্য। এই অভিনব (new) মানুষ শ্রীজীবনকৃষ্ণ একদিন দৈববাণী শুনলেন, 'আদর্শবাদের ফল ফলবে'।

আদর্শ জীবন হল সেই জীবন যা সকল কালে, সকল অবস্থায় মানুষকে মহৎ

জীবনের পথটি দেখিয়ে দেয়, তাকে শ্রেষ্ঠতা দান করে। আর এখানেই শ্রীজীবনকৃষ্ণের সঙ্গে অপর সকল আচার্য পুরুষের পার্থক্য। স্থূলদেহের অবসানের পরও শ্রীজীবনকৃষ্ণ সাধারণ মানুষের অন্তরে রূপ ধারণ করে ফুটে উঠে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে উদ্ভূত নিত্যনূতন সমস্যার সমাধান নির্দেশ করেন, মানুষ জানতে পারে তার কর্তব্য। সকল কালে জীবনের সকল ক্ষেত্রে কর্তব্যের ইঙ্গিত ও অনুপ্রেরণা দান করতে এবং জীবনসত্যকে ধরিয়ে দিতে পারেন যে মানুষ তিনিই প্রকৃত অর্থে আদর্শ মানুষ।

শ্রীরামকৃষ্ণ কামিনীকাঞ্চন ত্যাগের আদর্শের কথা বললেন। সংসারী হয়ে নিজের জীবনে তার সংশোধিত রূপটি দেখাবার চেষ্টা করলেন যা সম্পূর্ণতা পেল জীবনকৃষ্ণে এসে। সচ্চিদানন্দগুরু লাভে তাঁর কৃপায় আপনা হতে ত্যাগের আদর্শ এবং জগতের মানুষের সঙ্গে একত্বের উপলব্ধিতে, প্রত্যেকেই পরম এক ব্রহ্মের এক একটি রূপ – এই বোধে তাদেরকে অন্তরে গ্রহণের আদর্শ ফুটে উঠল তাঁর জীবনে। জগতের সকল মানুষই আমার গুরু, তাদের স্বপ্ন থেকে শিক্ষা নিতে হবে–জগতগুরু সম্পর্কে এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য তাঁর জীবনচর্যায় ঘটেছে ক্রমাগত পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের ভিত্তিটি না বুঝলে, আদর্শ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার পথে তাঁর ধাপে ধাপে উত্তরণকে কারো কারো স্ববিরোধ বলে মনে হতে পারে।

প্রথমদিকে তিনি কুমার ভক্তদের বেশী মেলানি দিতেন কিন্তু বিবাহিত ভক্তদের সঙ্গে কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখতেন। ক্রমে বিচিত্র সব দর্শন অনুভূতির মধ্য দিয়ে সকলের এক স্বরূপত্ব প্রকাশ হতে থাকল, তিনিও তাঁর ঘরে বিবাহিত ও অবিবাহিত ভক্তদের মধ্যে ভেদরেখাটুকু মুছে দিলেন। কিছুদিন সকলের প্রণাম গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু পরে প্রণাম নেওয়া তুলে দিলেন। উল্টে যারা তাঁর কাছে আসত, নিবেদন করত তাদের দেবস্বপ্নের কথা–উনি তাদের উদ্দেশ্যে বলতেন, 'প্রণাম হই বাবা, তোরা আমাকে শিক্ষা দিলি, তোরাই আমার গুরু।' স্বপ্নে একজন তাঁর পা পূজা করার নির্দেশ পেয়েছিল। উনি শুনে বললেন, 'আমি যদি তা করতে দিই তাহলে আমার গতি রুদ্ধ হয়ে যাবে।' আত্মিক অগ্রগতি বজায় রাখতে হেলায় অগ্রাহ্য করেছেন নাম-যশ লাভের নানান দৈব নির্দেশও। পরিণতিতে তাঁর আত্মিক অবস্থা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছাল যে তাঁর রূপ ফুটে উঠতে লাগল জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষের অন্তরে। কালে তাদের আত্মিক ও ব্যবহারিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, ব্যক্তি বিশেষের স্বতন্ত্র গুণমানের উৎকর্ষতা ঘটিয়ে, তাদের ঈশ্বরমুখী প্রকৃতির পুষ্টিবিধান করে ও এই প্রকৃতিকে অবলম্বন করে তারই আনুকূল্যে মানুষকে মহত্বলাভের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগলেন। বহু মানুষের মধ্যে তাঁর এই বহু বিচিত্রভাবে স্বতঃস্ফূরণ ও পরিবর্তন ঘটানোর বিরুদ্ধে কোন

কিছুই বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াতে পারে নি। যে তাঁর কথা শোনেনি, তাঁর সম্পর্কে কোন আগ্রহই নেই যার সেও দেখছে তাঁকে।

১৩০০ সালের ৭ই জ্যৈষ্ঠ জগতে শ্রীজীবনকৃষ্ণের আবির্ভাবে মানব কল্যাণের যে বীজ উপ্ত হয়েছিল কালে তা অঙ্কুরিত হয়ে পল্লবিত হয়েছে। বর্তমানে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে পরিণতির পথে তার নয়া পদক্ষেপ উপলব্ধি করে মানুষ নতুন আশায় উজ্জীবিত হোক। আর এই কাজের সহায়ক রূপে মানিক পত্রিকা তাঁর আশীর্বাদ লাভে সার্থক হোক, ধন্য হোক। সকল মানুষের হৃদয়সমুদ্রতলে অদৃশ্য চিরকালের মানুষটি বিচিত্রভাবে মঙ্গলজ্যোতিতে বিশ্বভুবনের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে দৃশ্যমান হয়ে উঠুক—এই প্রার্থনা।"

বিনীত

৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৯ **চারুপল্লী (বোলপুর) পাঠচক্রের আশ্রিতগণ**

সূচীপত্র

মহাজীবন পরিচয় ১৩
ধারাবাহিক সাধনের ক্রম ২১
প্রতীকতত্ত্ব ও যৌগিক রূপ ২৬
স্বপ্ন মহিমা ২৮
পাঠচক্রের ইতিহাস ৩৫
বহুরূপে
- মধুময় ৪৫
- এই আলোকে ৪৬
- জন্মান্তর ৪৮
- তাঁরে চিনি গো চিনি ৫০
- তাঁরি প্রেমে ৫১
- পরিপূর্ণ ৫২
- প্রণমি তাঁহারে ৫৩
- অন্তরের পথে ৫৪
- এগিয়ে চল ৫৬
- দাবী পূরণ ৫৭
- দ্বিজ ৫৭
- কৃপাহি কেবলম্ ৫৯
- ভয় নাই ৬০
- মানিক এসেছে ৬১
- মহাসিন্ধুসম ৬২
- অঙ্গুষ্ঠবৎ ৬৩
- জগদ্‌গুরু ৬৪
- দাও পরিচয় ৬৫
- কর পার ৬৬
- পিপাসিত আমি ৬৮
- ভখিব গরল ৬৯
- সবারে জানাই ৭০

পরম আশ্রয়
- মণিহার ৭৩
- আশ্রিতা ৭৫
- পরম ধন ৭৭
- শান্তিদাতা ৭৯
- পরিবর্তন ৮০
- তুমি দেখাও যবে ৮৩

নব পরিচয়
- ওঙ্কার ৮৭
- জীবনমুক্তি ৮৯
- শ্রীকৃষ্ণের জন্মরহস্য ৯৩

নবীনা
- প্রথম দর্শন ৯৯
- ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ১০০
- কী শোনাব ১০১
- কৃপার স্বরূপ ১০২
- জীবনদীপ ১০৩
- সাধের লাউ ১০৪
- দশাঙ্গুলম্ ১০৫
- বুদ্‌বুদ্ ১০৫
- রাধাযন্ত্র ১০৬
- ভক্তি-বিবেক ১০৭
- পূর্ণাৎ পূর্ণম্ ১০৮

শ্রদ্ধাঞ্জলি
- শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় স্মরণে ১১১
- শ্রীসুধাংশুভূষণ দাস স্মরণে ১১৭
- শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত স্মরণে ১২০

স্মৃতি চয়ন ১২২

মহাজীবন পরিচয়

বাংলা সন ১৩০০ সালের (ইংরাজী ১৮৯৩) ৭ই জ্যৈষ্ঠ হাওড়া জেলার আমতায় মাতামহের কর্মস্থলে জন্ম নিয়েছিলেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ। তাঁর আদি পৈতৃক বাসস্থান ছিল খিদিরপুরের মুন্সীগঞ্জে। মা অন্নপূর্ণা দেবীর সূতিকা জ্বর হওয়ায় আঁতুর ঘরেই হল মায়ের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি। কিছুকাল পরেই তিনি মাতৃহারা হন। তাঁর মাসীমায়েরও ঐ সময় একটি সন্তান হয়ে মারা যায়। ঐ মাসীর দুধ খেয়েই তিনি মানুষ। শৈশবেই হারান পিতা সুরেন্দ্রনাথকে। গড়পাড়ে দাদু-দিদিমার কাছে লালিত-পালিত হন। ছোটবেলায় লিভারের দোষ হওয়ায় শরীর খুব খারাপ হয়ে যায়। ভর্তি হন বিষ্টু ঘোষের আখড়ায়। বয়স তখন প্রায় এগারো। ব্যায়াম করে চেহারা ফিরে গেল। যৌবনে উনি যখন প্যারালাল বারে উঠে ব্যায়াম করতেন তখন লোক দাঁড়িয়ে যেত দেখবার জন্য। খেতেও পারতেন খুব। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কোন সংস্কার ছিল না, তবে বাজারের সেরা জিনিসটি ছিল তাঁর পছন্দ। বড় বড় কৈ মাছ খুব ভালবাসতেন। খুব করে মাছ মাংস পেঁয়াজ ইত্যাদি খেতেন। বহু পরে, প্রৌঢ়ত্বে উত্তরণের পর, একদিন স্বপ্নে শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁকে বলেছিলেন, 'এত গরম জিনিস খাস কেন ?' তখন থেকে মাছ মাংস ইত্যাদি খাওয়া খুব কমিয়ে দিয়েছিলেন।

ছোট থেকেই তিনি একটু ভিন্ন প্রকৃতির ছিলেন। ছেলেরা সকলেই তাঁকে এত সৎ ও নিরপেক্ষ বলে জানত যে নিজেদের মধ্যে কোন ঝামেলা হলে তাঁর কাছে আসত বিচার চাইতে। কোন বিশেষ পক্ষ অবলম্বন করে খেলাধূলা করায় তাঁর আগ্রহ ছিল না। তবে সকলের অনুরোধে বুড়ি ছোঁয়া খেলায় বুড়ি হতে সম্মত হতেন। বড় হয়েও তিনি বলতেন, 'ঠাকুর, আমি কোন দলের নই। আমি তোমার, তুমি আমায় তোমার করে নাও। দল যদি থাকে তো আমি তোমার দলে।'

শিশুকাল থেকেই তাঁর ছিল অপরিগ্রহ। তিনি তখন স্কুলের ছাত্র, কাপড় পরে স্কুলে যেতে হত। টিফিনের জন্য এক পয়সা বেঁধে দেওয়া থাকত কাপড়ের খুঁটে। উনি কাপড়ে গিঁট বাঁধতে পারতেন না। স্কুলে যেদিন কাপড় খুলে যেত, বন্ধুদের কাউকে বেঁধে দিতে বলতেন। তাকে সেদিন নিজের টিফিনের পয়সাটুকু দিয়ে দিতেন। কারও কাছ থেকে কখনও কোন প্রকার সেবা নিতে পারতেন না, টাকা পয়সা তো দূরের কথা।

তিনি ছিলেন পিতামাতার একমাত্র সন্তান। কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর প্রাপ্য কোন কিছুই গ্রহণ করেন নি। নিজের উপার্জিত অর্থেই জীবন কাটিয়েছেন। টিউশনি করেছেন। উচ্চশিক্ষা শেষ করে হাওড়া জেলার আমতার কাছে নারিটে মহেশ ন্যায়রত্ন ইনষ্টিটিউশনে তিনি প্রায় এক বছর শিক্ষকতা করেন। প্রথম মহাযুদ্ধে তিনি মিলিটারীতে

চাকরী নেন। তাঁকে মেসোপটেমিয়া (ইরাক) যেতে হয়। এই সময়ে তাঁর উপার্জিত অর্থে কিছু সঞ্চয়ের ভাণ্ডার গড়ে উঠল। চাকরী যখন শেষ হল ওই সঞ্চিত অর্থে তিনি বিলাত গেলেন স্যানিটরী ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে। বৎসরাধিক কাল বিলাতে থেকে তিনি দেশে ফিরলেন ১৯২২ সালে। এবার তাঁর চাকরী হল কলকাতা কর্পোরেশনে। কিন্তু উপযুক্ত পদ খালি না থাকায় খুব নীচের পোস্টে কাজ নেন। কাজ ছিল কারো বারান্দা বা সাইনবোর্ড ফুটপাথে ঢুকে গেলে তার নামে কর্পোরেশনে রিপোর্ট করা। এই সময় কিছুদিন তিনি একটা ছোটখাটো ব্যবসা করেছিলেন এক বন্ধুর (বসন্ত চৌধুরীর) সাথে যৌথভাবে। পরে সেই বন্ধু কারবার ছেড়ে দিলে তিনি একাই কয়েকমাস ব্যবসা চালান। যেহেতু বন্ধু লিখিত-পড়িতভাবে কারবার ছাড়েনি তাই এ ক'মাসের লভ্যাংশের প্রাপ্য টাকা বন্ধুকে নিতে অনুরোধ করেন। বন্ধুটি টাকা নিতে অস্বীকার করলে উকিলের চিঠি পাঠিয়ে তাকে ঐ টাকা নিতে বাধ্য করেন। অবশ্য তৃতীয় এক বন্ধু বিষ্টু ভট্টাচার্য্য মধ্যস্থতা করেছিলেন। চাকরীতে ওনার প্রমোশন হল বেশ দেরীতে। বদলি হলেন রেলওয়ে ট্রাফিকে, সেখানেও দীর্ঘকাল অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে ছিলেন। শেষমেশ একটা ভাল পোস্ট পেলেন। অবসর গ্রহণ করলেন ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুন।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে ছিল ওনার খুব নজর। রুমালটি পর্যন্ত পরিপাটি করে ভাঁজ করে রাখতেন। কিন্তু কোনপ্রকার বিলাসিতা তাঁর ছিল না। গার্জেন হিসাবে ছিলেন খুব কড়া। ভাইপোদের পড়াশুনোর উপর খুব লক্ষ্য রাখতেন। মাঝে মাঝে ডেকে পড়া ধরতেন, নিজের কাছে বসিয়ে পড়াতেন। ইংরাজী ভাষায় তাঁর দক্ষতা ছিল অসামান্য। ছেলেদেরও ইংরাজী ও অঙ্ক শেখার উপর জোর দিতেন। তিনি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পল্লীসমাজ' বইটির ইংরাজী অনুবাদ করে দিয়েছিলেন। শরৎবাবু খুব প্রশংসা করেছিলেন। নিজেও কিছু কিছু নাটক লিখেছিলেন। তাঁর লেখা নাটক 'যুগধর্ম' কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছিল। পরে সেসব পাণ্ডুলিপির আর খোঁজ রাখেন নি। বর্তমানে 'বোধিসত্ত্ব' নামে একটি মাত্র নাটকের পাণ্ডুলিপি আছে।

ব্যবহারিক জীবনে তাঁকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। থাকতেন মাসতুতো ভাই মানিকলাল বসুর বাড়ীতে পৃথক একখানি ঘর ভাড়া নিয়ে। তাঁর ঘরে বৈদ্যুতিক পাখা ছিল না। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমে হাতপাখা ব্যবহার করতেন। ঘর সংলগ্ন সরু এক ফালি বারান্দা। সেই বারান্দার বাল্বটাও খুলে নিয়েছিলেন মানিকবাবু, ইলেকট্রিক বিল বেশী হবে এই যুক্তিতে। ওনার ঘরে বহু মানুষ আসত। তারা ঐ বারান্দায় চটি খুলে রাখত। আলো না থাকলে নিজের নিজের চটি জুতো খুঁজে পাওয়ার অসুবিধা, তাই উনি বলে বুঝিয়ে পরে আবার বারান্দার বাল্বটা লাগানো করিয়েছিলেন। জ্বর হলে একবারমাত্র সাবু দেওয়া হত। দ্বিতীয়বার প্রয়োজন হলে আর সাবুতে চিনি দেওয়া হত না। বরাদ্দ

নাকি শেষ-হাসতে হাসতে একদিন বলেছিলেন। পিঠে কার্বঙ্কল ঘা হল। সেঁক দেবার জন্য গরম জল পেতেন না বাড়ী থেকে। অবশ্য উনি চাইতেনও না। পাঁচতরকারি দিয়ে ভাত খাওয়ার অভ্যাস ছিল। তাই খাওয়ার জন্য পয়সা দেওয়া ছাড়াও প্রায় দিনই নিজেই বাজার করে এনে দিতেন। ওনার যখন ৪৪ বছর বয়স তখন ওনার মাসীমা মারা যান। তখন থেকেই উনি খাওয়া কমিয়ে দেন। অবশ্য মানিকবাবুর স্ত্রী ওনার পছন্দসই নানারকম তরকারী রেঁধে খেতে দিতেন। অবসর গ্রহণের পর ঘরে ভক্ত সমাগম বেশী হতে থাকলে রাত্রেও অধিকক্ষণ পর্যন্ত ঈশ্বরীয় আলোচনা হত। পাঠ আলোচনা শেষ করে খেতে দেরী হত। ভাত বেড়ে রেখে দেওয়া হত। খাবার সময় তা ঠাণ্ডা হয়ে পিঁপড়ে ধরে যেত। কয়েকদিন পরপর এ ঘটনা লক্ষ্য করে রাত্রে খাওয়াই তুলে দিলেন।

বর্তমানে ঐ পরিবারের সকলেই শ্রীজীবনকৃষ্ণকে প্রচণ্ড ভক্তি করেন; কিন্তু তাঁর দেহ থাকতে তাঁকে সেভাবে চিনতে পারেন নি। প্রতি শনিবার বিকেলে তাঁর ঘরে রামনাম গান হত। এই নিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে অনেকবার কথা কাটাকাটি হয়েছিল। ভাইয়ের বক্তব্য ছিল এতে ছেলেদের লেখাপড়ার ক্ষতি হচ্ছে। কিছুদিন পর অবশ্য তিনি নিজে থেকেই ঘরে গান বাজনা বন্ধ করে দেন, তবে তা অন্য কারণে। তিনি উপলব্ধি করলেন গানও একপ্রকার সাত্ত্বিক ভোগ।

চাকরী থেকে অবসর গ্রহণের পর তাঁর ঘরে নিত্য ৭০/৮০ জন লোক আসত। একদল যায় তো আর একদল আসে—সারাদিনই ঘর ভর্তি। ঘন্টার পর ঘন্টা তারা পাঠ শোনে। অতগুলি লোক গলি রাস্তার ওপাশে সরু ড্রেনে প্রস্রাব করত। ড্রেন সংলগ্ন বাড়ীর মালিক অমূল্য রায় প্রাচীরের বাইরের দেওয়ালে ঘুঁটে দেওয়াতেন। তা থেকে দুর্গন্ধ ছড়াত। আবার ইচ্ছা করে উনুন ধরাতে দিতেন এমন জায়গায় যাতে কয়লার ধোঁয়া ঢোকে জীবনকৃষ্ণের ঘরে। একদিন বিকেলে উনুনের ধোঁয়ায় ওনার ঘর ভর্তি হয়ে গেলে এত লোকের কষ্ট হচ্ছে দেখে জীবনকৃষ্ণ অস্থির হয়ে উঠলেন। নিজেই উঠে গিয়ে রায়মশাইকে দু'চার কথা বলতেই, ভদ্রলোক হঠাৎ ছুটে এসে জীবনকৃষ্ণের বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল মচ্‌কে দিলেন। পরক্ষণে ভয় পেয়ে ছুটে পালালেন। ওনার নামে থানায় ডায়েরী করা হল। কিন্তু কয়েকদিন পর এক সকালে আশ্চর্য এক ঘটনা ঘটল। সেই ভদ্রলোক এসে ওনার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে বললেন, 'জগাই মাধাই উদ্ধার হয়েছিল আর আমি কি উদ্ধার পাব না ?' এই বলে কেঁদে জীবনকৃষ্ণের পা জড়িয়ে ধরলেন। উনি অমনি তাকে জড়িয়ে ধরে বুকে তুলে নিলেন। বললেন, 'আপনার স্থান ওখানে নয়, আপনার স্থান আমার বুকে। আমিই জগাই, আমিই মাধাই! কাকে উদ্ধার করব ?' এরপর থেকে যতদিন বেঁচেছিলেন রায়মশাই প্রতিদিন জীবনকৃষ্ণের ঘরে এসে এককোণে

চুপ করে বসে পাঠ শুনতেন। তবে বুড়ো আঙুলের ব্যথা কিন্তু অনেকদিন ছিল।

প্রথমদিকে তিনি মঠে খুব যাতায়াত করতেন। সাধুসেবার জন্য সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন চ্যাংড়া ভর্তি ফলমূল। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন বুঝলেন মঠের মহারাজদের দর্শন অনুভূতি নেই তখন মঠে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন। এই সময় অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু আগে তিনি মাঝে মাঝে মাসীর বাড়ী উলুবেড়িয়ার কাছে আলপুকুরে গিয়ে থাকতেন। ঠিক করলেন সেখানে একটি ধ্যান ঘর করবেন। কিন্তু স্বপ্নে দেখলেন--একটি ছেলে বলছে, 'প্রপার্টি' (সম্পত্তি)—আর অন্য একটি ছেলে মানে বলছে 'অষ্টপাশ'। ঘুম ভাঙলে ভেবে দেখলেন, তিনি যে ধ্যান ঘর করতে যাচ্ছেন সে তো সম্পত্তিই করা হবে। অমনি ধ্যান ঘরের পরিকল্পনা ত্যাগ করলেন।

তাঁর দেহে স্থুলে কুণ্ডলিনী জাগরণ অন্যেরা চাক্ষুষ করে বিস্মিত হত। মুহুর্মুহু সমাধি ও নানাপ্রকার যোগৈশ্বর্যের প্রকাশ ঘটত তাঁর দেহে যার কোন নজির খুঁজে পাওয়া যায় না কোথাও। কিশোর বয়স থেকেই তাঁর দেহে রাগানুগা ভক্তির চিহ্ন ফুটে উঠত। প্রতি লোমকূপে রক্ত জমে ঘামাচির মত ফুলে উঠত। ফলে সমস্ত দেহটা লাল হয়ে উঠত। রাস্তার লোক দেখলে বলত, 'বাবা! যেন একটা রক্তের চাঁই যাচ্ছে।' বড় বয়সেও মধুর রসের গান শ্রবণে ঐরূপ লক্ষণ প্রকাশ পেত। নানা প্রকার কুণ্ডলিনী জাগরণ, সমাধি ও যোগের নানা অবস্থা (নাদভেদের লক্ষণ, অর্ধবাহ্যদশা, সচ্চিদানন্দ অবস্থা ইত্যাদি) শ্রবণমাত্র, স্মরণ-মনন মাত্র তাঁর দেহে প্রকাশ পেত। তাঁর দেহ ছিল এতই পবিত্র যে সামান্য 'কাম' কথাটা উচ্চারণ করা মাত্র সমাধিস্থ হয়ে যেতেন। ঐ শব্দ উচ্চারণে দেহে যে মালিন্য সৃষ্টি হত সমাধির ফলে তা দূরীভূত হয়ে দেহের পবিত্রতা রক্ষা পেত। মনকে সহস্রার থেকে নামিয়ে আনার জন্য জাগতিক বিষয়ের অবতারণার প্রয়োজন হত। তাই দীর্ঘক্ষণ উচ্চস্তরের ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ হতে হতে হঠাৎ করে বলতে শুরু করতেন সেদিন কী কী তরকারী দিয়ে ভাত খাবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি নস্যি নিতেন। অন্য কোনপ্রকার নেশা তাঁর ছিল না।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ বিবাহ করেন নি। তাঁর দেহের গঠনই এমন ছিল যে মেয়েছেলে কাছে এলে চোখে জাল পড়ে যেত – ঝাপসা দেখতেন অথবা সমাধিস্থ হয়ে যেতেন–যার তুলনা পাওয়া যায় একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'মেয়েমানুষ ছুঁলে আমার গায়ে সিঙ্গি মাছের কাঁটা বেঁধার মত যন্ত্রণা হয়। ...মায়েরা আমাকে দূর থেকে প্রণাম কোরো।' শ্রীজীবনকৃষ্ণ তাঁর মাসতুতো ভাইয়ের আট বছরের মেয়েটির সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলেছেন, অমনি রাত্রে স্বপ্নে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে তিরস্কারের সুরে বললেন, 'তুই মেয়েদের সঙ্গে কথা কস ?' ঠাকুর তাঁর জীবনকে এমনি সংযমের বাঁধনে বেঁধে রেখেছিলেন। তিনি বলতেন তাঁকে বিয়ের হাওয়া গায়ে লাগাতে নেই। তাই

বাড়ীতে বিয়ে থা লাগলে সাতদিন আগে কোথাও চলে যেতেন আর ফিরতেন অষ্টমঙ্গলার পর। তিনি বেশ কয়েকবার কাশী বেড়াতে গিয়েছিলেন। ১৯৬২তে পূরী। এগারো মাস পরে পূরী থেকে ফিরে শ্রীরামপুরে এসে উঠলেন। কয়েকজন অনুরাগীকে নিয়ে সেখানে মেস করে থাকতে লাগলেন। রবিবার ও অন্যান্য ছুটীর দিনে কলকাতা ও আশপাশ থেকে চাকুরীজীবি অনেক ভক্ত তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেত। অনেকে সেখানে একবেলা খেত। উনি তখন অবসরপ্রাপ্ত। এক রবিবার বিমলবাবু নামে একজন অনুরাগী ভক্তসেবার উদ্দেশ্যে চল্লিশ টাকা দান করেছিল মেস ফাণ্ডে। একথা উনি জানতেন না। পরদিন সকালে হঠাৎ শ্রীজীবনকৃষ্ণ গম্ভীর কন্ঠে হিসাবরক্ষক শ্রীরঘুনাথ সেনকে ডেকে হিসাবের খাতা দেখতে চাইলেন। খাতা দেখে উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'একটা মিল খেয়ে এত টাকা দিয়েছে কেন ? দয়া করেছে নাকি ? তোরাই বা নিলি কেন ? লোকের দানের অন্নে আমায় বাঁচতে হবে ? তোরা আমার সারাজীবনের সাধনা নষ্ট করে দিতে চাস ? তোরা ভেবেছিস কী ? এই মুহূর্তে মেস তুলে দে।' মেস উঠে গেল। ফিরে এলেন কদমতলায় মানিকবাবুর বাড়ীতেই।

১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মানিকবাবু কদমতলার বাড়ী বদল করলে তিনিও তার সাথে ব্যাতাইতলায় একটি বাড়ীতে উঠে আসেন। প্রসঙ্গত বলে রাখি তিনি বরাবর মানিকবাবুর সাথে ছিলেন। তাই মানিকবাবুর সাথে সাথে তাঁরও ঠিকানা বদলেছে বারে বারে। কখনও হাওড়ার হালদার পাড়া লেনে, কখনও লক্ষ্মণ দাস লেনে, কখনও কালী ব্যানার্জী লেনে, কখনও কদমতলায়, অবশেষে ব্যাতাইতলায়। এর কিছু দিন আগে থেকেই ওনার শরীর ভেঙে পড়েছিল। অর্শরোগে ভুগছিলেন। তার আগে পিঠে বড় কার্বঙ্কল ঘা নিয়ে অনেকদিন ভুগেছিলেন। সারা শরীরে ঘামাচির মত হাড়পিসের অসহ্য জ্বালা সহ্য করেছেন নীরবে। কিন্তু এবার হল ক্ষুদ্রান্ত্রে ক্যানসার। ভর্তি হলেন চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতালে। অস্ত্রোপচারের পর তাঁর পেটের ডানদিকে ফুটো করে একটি নল লাগানো হল। সেখান দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা করে মল এসে জমা হত একটি প্লাস্টিক প্যাকেটে। এই অবস্থাতেও ঘরে সর্বক্ষণ পাঠ ও আলোচনা চালাতে লাগলেন। কিন্তু একমাস পর অবস্থা আরও খারাপ হল। আবার ভর্তি করা হল হাসপাতালে। সেখানেই তাঁর দেহাবসান ঘটে। দিনটি ছিল বাংলা ১৩৭৪ সালের ২৬ কার্তিক, ইংরাজী ১৯৬৭ সালের ১৩ই নভেম্বর। দেহাবসানের দু'মাস আগে হাসপাতালে কেবিনে বসে তিনি বললেন, 'আর নয়, এবার পর্দা তুলে দে, মায়েদের কাছে আসতে দে।' অনুরাগী অনেকের বাড়ীর মেয়েরা এসেছিলেন তাদের স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষটিকে বাস্তবে মিলিয়ে নিতে। উনি বিছানায় বসে করজোড়ে আকূল হয়ে প্রার্থনা জানাতে লাগলেন, 'মায়েরা আমায় আশীর্বাদ করুন, যেন ঠাকুর ঠাকুর করে যেতে পারি।' যোগের সকল অবস্থার ঊর্দ্ধে

উঠলেন। মায়েদের মনের ক্ষোভও দূর করলেন।

তাঁর দেহ যাবার পর মানিকবাবু স্বপ্নে দেখলেন, শ্রীজীবনকৃষ্ণ বলছেন, 'আমাকে কি ঋণী রাখতে চাস ? আমার জন্য যে যা.খরচ করেছে সমস্ত কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দিবি।' শ্রীজীবনকৃষ্ণের অসুখের জন্য যে যা খরচ করেছে এমনকি শ্মশানে যে তাঁর জন্য একটা দেশলাই কাঠিও খরচ করেছে মানিকবাবু হাত জোড় করে তাকে তা ফিরিয়ে দিয়েছেন শ্রীজীবনকৃষ্ণের অবশিষ্ট সামান্য সঞ্চয় থেকে। তিনি শুধু দিতে এসেছেন—নিতে নয়। তিনি যে পূর্ণ।

তাঁর আধ্যাত্মিকতার উন্মেষ হয়েছিল শিশুকাল থেকেই। তিন বছর বয়সে তিনি স্থূলে কালী বা আদ্যাশক্তির দর্শন পান। সাড়ে চার বছর বয়সে মূর্তিমতী পরাবিদ্যা দর্শন হলো — সাদা কাপড় পরিহিতা এক বিধবা মহিলা, পিঠে এলো চুল। বাড়ীর পরিত্যক্ত রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন। এগারো বছর বয়সে দেখেন এক নারীমূর্তি তাঁর অসুস্থ দেহে (প্যারাটাইফয়েড হয়েছিল) হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, তুমি কে গা ? সেই নারী উত্তরে জানালেন যে তিনি 'শীতলা'। ইন্দ্রিয়নিচয়কে ঈশ্বরমুখী করে দেহটিকে শীতল করে দিলেন। এরপর বারো বছর চার মাস বয়সে এল এক শুভ লগ্ন। রাত্রে স্বপ্নে দেখলেন, বিছানায় শুয়ে আছেন। তাঁর পাশে শ্রীরামকৃষ্ণ। উঠে বসে তাঁকে শিক্ষা দিতে লাগলেন। বালক শ্রীজীবনকৃষ্ণের কাছে তখন তিনি অজানা মানুষ। অনেক পরে জেনেছিলেন যিনি তাঁকে বার বার দেখা দিয়ে উপদেশ দেন তিনি স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। এইভাবে সচ্চিদানন্দগুরু লাভে জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। শুরু হল বেদের সাধন। তেরো বছর আট মাসে দেখলেন স্বামী বিবেকানন্দকে। তিনি সারারাত ধরে মাথার কাছে বসে তাঁকে শিক্ষা দিলেন। ভোর হলে সে মূর্তি অদৃশ্য হল। মাথার মধ্যে একটা ধ্বনি ও লেখা ফুটে উঠল–'রাজযোগ'। পরিণতিতে আপনা হতে শুরু হল বেদের সাধন। কোষের পর কোষ উন্মুক্ত হয়ে চব্বিশ বছর আট মাস বয়সে হল সুদুর্লভ ভগবান দর্শনের অনুভূতি।

তিনি কোন মানুষ গুরুর আশ্রয় নেননি। জীবনে কখনও পূজা-অর্চনা করেন নি। একটা মন্ত্রও জানা ছিল না তাঁর। ঠাকুর রামকৃষ্ণ কাঁদছেন আর বলছেন, 'মা, রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিলি আর আমাকে দেখা দিবি নে ?' কিন্তু শ্রীজীবনকৃষ্ণ জানতেন না যে ভগবানকে দেখা যায়। তাঁকে দেখার জন্য কাঁদতে হয়। সাধারণ মানুষের মতই দৈনন্দিন জীবন যাপন করতেন, আর দেখতেন আপনা হতেই তাঁর দেহে ক্রমান্বয়ে হয়ে চলেছে বেদের সাধন, বেদান্তের সাধন, তত্ত্বজ্ঞান, অবতারত্ব ইত্যাদি নিত্যনূতন অধ্যায়ের বৈচিত্রময় অনুভূতি সমূহ। তাঁর দেহে ব্যষ্টির সাধনের চরম উৎকর্ষতা সাধিত হলেও তিনি তা গ্রহণ করেন নি। এইভাবে নেতি নেতি করেই চলে এসেছিলেন তিনি। কিন্তু যেখানে তাঁকে

থমকে দাঁড়াতে হয়েছে সেটি হল তাঁকে কেন্দ্র করে সমষ্টিগত সাধনের এক অভূতপূর্ব অধ্যায়। অবতারত্বকে অতিক্রম করে নতুন এই আত্মিক অবস্থায় তাঁর রূপ ফুটে উঠতে লাগল সর্ব ধর্মের সর্বশ্রেণীর মানুষের অন্তরে। তাঁকে স্বপ্নে, ধ্যানে, তন্দ্রায় (trance-এ) ও জাগ্রত অবস্থায় দেখতে লাগলেন আবালবৃদ্ধবনিতা। তাঁর অফিসের সহকর্মীরাও প্রায় সকলেই তাঁকে স্বপ্নে দেখতে লাগলেন। দুই এক বছর পরে তাঁর অবসর গ্রহণকালে বিদায় অভিনন্দন পত্রে বিভাগীয় সহকর্মীরা শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে লিখেছেন–'আমরা দিনের পর দিন তোমার নিষ্ঠা, সত্যাচরণ লক্ষ্য করেছি। তোমার নির্মল বুদ্ধির দিব্যজ্যোতিতে স্নান করে ধন্য হয়েছি। সেই পুণ্যজ্যোতি আমাদের ভাবী জীবনের পথকে আলোকিত করুক। ... হে সাধু তোমাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।'

বিভিন্ন অঞ্চলে পরিচিত-অপরিচিত অনেকে তাঁর কাছে এসে বলতে লাগলেন, 'আমি আপনাকে স্বপ্নে দেখেছি। স্বপ্নে আপনার কাছে আসতে আমাকে নির্দেশ করেছে' ইত্যাদি। উনি প্রথম প্রথম পাত্তা দিতেন না। বলতেন, 'মশাই, ভাল করে খাওয়া দাওয়া করবেন। পেট গরম হলে এসব হয়। কিন্তু ক্রমে তাঁকে দেখা লোকের সংখ্যা যখন বাড়তে লাগল এবং একই লোক যখন বার বার তাঁকে স্বপ্নে দেখছে বলে জানাতে লাগল তিনি বুঝলেন, এ একটা নতুন কিছু হচ্ছে। স্বপ্নদ্রষ্টাদের বললেন, 'শনিবার বিকালে ও রবিবার কয়েকজন বন্ধু মিলে বাড়ীতেই কথামৃত পাঠ করি। ইচ্ছা হলে আসুন আমার বাড়ীতে ২/১ নং কালী ব্যানার্জী লেনে। ওনার অবসর গ্রহণের পর সকাল থেকে রাত্রি ন'টা সাড়ে ন'টা পর্যন্ত কথামৃত পাঠ ও আলোচনা চলতে লাগল। মাঝে স্নান খাওয়ার সময়টুকু বাদ। দেখতে দেখতে ঘর ভরে গেল। তাঁর ঘরে ফল, ফুল, মিষ্টান্ন ইত্যাদি আনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু প্রতিদিনই বহু মানুষ এসে নিবেদন করত তাদের বহু বিচিত্র দর্শন-অনুভূতির কথা। জানা গেল তাঁকে দেখছে হিন্দু, দেখছে মুসলমান, দেখছে খৃষ্টান, দেখছে পারসী, দেখছে ভারতবাসী আবার বিদেশী। এদের মধ্যে কেউ ধনী, কেউ দরিদ্র, কেউ শিক্ষিত, কেউ বা নিরক্ষর। তাঁর কাছে আসার পর যেমন লোকে তাঁকে দেখতে শুরু করেছে, আবার তাঁকে না দেখে, তাঁকে না জেনে, তাঁর কথা না শুনেও বহুলোক তাঁকে দেখছে। আর তাদের সংখ্যাই হল বেশী। পরে ঘটনাচক্রে তারা আসে তাঁর কাছে–কথা প্রসঙ্গে নিবেদন করে তাদের পূর্ব দর্শনের কথা। তাঁর কাছে মেয়েদের আসতে দেওয়া হত না। তবুও তারা ঘরে বসেই তাঁকে দেখে। বাড়ীর কোন একজন লোক তাঁর কাছে এল, সে লোকটি তাঁকে স্বপ্নে দেখতে শুরু করল। ধীরে ধীরে তাঁকে দেখা শুরু হয়ে গেল সে বাড়ীতে। আবার কখনও বা বাড়ীর কর্তা যিনি তাঁর কাছে এসেছেন তিনি দেখেন পরে, বাড়ীর মেয়েরা ঘরে বসেই তাঁকে দেখতে থাকে–দাস দাসীরাও বাদ পড়ে না। পিতামহ দেখেন আবার পৌত্রও দেখে তাঁকে। কোন বিচার

নেই, কোন ভেদাভেদ নেই, কোন গণ্ডি নেই। তাঁকে দেখার জন্য শুধু প্রয়োজন হল– মনুষ্যদেহ, আর কিছুই না। যারা দেখছে তাঁকে তাদের মধ্যে কতই না পার্থক্য। বয়সে, বিদ্যায়, বিভবে তাদের মধ্যে কতই প্রভেদ। তবু অন্তরে তাঁর রূপ দর্শনে ব্যবহারিকে এই বহুত্বের মধ্যেও ফুটে উঠল আত্মিক একত্ব। তিনি বহু হয়ে বহুকে এক করলেন। স্বামী বিবেকানন্দের কথা—'One and Oneness'। মনুষ্যজাতির মধ্যে একত্বের যে বহু আকাঙ্ক্ষিত চিত্র মহাপুরুষেরা মানস নয়নে এঁকে গেছেন সেই একত্বের বাস্তব সূচনা হল। শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদে আছে—

'ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী
ত্বং জীর্ণদণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ।'

কিন্তু সেই 'ত্বং' যে কোন কাল্পনিক ঈশ্বর নয়, একজন জীবন্ত মানুষ আর তার 'বিশ্বতোমুখ' হওয়ার প্রমাণ দেয় মানুষ তথা জগৎ, এই সত্যোপলব্ধির আলোকে ধর্ম জগতের আবহমান কালের পুঞ্জীভূত অন্ধকার দূরীভূত হল। মানুষ প্রত্যক্ষ করল শাশ্বত শান্তি লাভের সঠিক পথ— একজন জীবন্ত মানুষকে কেন্দ্র করে এই আত্মিক একত্ব।

মানুষ কিভাবে সর্বজনীন হয় তার ধারাবাহিক বিবরণসহ শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের যৌগিক রূপ লিপিবদ্ধ করলেন 'ধর্ম ও অনুভূতি' নামক গ্রন্থে। লেখক হিসাবে নিজের নাম দিলেন, 'কুড়িয়ে পাওয়া মানিক'। কারণ তাঁর দেহে এই যৌগেশ্বর্যের প্রকাশ ছিল বিশ্বপ্রকৃতির অনুপম উপহার, কুড়িয়ে পাওয়া অমূল্য ধন। এর ইংরাজী সংস্করণ Religion & Realisation By Diamond Picked up in the Street ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর প্রকাশিত হল। দেশ বিদেশের বিভিন্ন স্থানে এই বইগুলির পাঠ ও আলোচনা হতে লাগল। আশ্চর্যের ব্যাপার যেখানে যেখানে এই বই পাঠ হতে লাগল সেখানকার অনেক মানুষও স্বপ্নে, ধ্যানে এমন কি জাগ্রত অবস্থাতেও গ্রন্থ রচয়িতার দর্শন পেতে লাগলেন। সাথে সাথে তাদের আধ্যাত্মিক জীবন দর্শন ও অনুভূতির বিচিত্র সম্পদে সমৃদ্ধ হতে লাগল। তাঁর দেহাবসানের পর আজও এই ধারা অব্যাহত আছে, তিনি যে শুধু সর্বজনীন নন, সর্বকালীনও বটে তার প্রমাণ ফুটে উঠছে।

"আমার আত্মা, তোমার আত্মা, তার আত্মা এমন কত আত্মা। তারা যে এক আত্মার মধ্যে সত্য তাকে আমাদের শাস্ত্রে বলে পরমাত্মা, ইনি সদাজনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। ইনি আছেন সর্বদা জনে জনের হৃদয়ে। ... সকল কালে তাঁর প্রকাশ।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ধারাবাহিক সাধনের ক্রম

সাধনের সূচনায় একজন অজানা মানুষকে দেখা যায়। তিনি বাইরে থেকে আসেন না। ব্রহ্মপুর থেকে অর্থাৎ দেহীর সহস্রার (শিরোদেশ) থেকে নেমে এসে দেহীকে কৃপা করেন, দেহীর মনকে ধাপে ধাপে উপরে তুলে নিয়ে যান, অনেক অনুভূতি দান করেন শেষে ভগবান দর্শন করান, ইনিই সচ্চিদানন্দগুরু অর্থাৎ গুরুরূপে শ্রীভগবান। যার ষোল আনা বা পূর্ণাঙ্গ সাধন তার বারো বছর চার মাস বয়সে সচ্চিদানন্দগুরু লাভ হয় – পুরাণের কথায় বারো বছর গর্ভবাসের পর শুকের জন্ম হয়, শুরু হয় বেদের সাধন* আপনা হতে।

বেদের সাধন*

বেদমতে মানুষের দেহকে পাঁচটি কোষে ভাগ করা হয়েছে। যথা–অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময় কোষ। পাঁচটি কোষের মধ্যে আছে সাতটি ভূমি✦ (লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি, হৃদয়, কন্ঠ, ভ্রু-মধ্য এবং সহস্রার) ঃ-

অন্নময় কোষ – স্থূল দেহ।

প্রাণময় কোষ – তিনভূমি–লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি।

অনুভূতি – আলেখলতার জল পেটে পড়লে গাছ হয় - শ্রীরামকৃষ্ণ।

'আলেখলতা'–অলক্ষ্যে দেহকে যে আত্মা ওতপ্রোতভাবে লতার মতন জড়িয়ে আছেন। তিনি দেহ থেকে কৃপা করে মুক্ত হয়ে পেটের দক্ষিণ দিকে স্বচ্ছ নীলাভ জলে জ্যোৎস্না কিরণে জড়িত হয়ে দেখা দেন।

মনোময় কোষ–চতুর্থ ভূমি–হৃদয়।

অনুভূতি–জ্যোতির্দর্শন। যেদিকে চাওয়া যাবে সেই দিকেই জ্যোতি দর্শন। একটা গাছের

*(বেদ কোন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের নয়, বেদ সর্বজনীন। তাই বেদ কথিত সপ্ত ভূমির অনুভূতি হয় হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান–সব সম্প্রদায়ের লোকেরই। হযরত মহম্মদ আল্লার কাছে গেলেন সপ্ত আকাশ পরিভ্রমণ করে। বাইবেলেও আছে যোহান দেখলেন-সেই সপ্ত সুবর্ণ দীপবৃক্ষের দূত সপ্ততারা এক শুক্লকেশ সুবর্নময় পুরুষ তার দক্ষিণ হস্তে ধারণ করে আছেন। তিনি দীপবৃক্ষের (দেহবৃক্ষের প্রতীক) মধ্যে গমনাগমন করেন–তিনি শাশ্বত পুরুষ এবং মৃত্যুর চাবি আছে তাঁরই হস্তে... ইত্যাদি। আবার আছে– ঈশ্বরের সপ্তদূত একে একে তূরী বাজালেন–সপ্তম দূত তূরী বাজালে স্বর্গে বাণী ফুটে উঠল–এখন জগতের রাজ্য প্রভুর হইল, ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচারী নিপাতিত হইল...ইত্যাদি।

✦দেহ মন্দিরের সাতটি ভূমির সাধনের পর ব্রহ্মজ্ঞান লাভের কথা বোঝাতে প্রাচীন মন্দিরগুলিতে সাতটি সিঁড়ি অতিক্রম করে ইষ্টদর্শন করার ব্যবস্থা দেখা যায়।)

ডালে হয়ত নজর পড়ল, ডালের ভিতর পারা কিম্বা রূপা গলার মতন দেখা গেল। শ্রীরামকৃষ্ণ মায়ের ঘরে পূজা করছেন–মা দেখিয়ে দিলেন সমস্ত চিন্ময়, জ্যোর্তিময়।
বিজ্ঞানময় কোষ–পঞ্চমভূমি, ষষ্ঠভূমি এবং সপ্তমভূমির কিয়দংশ।
বিজ্ঞানময় কোষ–বিশেষ রূপে জ্ঞান হচ্ছে 'আমি কে' ?
পঞ্চমভূমি–কন্ঠ ।
অনুভূতি–অৰ্দ্ধনারীশ্বর মূর্তি দর্শন। দ্রষ্টা নিজের উপরার্ধ পুরুষ আর নিম্নার্ধ নারী রূপে দেখতে পান–চোখ বুজে নয়–চোখ খুলে, অবাক হয়ে। দেহী বোঝেন তিনি স্ত্রীও নন পুরুষও নন, তিনি আত্মা।
'তাই সচ্চিদানন্দ প্রথমে অর্ধনারীশ্বর মূর্তি ধারণ করলেন'–শ্রীরামকৃষ্ণ। সচ্চিদানন্দ–আত্মা–ভগবান–ব্রহ্ম!
সচ্চিদানন্দ দেহেতে। তিনি দেহ থেকে মুক্ত হয়ে অর্ধনারীশ্বর মূর্তি ধারণ করেন। ভক্ত দেখেন। অর্ধনারীশ্বর মূর্তির দ্বিতীয় স্তরের অনুভূতি হল–সচ্চিদানন্দগুরুর মূর্তি অর্ধনারীশ্বর রূপে দেখা যায়। প্রথম স্তরের অনুভূতি (বস্তুতত্ত্বের সাধনের ফল) দ্রষ্টার স্থূল শরীরে এবং দ্বিতীয় স্তরের অনুভূতি (যাতে শুধু মনের নাশ হয় কিন্তু অহং-তত্ত্বের* লয় হয় না) দ্রষ্টার কারণ শরীরে বর্তায়। এই ভূমিতে দ্বিতীয় স্তরের অন্যান্য অনুভূতি হল বীণার মধুর ঝঙ্কার, শঙ্খধ্বনি বা ঘন্টাধ্বনি শ্রবণ (যে কারণে মন্দিরে ইষ্টমূর্তি দর্শনের পূর্বে ঘন্টাধ্বনি করার প্রথা), আকাশ দর্শন** (অখণ্ড সচ্চিদানন্দের প্রতীক) ইত্যাদি।
ব্যবহারিক লক্ষণ–ঈশ্বরীয় কথা ব্যতীত অন্য কথা বলতে বা শুনতে ভাল লাগে না– 'অন্যাং বাচো বিমুঞ্চথ'।
ষষ্ঠভূমি–ভ্রুমধ্য।
প্রথম দ্বিদল পদ্ম–দুটি চক্ষু হতে দুটি চক্র বেরিয়ে ভ্রুমধ্যে এসে এক হয়ে যায়। একে বলে তৃতীয় নেত্র বা জ্ঞানচক্ষু। এই জ্ঞানচক্ষুর মধ্যে জ্ঞানের মূর্তি দেখা যায়–যথা বুদ্ধমূর্তি। এ অবস্থারও দ্বিতীয় স্তরের অনুভূতি আছে। সচ্চিদানন্দগুরুর শরীরে জ্ঞানচক্ষু বা ত্রিনেত্র পরিস্ফূট হয় আর রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি ও কল্পতরু দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া বহুবিধ দেবদেবীর (কালী, কৃষ্ণ, শিব ইত্যাদি) রূপও দর্শন হয়।

তারপর দিনদুপুরে খোলা চোখে নৃত্যপরা রহস্যময়ী মায়ামূর্তি দর্শন। অপূর্ব নারীমূর্তি--অপূর্ব দর্শন। এই নারীমূর্তি দূরে নয়, অতি নিকটে দর্শন হয়। ইনি কৃপা করে দ্বার খুলে দিলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান বা সপ্তমভূমিতে প্রবেশ হয়। এই নারীমূর্তির গায়ের রং–স্নিগ্ধ

*অহংতত্ত্ব– পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়। অহংতত্ত্ব ও মন - এই দুয়ের লয় হলে তবে ষোলো আনা সাধন - বস্তুতত্ত্বে সাধন।

**কন্ঠে মন এলে নীল আকাশ দর্শন হয়। সম্ভবত এই অনুভূতি নীলকন্ঠ শিবের পরিকল্পনার মূলে।

ঘাস ফুলের রং। বসন–ফিকে নীলাম্বরী। নাসায় নীল পাথরের বেশর। দৃষ্টি ভূমিতে আনত এবং আবদ্ধ। ভ্রু-মধ্যে হাতের বুড়ো আঙুল ঠেকিয়ে নৃত্যপরা, নৃত্যধীর। মূর্তিতে আনন্দ যেন সর্বাঙ্গ দিয়ে উচ্ছলিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। ইনি রহস্যময়ী মায়ামূর্তি। আনত ও আবদ্ধ দৃষ্টিতে বুঝিয়ে দিলেন–মায়া রহস্যময়ী। অনুভূতির দ্বারা মায়ার রহস্য ভেদ হয়। জীবন মৃত্যু রহস্য ভেদ হলে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান।
সপ্তমভূমির দ্বারদেশ – কপালের উপরিভাগ। দেখা যায় রেশমের পাতলা পর্দার আড়ালে সূর্যের মতন উজ্জ্বল জ্যোতির্পিণ্ড। প্রাণসূর্য বা শ্রীভগবান দর্শনের পথে শেষ আবরণ। সপ্তমভূমি- শিরোমধ্যে। এই সপ্তমভূমিতে আত্মার সাক্ষাৎকার হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা–'কেউ এসে বলবে, এই–, এই–,।' এই কেউ হলেন সচ্চিদানন্দগুরু। তিনি স্নিগ্ধ জ্যোতির সমুদ্রে নীল রেখা দ্বারা সীমায়িত অঙ্গুষ্ঠবৎ ঘন জ্যোতিকে তর্জনী সংকেত করে বলেন–'এই ভগবান! এই ভগবান দর্শন'। তারপর ঐ ভগবানের মধ্যেই লীন হয়ে যান। দেহী উপলব্ধি করেন সচিদানন্দগুরু শ্রীভগবানেরই এক রূপ। পরে শ্রীভগবান বা আত্মার অবস্থানের দিক পরিবর্তন ঘটে। বদন মণ্ডলের দিক হতে শিরোদেশের পশ্চাতে তিনি বিবর্তিত হয়ে প্রসারিত হন। আত্মার এই প্রসারিত রূপ একগোছা ধানের শীষের মত- ধান্যশীর্ষবৎ অথবা তাকে ধূমকেতুর লেজের মতও বলা চলে।

এই আত্মার সাক্ষাৎকারের পর ব্রহ্মজ্ঞানের স্ফূরণ। শেষে আমি দেহ নই, আমি আত্মা–এই বোধ হয়। এই হল বিজ্ঞানময় কোষ অর্থাৎ বিশেষ রূপে জ্ঞান হল নিজের স্বরূপের। সমাধির আরম্ভ এবং এক প্রকার সমাধি।

আনন্দময় কোষ–সপ্তমভূমিতে ব্রহ্মানন্দে অবস্থান। সচ্চিদানন্দ অবস্থা লাভ, ব্রহ্ম হয়ে যাওয়া। 'বাবা, সচ্চিদানন্দ লাভ না হলে কিছুই হল না।' গাঢ় সমাধি অবস্থায় অনুভূতি হয়, ভাষার দ্বারা বর্ণনা করা যায় না।

আত্মার সাধন বা বেদান্তের সাধন

আত্মা সাক্ষাৎকার করার পর আত্মার মধ্যে জগৎ বা বিশ্বরূপ দর্শন হয়। এই ভিতরের জগৎ ও বাইরের জগৎ হুবহু এক (identical)। যার এই দর্শন হয় তিনি বোঝেন বিশ্বসংসার তার ভিতরে। আবার অপরে স্বপ্নে দেখেন ঐ দেহী একটি গ্লোব মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন–গোস্বামী। এরপর সেই বিরাট জগৎ বীজে পরিণত হয়। বিশ্ব বীজবৎ অনুভূতি হয়। পরে বীজও থাকে না- স্বপ্নবৎ হয়ে যায়। ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা ক্রমাগত আগেই স্বপ্নে দেখতে দেখতে দ্রষ্টার কাছে স্বপ্নাবস্থা ও জাগ্রত অবস্থার পার্থক্য ঘুচে যায়। জগৎ তার কাছে স্বপ্নবৎ বোধ হয়। পরের অনুভূতি–স্বপ্নও নেই- শূন্য। আমি-আত্মা-জগৎ-বীজ-স্বপ্ন–কিছু না, বোধাতীত। সাধকের প্রাণচৈতন্যের

মহাকারণে লয়। সগুণ সাধনার পরিসমাপ্তি ও নির্গুণে স্থিত সমাধি লাভ।*

তত্ত্বজ্ঞান

নির্গুণে লয় হবার পরে যখন দেহীর জৈবী চেতনা ফিরে আসে তখনই হয় তত্ত্বজ্ঞানের উন্মেষ। সাধন আরম্ভ হল – এই দেহই আমি–এই থেকে। সমাপ্ত হল–কিছুই নেই–শূন্য-তাও বলবার জো নেই। আমি নেই, বোধ নেই, কিছু নেই...। এরপর যখন চেতনা ফিরে আসে তার রূপ হল–আমি না। তবে কে ? হে ভগবান, তুমি-তুমি--তুমি! এই হল শ্রীরামকৃষ্ণের 'তুঁহু! তুঁহু!' এই ভূমিতে অবস্থান করাকে বলে তত্ত্বজ্ঞান। তত্ত্বফল আহরণ করতে হয়। দেখতে পাওয়া যায়। সাধক তড়াং করে নিজে গাছে ওঠেন। গাছটি অপরূপ। সে রকম গাছ কোথাও দেখা যায় না। ফলটিও অপরূপ। ফলটি গাছ থেকে ছিঁড়ে হাতে ধরা রইল–সাধারণ জ্ঞান ফিরে এল। এই তত্ত্বজ্ঞানই ক্রমশ অবতারত্বে পরিণত হয়। একে বলে নিগম বা পৌরাণিক নিগম।

অবতারত্ব

অবতারত্ব বিকাশের পথে প্রথমে দেখা যায় একজন ঋষি শূন্য থেকে নেমে আসেন আর নিকটে এসে শূন্যেই থাকেন। বিরাট দৃঢ় স্থূল দেহ, বিশাল বক্ষঃস্থল আর পাখির পালকের মত মোটা শক্ত দাড়ি। এই দাড়ি বুঝিয়ে দেয় ইনি পুরাতন পুরুষ। তিনি বলেন- 'চৈতন্য শীঘ্রই অবতার হয়ে আসছেন'।

এরপর চৈতন্য সাক্ষাৎকার।

সহস্রারের মধ্যে দপ্ করে লাল আলো জ্বলে ওঠে।

'অন্ধকারে লাল চীনে দেশলাইয়ের আলোর মত'–শ্রীরামকৃষ্ণ। দেহে চৈতন্য উদ্ভূত হ'ল।

এবার জ্যোতিরূপে এই চৈতন্যের অবতরণ। জ্যোতির রূপ অবর্ণনীয়, তুলনারহিত।

প্রথম অবতরণ–সহস্রার থেকে কণ্ঠ পর্যন্ত।

দ্বিতীয় অবতরণ–সহস্রার থেকে কটিদেশ পর্যন্ত। এই হল প্রকৃত ঈশ্বরকটিত্বের উপলব্ধি।

তারপর দেহের মধ্যেই ছোট্ট দেহী (Manikin) 'মানুষ-রতন' দর্শন হয়। তিনি পরম ভক্ত। কপালে শ্বেতচন্দনের ফোঁটা-সারা কপাল জুড়ে। বর বিয়ে করতে যাবার সময় যেমন কপালে চন্দনের ফোঁটা পরে। তিনি হাততালি দিয়ে হরিনাম করেন, সেই সঙ্গে দ্রষ্টার হাতের তালুও কির্‌কির্ করে ওঠে। 'মানুষ-রতন' দর্শন না হলে প্রকৃত ভক্তি লাভ হয় না। এই দর্শনের পর দ্রষ্টার অবতারত্বে অধিষ্ঠান হয়।

অবতারত্ব লাভের পর সাধক ঈশ্বরের সাথে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-

*সচ্চিদানন্দগুরু লাভ থেকে শুরু করে বেদান্তের সাধনে নির্গুণে লয় হওয়া পর্যন্ত হল আগমের সাধন। আর নির্গুণ থেকে ফিরে এসে অবতারত্ব লাভ অর্থাৎ মানুষ রতন দর্শন পর্যন্ত হল নিগমের সাধন।

–এই পঞ্চরসের লীলা আস্বাদন করেন দীর্ঘ ১২ বছর ৪ মাস ধরে। অবশেষে রসস্বরূপ ঈশ্বরের সাথে একাত্ম হয়ে যান। তার অবতারত্ব ঘুচে যায় ও ঈশ্বরত্ব লাভ হয়।

বিশ্বব্যাপিত্ব

অবতারের পঞ্চরসের লীলা তথা রসতত্ত্বের সাধন হল ব্যষ্টির সাধনের শেষ সীমা। এবার শুরু হয় বিশ্বব্যাপিত্বের সাধন। সাধকের বিশ্বব্যাপী সত্ত্বার উন্মেষ। ব্যক্তিচৈতন্য অবতীর্ণ হয় বহুর মধ্যে। সংখ্যাতীত মানুষের অন্তরে তাঁর চিন্ময় রূপ ফুটে ওঠে আর তারা তাই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বলে তাঁর কাছে। বেদে ভগবান দর্শনের এই অপূর্ব পরিণতির কথা বলা হয়েছে।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। এক বহু হলেন। পরবর্তী ধাপে এই একের মাথায় উদ্ভূত চিন্তা জগতের অসংখ্য মানুষের ব্রেণে তাদের অজ্ঞাতসারে ক্রিয়াশীল হয়ে তাদের আত্মিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবে। এই-ই সাধনার চূড়ান্ত পরিণতি। তখন নতুন তাৎপর্যে বেদবাণী ধ্বনিত হবে–"যিনি এক, যিনি সংযমকর্তা, যিনি সর্বভূতের অন্তরাত্মা, যিনি এক রূপকে বহুরূপে প্রকাশ করেছেন সেই পুরুষকে যারা অন্তরে দর্শন করেন তারা শাশ্বত শান্তির অধিকারী হন।"

প্রতীকতত্ত্ব ও যৌগিক রূপ

ইংরেজ দার্শনিক টমাস কার্লাইল বলেছেন, জ্ঞাতসারেই হোক অথবা অজ্ঞাতসারেই হোক মানুষ প্রতীকের সাহায্য নিয়েই বেঁচে থাকে, কাজ করে এবং তার সমস্ত সত্তার অস্তিত্ব রক্ষা করে। যে যুগ প্রতীককে মর্যাদা এবং উচ্চমূল্য দেয় সেই যুগই শ্রেষ্ঠ। যে প্রতীক জীবনের সঙ্গে এমন গভীরভাবে জড়িত সেই প্রতীক বা ইংরাজীতে সিম্বল কথাটির উৎপত্তি গ্রীক সিম্বোলান্ (অর্থাৎ চিহ্ন) কথাটি থেকে। প্রতীকবাদের বিশেষজ্ঞরা বলেন প্রাচীন মিশরীয় চিত্রলিপি (হায়ারোগ্লিফ্স্) থেকে প্রতীকের উৎপত্তি হয়েছে আজ থেকে প্রায় দশ হাজার বছর আগে। ফিন দেশেও প্রতীকের ব্যবহার চালু ছিল। ফিনিশীয় চিত্রলিপি থেকেই ইহুদীদের ভাষা হিব্রুর উৎপত্তি হয়েছিল। পরবর্তীকালে ইহুদীরা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে এই প্রতীকতত্ত্বের বিস্তার ঘটায়। ছ'হাজার বছর আগে বাইবেলের যুগেও যে প্রতীকতত্ত্ব জানা ছিল এবং এই প্রতীক বিশ্লেষণ করে দেবস্বপ্নের ব্যাখ্যা করা হত তার অনেক উদাহরণ আছে ওল্ড টেস্টামেন্টে। সাড়ে তিন হাজার বছর আগে পাই মজেসকে। তাঁর জীবনেও বহু প্রতীকী নির্দেশের কথা পাই। ব্যালস্যাজার ফিস্টে যে দেওয়ালে লেখা ফুটে উঠেছিল তাও হায়ারোগ্লিফ্স্। ড্যানিয়েল এর ব্যাখ্যা দিয়েছিল। এছাড়া আরও পাই সল, সলেমন, ডেভিড, যারা এই প্রতীকতত্ত্ব বুঝতো। উপনিষদেও বহু প্রতীকি দর্শনের কথা আছে যেমন তৈত্তিরীয় উপনিষদে আত্মাকে পক্ষী বলা হয়েছে, ঈশোপনিষদে পরমব্রহ্মকে সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষ বলা হয়েছে, ইত্যাদি। গ্রীসেও প্রতীকতত্ত্বের প্রচলন ছিল। গ্রীক পুরাণে তার পরিচয় ছড়িয়ে আছে।

কোনও প্রতীক যে বিষয়কে ইঙ্গিত করে তার সঙ্গে প্রতীকটিকে এক করে ফেলা চলে না। প্রতীক কোন বিষয় সম্পর্কে একটি ধারণা (concept) বহন করে মাত্র। পাখী আত্মার প্রতীক। কিন্তু পাখী আত্মা নয়। ডিম ফুটে যেমন পাখীর বাচ্চা বেরোয় তারপর সে আকাশে উড়তে পারে তেমনি দেহস্থ আত্মা দেহ থেকে মুক্ত হয়ে স্পষ্ট রূপ নিয়ে দেখা দেয় (অঙ্গুষ্ঠবৎ), তারপর দেহী মুক্তির আনন্দ লাভ করে বিশ্বব্যাপী হয়ে। আবার যেমন 'সূর্যের মধ্যে একটি মানুষ'—এই প্রতীকটির অর্থ – (১) প্রাণশক্তির ঘনীভূতরূপ ঐ মানুষটি (সূর্য = প্রাণসূর্য ধরে), (২) তিনি জ্ঞানালোকের উৎস (সূর্য = জ্ঞানসূর্য ধরে), (৩) তিনি পরম এক (সূর্য একটিই এই বিশেষত্ব ধরে) ইত্যাদি। কিন্তু মানুষটি বাইরের সূর্যের মধ্যে অবস্থান করেন না।

অনুরূপভাবে প্রতিটি প্রতীকই একাধিক অর্থ বহন করে। আবার একটি শব্দ যেমন প্রসঙ্গ অনুযায়ী সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে তেমনি একই প্রতীক স্থানকালপাত্র ভেদে বিপরীত অর্থ বহন করে। Reward মানে পুরস্কার। আবার যখন বলা হয় The thief will get his reward তখন reward মানে হয় শাস্তি। কোন একজন স্বপ্নে

যদি দেখেন 'সূর্য ডুবছে'–এর মানে হয় যে দ্রষ্টার আত্মিক স্ফূরণ স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে। আবার অন্য এক ক্ষেত্রে এর মানে হবে, আত্মিক লীলার একটি ধাপ (phase) শেষ হচ্ছে, নতুন এক ধাপ শুরু হবে। কোন অর্থটি প্রযোজ্য হবে তা নির্ধারিত হবে দ্রষ্টার অন্যান্য স্বপ্ন থেকে এবং ঐ দ্রষ্টার আত্মিক অবস্থা সম্পর্কে অপরের দেখা স্বপ্নের সাহায্যে। অধিকাংশ স্বপ্ন প্রতীক অবলম্বন করে ফুটে ওঠে। প্রতীকের ভাষা সর্বজনীন। দেহীর আত্মা বা বিশ্বব্যাপী সত্তার প্রকাশ ঘটে স্বপ্নে তাই তার ভাষাও সর্বজনীন, প্রতীকি। স্থান কাল পাত্র বিচার করে স্বপ্নের সঠিক অর্থটি নির্ণয় করতে হয়। তাই কিছু কিছু স্বপ্নের অর্থ সমকালে পরিস্ফূট হয় না।

যৌগিক রূপ বা দেহতত্ত্ব

যোগ মানে পরিবর্তন–যুক্ত হওয়া নয়। ধারাবাহিক সাধনে আদ্যাশক্তি ব্রহ্মে পরিবর্তিত হন। মানুষ ব্রহ্মত্ব লাভ করে। অলক্ষ্যে ও নির্লিপ্তভাবে আত্মা ওতপ্রোত অবস্থায় দেহের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে আছেন। তিনি কৃপা করে দেহ থেকে মুক্ত হয়ে রূপ ধারণ করে ফুটে ওঠেন। প্রথম রূপ সচ্চিদানন্দগুরু। কোন বিষয়ের বা কাহিনীর যৌগিক রূপ হল– আত্মা যে সব রূপ ধরে দেহে ফুটে উঠে লীলা করেন, তার সংগে ঐ বিষয়ের সাদৃশ্য স্থাপন। এই যৌগিক রূপের মননে বহির্মুখী মন অন্তর্মুখী হয়ে যায়–মধুর উৎস পুরুষ মাধবের (ব্রহ্মের) পাদপদ্মে মন মগ্ন হয়, অনুভব করা যায়–'এ দ্যুলোক মধুময়।'

——— ঃ ———

স্বপ্ন মহিমা

'জাগরণ যত সত্য স্বপ্নও সেইরূপ সত্য'–বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। তারপর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে গল্প জুড়লেন। এক কাঠুরে স্বপ্ন দেখছিল। একজন লোক তার ঘুম ভাঙানোতে সে বিরক্ত হয়ে বলে উঠল, তুই কেন আমার ঘুম ভাঙালি ? আমি রাজা হয়েছিলাম, সাত ছেলের বাপ হয়েছিলাম। ছেলেরা সব লেখাপড়া, অস্ত্রবিদ্যা শিখছিল। আমি সিংহাসনে বসে রাজত্ব করছিলাম। কেন তুই আমার সুখের সংসার ভেঙে দিলি ? লোকটি বলল, আরে ওতো স্বপ্ন, ওতে আর কী হয়েছে ? কাঠুরে বলল, তুই বুঝিস না। আমার কাঠুরে হওয়াও যেমন সত্য স্বপ্নে রাজা হওয়াও তেমনি সত্য।

স্বপ্নের উপর নতুন করে গুরুত্ব আরোপ করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। কিন্তু আমাদের জীবনে বিশেষত ধর্ম জীবনে স্বপ্নের যে এক বিশিষ্ট অবদান আছে তার সবিশেষ পরিচয় লাভ করতে হলে চোখ ফেরাতে হবে অতীতের দিকে। স্বপ্ন মহিমার সেই ইতিহাস আলোচনা করার আগে স্বপ্ন সম্বন্ধে দু'চারটে কথা বলে নিই।

আজকের দিনে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব বিশেষ করে অস্ট্রিয় মনোবিজ্ঞানী সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের মতবাদ (৩০০ জন রুগীর স্বপ্ন থেকে গৃহীত সিদ্ধান্ত) মানুষকে স্বপ্ন সম্পর্কে উদাসীন করেছে। তাদের ধারণা মানুষের অতৃপ্ত কামনা বাসনা স্বপ্নে রূপায়িত হয় আবার জাগ্রত জীবনের কর্ম ও চিন্তাও প্রতিফলিত হয় স্বপ্নে। কিন্তু এই জাতীয় স্বপ্নকে সাধারণত জৈবী স্বপ্ন (animal dream) বলে। তাছাড়া আর এক রকম স্বপ্ন আছে যাকে বলে দেবস্বপ্ন (divine dream)। আধুনিক কালের বিজ্ঞানীরা এর রহস্য উদ্ঘাটন করতে সমর্থ হন নি। স্বয়ং ফ্রয়েডেরও স্বীকারোক্তি আছে এই মর্মে যে তিনি যেসব স্বপ্ন নিয়ে আলোচনা করেছেন সেছাড়া অন্য একপ্রকার স্বপ্ন আছে যা কিনা দেবস্বপ্ন, সে বিষয়ে তাঁর কিছু জানা নেই।

তবে সচ্চিদানন্দগুরু লাভের পর জৈব স্বপ্ন বলে কিছু থাকে না। তখন সকল স্বপ্নই দেবস্বপ্ন। কেননা, (১) যে সব স্বপ্নে অতৃপ্ত কামনা বাসনা ফুটে ওঠে তাও দেহীর মস্তিষ্কে মানসিক চাপ দূর করে তার দেহটিকে দেবত্ব প্রকাশের অনুকূল বা উপযোগী করে তোলে। সুতরাং তা দেবস্বপ্ন। (২) দিনের চিন্তাকে ঘিরে যখন স্বপ্ন হয় তখন ভালো করে স্বপ্নটি আগাগোড়া বিচার করে দেখলে দেখা যাবে যা ভাবা হয়নি এমন কিছু বিষয়ও আছে তাতে। এ জাতীয় স্বপ্ন তাৎক্ষণিক ভাবনা চিন্তার যৌগিক রূপটির দিকে দেহীর মনোযোগ আকর্ষণ করে। হয়ত একজন শান্তিনিকেতন যাবার কথা ভেবেছেন বা গিয়েছেন। রাত্রে স্বপ্নে দেখলেন - শান্তিনিকেতন গিয়েছেন। সেখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হল, কথা হল। বেশ আনন্দ হল। এই স্বপ্নের অর্থ হল প্রকৃত শান্তির নিকেতন আছে নিজের ভিতরে– সহস্রারে, আর সেখানে মন গেলে শান্তিনিকেতনের রূপকারের

অর্থাৎ শ্রীভগবানেরও দেখা মেলে, নির্মল আনন্দ লাভের সুযোগ ঘটে। ক্রমাগত এই প্রকার স্বপ্নের দেহতত্ত্বে ব্যাখ্যার অনুধ্যান মানুষকে অন্তর্মুখী করে তোলে। তার দৃষ্টিভঙ্গী যায় বদলে। (৩) আমরা আর যে সব স্বপ্নকে জৈবস্বপ্ন ভাবি সেরকম একটি স্বপ্নের শ্রীরামকৃষ্ণকৃত ব্যাখ্যা উল্লেখ করব। ছোট নরেন একটি স্বপ্ন দেখেছেন। বলতে লজ্জা করছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ জোর করায় শেষে বললেন—তিনি দেখেছেন কতকগুলো গুয়ের ভাঁড়, - কেউ ভাঁড়ের উপর বসে আছে কেউ তফাতে বসে আছে। স্বপ্ন শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। বললেন, 'সংসারি লোক যারা ঈশ্বরকে ভুলে আছে তাদের ঐ দশা দেখছ। তাই মন থেকে সব ত্যাগ হয়ে যাচ্ছে। কাম চলে যাওয়া কি সহজ ব্যাপার ? আমি এর জন্য কত কেঁদেছি। আনন্দ আসনের চারপাশে 'জয় কালী' বলে ঘুরতাম আর বলতাম, মা আমার যদি ঐসব হয়) তাহলে গলায় ছুরি দিব।' শ্রীরামকৃষ্ণ এই আপাততুচ্ছ স্বপ্নটির মধ্যে আবিষ্কার করেছেন গভীর আধ্যাত্মিক তাৎপর্য।

যাক্ এবার দৃষ্টি ফেরাই অতীতে। প্রথমে আমরা স্বপ্ন সম্পর্কে বৈদিক ঋষিদের বক্তব্য জানার চেষ্টা করব। প্রশ্ন উপনিষদে আছে- ঋষি পিপ্পলাদকে সৌর্যায়নী গার্গ্যঃ প্রশ্ন করলেন—'স্বপ্ন দর্শন ব্যাপারটি কি কোন দেবতা কর্তৃক সম্পন্ন হয় ? ঋষি উত্তরে বললেন- 'হ্যাঁ, স্বপ্নাবস্থায় আমাদের অন্তরের দেবতা নিজের মহিমা অনুভব করেন।' বৃহদারণ্যক উপনিষদে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন— 'স্বপ্নে আমরা যে বিভিন্ন দৃশ্যাবলী দর্শন করি, সুখ, দুঃখ আনন্দ-বেদনা অনুভব করি, ভয় পাই—এইসব দৃশ্য ও অনুভূতির স্রষ্টা হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ জ্যোতিঃপুরুষ।' বৃহদারণ্যক আরও বলছেন, এই পুরুষই স্বপ্নাবস্থায় ইহলোক এবং মৃত্যুময় রূপসমূহকে অতিক্রম করে নতুন জগত সৃষ্টি করেন এবং নিজ জ্যোতির আলোকে তা দর্শন করেন অর্থাৎ স্বপ্নের স্রষ্টা ও দ্রষ্টা মানুষের অন্তর্যামী আত্মা। ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখা যায় ইন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে প্রজাপতি বলছেন—'স্বপ্নে যিনি মহীয়মান হয়ে বিচরণ করেন তিনি আত্মা, তিনি অমৃত তিনি অভয়, তিনি ব্রহ্ম!' কঠোপনিষদে যমরাজ নচিকেতাকে বলছেন- 'যিনি নিদ্রিত মানুষকে জাগিয়ে তুলে (স্বপ্নে) নিজের ইচ্ছামত গড়ে তোলেন তিনিই শুদ্ধতম, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত।' মাণ্ডুক্য উপনিষদ আবার ঘোষণা করছেন, জাগ্রত অবস্থার অনুভূতির চেয়ে স্বপ্নের অনুভূতি শুদ্ধতর। এই স্বপ্নের অনুভূতিকে অন্যান্য ধর্মীয় আচার্যগণ কতখানি মূল্য দিয়েছেন দেখা যাক।

আসি বাইবেলের কথায়। ওল্ড টেস্টামেন্টে (যীশুর জন্মের আগে বাইবেলের যে অংশ রচিত) মজেসের কথা আছে। ইহুদীরা একসময় মিশরের ফ্যারাওদের ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছিল। এই মজেসের নেতৃত্বে তারা সংঘবদ্ধ হয় এবং মিশর থেকে পালিয়ে প্যালেস্টাইনে স্বাধীনভাবে বসবাস করতে শুরু করে। তাঁর জীবনে পাওয়া যায় যে তিনি

একটা পর্বতগাত্রে (সিনাই পর্বতে) এসে ভগবানের নির্দেশ প্রার্থনা করতেন। তখন সেই পর্বতের সানুদেশে একটা আগুন জ্বলে উঠত আর সেই আগুনের মধ্যে থেকে ভগবানের উপদেশ ও নির্দেশ পেতেন। পরে ভগবান তাকে বলেছিলেন যে এরপর থেকে আর তোমাকে কষ্ট করে এভাবে নির্দেশের জন্য এতদূর আসতে হবে না, আমি স্বপ্নেই তোমাকে নির্দেশ দেব। এবার ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকেই একটি বিচিত্র ঘটনার উল্লেখ করব। যোসেফ আত্মীয় স্বজন দ্বারা বিতাড়িত হয়ে ঘটনাচক্রে মিশরের রাজার (ফ্যারাও) কারাগারে বন্দী হন। সেখানে রন্ধনশালায় তাকে কাজ করতে হত। তিনি অন্যান্য বন্দীদের তত্ত্বাবধান করতেন ও তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে দিতেন। একবার রাজা স্বপ্ন দেখলেন–নীলনদের ধারে সাতটি হৃষ্টপুষ্ট গরু চরে বেড়াচ্ছে। পরে রোগা রোগা আরও সাতটি গরু এসে বলবতী গরুগুলিকে আত্মসাৎ করল। স্বপ্নের পরের দৃশ্যে দেখলেন সাতটি শস্য সরস, অন্য সাতটি শুষ্ক। স্বপ্ন দেখে রাজার মনে হল এর কোন গভীর অর্থ আছে। কেউ এর মর্মভেদ করতে পারল না। অবশেষে ডাক পড়ল যোসেফের। তিনি বললেন, এই স্বপ্নে এক ভবিষ্যৎবাণী আছে। পরপর সাত বছর দেশে প্রচুর ফসল জন্মাবে (পুষ্টল গাভী–শস্যশালী দেশ) কিন্তু পরের সাত বছর একটানা অজন্মা হবে। প্রথম সাত বছরের শস্য থেকে (সরস শস্য) উদ্বৃত্ত অংশ পরের সাত বছরের জন্য সঞ্চয় করে রাখার (শুষ্ক শস্য) নির্দেশ আছে এই স্বপ্নে। এই ব্যাখ্যা রাজার মনে ধরল। তিনি যোসেফকে খাদ্যমন্ত্রী করে দিলেন। যোসেফ করলেন কী, ক্রমাগত সাত বছর ধরে উদ্বৃত্ত ফসল গুদাম জাত করলেন। স্বপ্নের পরের অংশও সত্য হল। পরপর সাত বছর হল প্রচণ্ড অজন্মা। গুদামজাত উদ্বৃত্ত ফসলে শুধু তাঁর রাজ্যের নয়, প্রতিবেশী রাজ্যের প্রজাদেরও হল প্রাণরক্ষা। অসংখ্য মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করল একটি স্বপ্ন।

আড়াই হাজার বছর আগে আবির্ভাব ঘটেছিল বুদ্ধদেবের। তাঁর জন্মের আগে জননী মায়াদেবী স্বপ্নে দেখলেন–আকাশে এক বিরাট শ্বেত হস্তী। সেই হস্তীটি ধীরে ধীরে নীচে নেমে এসে তার উদরে ঢুকে গেল। পণ্ডিতেরা বিচার করে বললেন, শ্বেতবর্ণ শুদ্ধসত্ত্বের প্রতীক অর্থাৎ বিরাট এক শুদ্ধসত্ত্ব পুরুষ তার গর্ভে এসেছেন। পরবর্তীকালে জন্ম হল শ্রীবুদ্ধের। তাঁর প্রথম জীবনে বহু স্বপ্নের কথা পাওয়া যায়। তাঁর অন্যতম প্রধান শিষ্য আনন্দ অস্পৃশ্যতার অজ্ঞানমুক্ত হয়েছিলেন একটি স্বপ্নে শিক্ষা লাভ করে।

ওল্ড টেস্টামেন্টের মত নিউ টেস্টামেন্টেও প্রচুর স্বপ্ন কাহিনী আছে। যীশু মাতৃগর্ভে এলে পিতা যোসেফ স্বপ্ন দেখলেন–এক দেবদূত তাকে বলছেন, তোমার স্ত্রী এক পুত্র সন্তান প্রসব করবে। তার নাম রেখো যীশু (ত্রাণকর্তা)। কারণ তিনি বহু মানুষকে পাপ থেকে ত্রাণ করবেন। যীশুর জন্মের পর যোসেফ আবার স্বপ্নে দেখলেন এক দেবদূত বলছেন, রাজা হেরোদ যীশুকে বধ করার জন্য অনুসন্ধান করছে তুমি শীঘ্র মিশরে

পলায়ন কর। পরে হেরোদ মারা গেলে স্বপ্নেই যোসেফ তা জানতে পারলেন এবং ইস্রায়েলে ফিরে আসার নির্দেশ পেলেন। গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস বন্দিদশায় স্বপ্নে দেখলেন, এক দেবী বলছেন, "নির্দিষ্ট দিনের একদিন পর তোমার মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী হবে।" উনি সকলকে জানালেন, রাজার আদেশ নয়, স্বপ্নের বাণীই সত্য হবে। বাস্তবে তাই-ই হয়েছিল।

ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মহম্মদের কথায় আসা যাক। মহম্মদ যখন মাতৃগর্ভে তখন জননী আমিনা একদিন স্বপ্নে দেখলেন- আকাশের ওপার হতে জ্যোতির্ময় ফিরিশতারা (দেবদূতেরা) মিছিল করে এগিয়ে আসছেন। মুখে তাদের 'মারহাবা' (সাবাস) ধ্বনি। জয়ধ্বনি করতে করতে আকাশ ঘুরে সেই মিছিল অবশেষে আমিনার কুটির প্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হল। দিনের আলো ফুটল। আমিনার কোল আলো করে আবির্ভূত হলেন মহম্মদ। গর্ভাবস্থাতেই আমিনা স্বপ্নে দেখেছিলেন যে তার প্রাণের দুলালের নাম রাখা হয়েছে মহম্মদ। মহম্মদ কথার অর্থ চরম প্রশংসিত। চল্লিশ বছর বয়সে মহম্মদ প্রথম প্রত্যাদেশ লাভ করেছিলেন স্বপ্নের অনুভূতিতে। সেই স্বপ্নে তিনি আল্লার দূত জিব্রাইলকে প্রথম দেখলেন। এর বারো বছর পর মহম্মদ একটি বিশিষ্ট অনুভূতির মাধ্যমে আল্লার সান্নিধ্য লাভ করেন। এই অনুভূতিকে বলে মে'রাজ ভ্রমণ। অনেকের মতে এটিও স্বপ্নের ব্যাপার। একদিন রাত্রিবেলা জিব্রাইলের সঙ্গে মহম্মদ মক্কা থেকে যাত্রা করলেন বোরাকে চড়ে। বোরাক জীবটি ছিল অর্ধেক খচ্চর অর্ধেক গাধা। তার দু'পাশে দুটি পাখা। তিনি প্রথমে উপনীত হন জেরুজালেমের মন্দিরে। স্থূল শরীরে তিনি কিন্তু কখনও জেরুজালেম যাননি। পরে এক এক করে সপ্ত আকাশ পরিভ্রমণ করলেন। এক একটি আকাশে এক এক হযরতের সঙ্গে মোলাকাত করলেন। প্রথম আকাশে আদম, দ্বিতীয় আকাশে ঈশা, তৃতীয় আকাশে ইউসূফ, চতুর্থ আকাশে মুসা ও সপ্তম আকাশে ইব্রাহিমের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। তারপর তিনি জ্যোতির আবরণের (হেজ্বাবে নূর) সামনে এসে দাঁড়ালেন। ওপারে জ্যোতির রাজ্যে আল্লা বিরাজ করছেন। আল্লার আহ্বান ধ্বনি তিনি শ্রবণ করলেন। আরও সমীপবর্তী হয়ে প্রত্যাদেশ সকল অবগত হলেন। এই অনুভূতি কালেই মহম্মদ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের শেষ বিধান লাভ করেছিলেন আল্লাহতালার কাছ থেকে।

একবার তিনি শত্রু সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছিলেন। কী করা যায় ভাবছেন। অনুগামীরা অনেকে অনেক রকম পরামর্শ দিলেন। রাত্রে মহম্মদ স্বপ্ন দেখলেন যে তিনি অনুগামীদের নিয়ে রয়েছেন একটি দ্বীপের মধ্যে। বুঝলেন, আল্লার নির্দেশ আছে এই স্বপ্নে। চারিদিকে বিপদ সমুদ্র, কিনারা মিলবে না। যেখানে আছেন সেই একমাত্র নিরাপদ স্থান। তিনি স্থির অচঞ্চল হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিছুদিন অবরোধ

করার পর শত্রুরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল। মহম্মদ সানন্দে আল্লার আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে জয় যাত্রায় এগিয়ে যেতে লাগলেন। সামাজিক বিচার কালেও স্বপ্নের উপর তিনি বেশী গুরুত্ব দিতেন। কখনও কখনও নিজে হয়ত কোন বিচারের রায় দিয়েছেন কিন্তু রাত্রে স্বপ্নে দেখলেন যে আল্লা অন্যরূপ বিচারের নির্দেশ দিচ্ছেন। পরের দিন উভয় পক্ষকে পুনরায় ডেকে স্বপ্নে পাওয়া আল্লার ভিন্নতর বিধানের কথা জানিয়ে দিতেন এবং তাদের অনুরোধ করতেন আল্লার নির্দেশ মেনে চলার জন্য, কেননা তাতেই তাদের প্রকৃত কল্যাণ।

এইভাবে জীবনের সব ক্ষেত্রেই স্বপ্নের নির্দেশ অনুসারে মহম্মদ চলতেন। মুসলমান ধর্মে বিশিষ্ট উৎসব কোরবাণীর মূলেও আছে হযরত ইব্রাহিমের দেখা একটি স্বপ্ন—একথা সকলেই জানেন।

এবার আমরা আসব বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের স্রষ্টা রামানুজের প্রসঙ্গে। তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন দিল্লীর সম্রাটের* প্রাসাদের মধ্যে বিগ্রহ মূর্তি রয়েছে। তিনি নির্দেশ পেলেন ঐ মূর্তি নিয়ে এসে শ্রীরঙ্গপত্তনমে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সুদূর দক্ষিণ ভারত থেকে তিনি পদব্রজে দিল্লীর সম্রাটের কাছে উপনীত হলেন। নিবেদন করলেন স্বপ্নের কথা। পাওয়া গেল সেই মূর্তি। প্রতিষ্ঠাও হল।

এরপর আলোচনা করব শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কথা। চব্বিশ বছর বয়সে তিনি স্বপ্নে মন্ত্র পেলেন। তাঁর জীবনে আমূল পরিবর্তন সূচিত হল। নিমাই পণ্ডিত রাতারাতি হয়ে গেলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। পরে সন্ন্যাস গ্রহণকালে সেই মন্ত্র কেশব ভারতীর কানে প্রদান করে তার কাছ থেকে আবার সেই মন্ত্রই গ্রহণ করেছিলেন। কেননা স্বপ্নে মন্ত্র পেলে আর মন্ত্র নিতে নেই। তাঁর পরবর্তী জীবনের বহু ঘটনাও স্বপ্নের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে মিলিত হবার আগে তিনি তাকে স্বপ্নে দেখেছিলেন। এছাড়া দেখা যায় মহাপ্রভু তাঁর শেষ জীবনে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা, নৌকাবিহার, বনবিহার ইত্যাদি লীলা মাধুর্য স্বপ্নেই অনুভূতি করেছিলেন।

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত সমাপ্ত করেছেন শ্রীপুণ্ডরিক বিদ্যানিধি মশায়ের এক স্বপ্নের অনুভূতি উল্লেখ করে। ওড়ন ষষ্ঠীর (নীল ষষ্ঠী) দিনে প্রথানুযায়ী পুরীধামে বিগ্রহমূর্তিতে ভাতের মাড় দিয়ে কাচা বস্ত্র পরানো হচ্ছে দেখে সেবাইতদের সম্বন্ধে বিদ্যানিধি মশায়ের মন বিরূপ হয়ে উঠল। রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন- শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশ্রীবলরাম তার কাছে এলেন। সেবাইতদের মনে মনে অশ্রদ্ধা করার জন্য তার গালে আচ্ছা করে থাবড়া মারলেন। গাল ফুলে উঠল। আংটি সমেত আঙুলের দাগ গালে বসেছিল। প্রভাতে শ্রীস্বরূপদামোদর এসে দেখেন বিদ্যানিধি মহাশয়ের গাল ফোলা

*সম্ভবত পৃথ্বিরাজ চৌহান - ১ (১০৯০-১১১০)

আর গালে আংটি সমেত আঙুলের দাগ। ধন্য পুণ্ডরিক!

পশ্চিম ভারতের মহারাষ্ট্রের মরমী সন্ত ও কবি শ্রীতুকারামের জীবন স্বপ্ন লীলার কাহিনীতে পূর্ণ। তুকারাম ছিলেন নিরক্ষর। ছেলে বয়সেই বাবা মাকে হারিয়েছিলেন। খুব অল্প বয়সে বিবাহ করেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত প্রথমা স্ত্রী ও সন্তানকে হারাতে হয়। দ্বিতীয় বার বিবাহ করলেন কিন্তু সে বিবাহ মোটেই সুখের হয়নি। ক্ষোভে দুঃখে তিনি গৃহত্যাগ করলেন। যার কেউ নেই তার ভগবান আছেন। গৃহদেবতা বিঠোবা (শ্রীকৃষ্ণ) স্বপ্নে তাকে সচ্চিদানন্দগুরু রূপে বরণ করলেন, সাধন শিক্ষা দিলেন, দোঁহা লিখতে শেখালেন এবং জীবনের প্রায় সব কাজে নির্দেশ দিতেন।

বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক রেণে দেকার্তে সেনাবাহিনীতে কাজ করতেন। স্বপ্ন দেখে তার জীবনের আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়। এবং তিনি একজন মৌলিক চিন্তাধারার দার্শনিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা পান।

ফিরে আসি শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়। তাঁর জন্মের এক বছর আগে গয়াধামে পিণ্ড দিতে এসে তাঁর পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় স্বপ্নে দেখলেন - গৃহদেবতা রঘুবীর বলছেন আমি তোমার সন্তান হয়ে জন্মাব। উনি বললেন, 'আমি গরীব ব্রাহ্মণ, তোমাকে কী খাওয়াব ?' রঘুবীর বললেন, 'তার জন্য তোমাকে চিন্তা করতে হবে না।' যথাকালে আবির্ভূত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। দীর্ঘ একত্রিশ বছর তিনি দক্ষিণেশ্বরে থাকবেন, লীলা করবেন, সৃষ্টি করবেন নতুন ইতিহাস, তাই রাণী রাসমণি স্বপ্নে আদেশ পেয়ে তৈরী করলেন দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির। রামবাবু স্বপ্নে মন্ত্র পেয়েছিলেন। তার পরদিন সকালে দক্ষিণেশ্বর এসে শ্রীরামকৃষ্ণকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে বললেন, স্বপ্নে আমায় মন্ত্র দিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বসেছিলেন। উঠে দাঁড়িয়ে নাচতে লাগলেন আর বললেন, 'স্বপ্নসিদ্ধ যেই জন মুক্তি তার ঠাঁই।'

স্বপ্নসিদ্ধ লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার প্রাণ দান করে প্রতিষ্ঠা করেছেন। মাষ্টার মশাইকে তিনি বলছেন, 'যদি স্বপ্নে আমায় উপদেশ দিতে দ্যাখ জানবে সে সচ্চিদানন্দ।' সচ্চিদানন্দ-আত্মা-ভগবান-ব্রহ্ম চিৎঘনকায় মূর্তি ধারণ করে দেহ থেকে মুক্ত হয়ে দেহীর প্রতি কৃপা করেন। রামবাবু, মাষ্টারমশাই, বাবুরাম মহারাজ এবং আরও কয়েকজন ভাগ্যবান শ্রীরামকৃষ্ণকে স্বপ্নে সচ্চিদানন্দগুরু রূপে লাভ করেছিলেন। তাঁকে প্রথম স্বপ্নে দেখেন 'কাপ্তেন'– শ্রীবিশ্বনাথ উপাধ্যায়, নেপালের মহারাজার কন্সল (Consul)। 'দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর বাড়ী। বেলতলার দিকে দরজা। দরজার বাইরে গোবরের স্তূপ। স্তূপের উপর বিরাট পদ্ম। শ্রীরামকৃষ্ণ পাশে দাঁড়িয়ে পদ্ম ফুলটি দেখাচ্ছেন কাপ্তেনকে। শ্রীভগবান দেখিয়ে দিলেন তাঁর লীলার কাহিনী এ যুগে। পদ্মফুল-সহস্রার। গোবরের স্তূপ–দেহ-সংসার। চারিদিকে কামিনী কাঞ্চন, ভোগের বিপুল আয়োজন, বিকট আস্ফালন। তারই মাঝে তবুও ফুটবে সহস্রার পদ্মফুল। তাঁর ইচ্ছা!'

তাই দেখি শ্রীজীবনকৃষ্ণকে স্বপ্নে সচ্চিদানন্দ রূপে লাভ করেছে সংখ্যাতীত মানুষ, জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে—স্বপ্নেই সর্বাঙ্গীন সাধন ও অনুভূতি হচ্ছে তাদের। একথা এখন জোর দিয়ে বলা যায় যে সাংসারিক জটিলতা ও কর্মব্যস্ততায় অস্থির মানুষের নিশ্চিন্ত অবসর নিদ্রার মধ্যে অন্তর্যামী দেবতা ওঠেন জেগে, স্বপ্নের পথে মানুষকে নিয়ে চলেন আনন্দময় অনুভূতির রাজ্যে। স্বপ্নেই পাওয়া যায় শ্রীভগবানের অস্তিত্বের সাক্ষ্য, প্রকাশ পায় তার লীলার ঐশ্বর্য, কৃপার পরিচয়। তাইতো শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন— 'স্বপন কি কম গা ?'

"হ্যাঁ বাবা কিছু স্বপ্ন দেখেছিস ? বাঃ বেশ। কী দেখেছিস রে ? ওরে বলনা! তুই তো বলবি মানুষের দেহে ভগবানের লীলার কথা। সেই তো সত্যিকারের ভাগবত রে! পুঁথি ভাগবতের চেয়ে সে যে অনেক বড় জিনিস।"

—শ্রী জীবনকৃষ্ণ

পাঠচক্রের ইতিহাস

১৩৮৮ সালে কলকাতার হাওড়া মোটর কোম্পানীর এক উচ্চ পদস্থ অফিসার শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় অবসর জীবন কাটাবার উদ্দেশ্যে শ্রীনিকেতন সংলগ্ন সুরুল গ্রামে একটি বাড়ী কিনে বসবাস করতে শুরু করেন। বাড়ীটির নাম দেন 'মৃন্ময়ী'। দীর্ঘকাল শ্রীজীবনকৃষ্ণের পূতসঙ্গলাভে ধন্য, সুপণ্ডিত ও বাগ্মী এই মানুষটি তাঁর আকাঙ্ক্ষিত পরিবেশ না পেয়ে ১৩৯০ সালে কলকাতায় ফিরে যাবার কথা ভাবতে শুরু করেছেন, ঠিক সেই সময় ঐ গ্রামেরই এক ছাত্র স্নেহময় গাঙ্গুলীর সাথে তাঁর আলাপ হয়। 'রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের জগৎ' নামে একটি বই-এর বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি জানালেন, সর্বজনীন সর্বকালীন মানুষ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎবাণী বাস্তবরূপ পেয়েছে। তিনি শ্রীজীবনকৃষ্ণের কথা পাড়লেন। ছাত্রটি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ল। 'ধর্মে প্রমাণ আছে'– শ্রীজীবনকৃষ্ণের এই বাণী তার অন্তরকে দারুণভাবে আলোড়িত করল। পরদিন সন্ধ্যাবেলা পার্শ্ববর্তী গ্রাম জামবুনীতে গিয়ে ভগ্নীপতিকে শ্রীজীবনকৃষ্ণ বিরচিত 'ধর্ম ও অনুভূতি' বইটি থেকে নিবেদন অংশ পড়ে শোনাল। বোন বিশাখা রান্নার কাজে ব্যস্ত ছিল। ও এসব আলোচনা শোনেনি। অথচ একদিন পর ওর বোন জানাল যে ও একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছে! স্বপ্নে এক বৃদ্ধ ওকে বলল, 'তুই মন্ত্র নিবি ?' ও বলল, 'হ্যাঁ'। বৃদ্ধটি বলল, 'এত অল্প বয়সে মন্ত্র নিবি ?' বলেই হাসতে লাগল। বৃদ্ধটির পা জড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছিল একটি শিশু। তাদের পিছনে একটা দেওয়াল দেখা গেল। সেখানে আলোর অক্ষরে অজস্র মন্ত্র ফুটে উঠল। দৃশ্যটি মিলিয়ে গেল। তারপর দু'টি সোনার বল দ্রষ্টার দিকে বেগে ছুটে এল। ভয়ে দ্রষ্টার ঘুম ভেঙ্গে গেল। স্নেহময় স্বপ্নটির অর্থ জানতে জিতেনবাবুর কাছে গেল। উনি সব শুনে রোমাঞ্চিত হলেন, বললেন, "বিশাখা নিশ্চয়ই জীবনকৃষ্ণকে দেখেছে। তুমি জীবনকৃষ্ণের ফটো নিয়ে গিয়ে দেখাও। স্বপ্নে দেখাচ্ছে ওর জ্ঞানচক্ষু তথা আত্মিক দৃষ্টি লাভ হবে। মহাপুরুষের দেহে (দেওয়ালে) জেগে ওঠা ব্রহ্মজ্ঞান তথা তাঁর অমৃতবাণী বুঝতে সক্ষম হবে।" বিশাখাকে ফটো দেখাতেই ও বিস্মিত হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, আমি এঁকেই দেখেছি!' শুরু হল শ্রীজীবনকৃষ্ণের শ্রীনিকেতন লীলা।

স্নেহময় ও তার এক বন্ধুকে নিয়ে জিতেনবাবু সপ্তাহে একদিন (মঙ্গলবার) তাঁর বাড়ীতেই পাঠ শুরু করলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই পাঠের লোক সংখ্যা বাড়তে লাগল। এলেন শ্রীগোবিন্দ গাঙ্গুলী, আভা মণ্ডল, আল্পনা মুখার্জী ইত্যাদি, আর এলো শ্রীনিকেতনের কৃষি কলেজের ছাত্র সুশীল ঘোষ, শুভাশীষ চক্রবর্তী, পার্থ রায়চৌধুরী ও আরও অনেকে। পাঠ জমে উঠল। সুশীল ঘোষ একদিন স্বপ্নে দেখল–'পথে যেতে যেতে আমার মুণ্ডটা

খসে পড়ল। খুব আনন্দ হল। ভাবলাম আমার মুখ এতদিন আমি আয়নাতেই দেখে এসেছি, এই সুযোগে আমার স্বরূপটা ভাল করে দেখে নেবো। কিন্তু মাথাটা দেখা মাত্র চমকে উঠলাম, স্পষ্ট বুঝতে পারলাম এ মূর্তি আমার নয়, জীবনকৃষ্ণের। স্বপ্নেই মনে হল, আমি তো শুনেছি মানুষের মৃত্যুর পর তার আত্মা থেকে যায়; কিন্তু আমি আত্মার কোন রূপ তো দেখলাম না। দেখলাম শ্রীজীবনকৃষ্ণের রূপ। তাহলে যা মৃত্যুর পরেও থেকে যায় সেই আত্মার রূপই কি শ্রীজীবনকৃষ্ণের রূপ ?'

এমনিভাবে শ্রীজীবনকৃষ্ণের প্রকাশ হতে লাগল বহু জনের বহু বিচিত্র দেবস্বপ্নে। পাঠে যোগ দিল কমল মালাকার, ছবি দাস, সমীর ঘোষ (মহুলা), তারক গড়াই প্রভৃতি। এলেন পল্লী সংগঠন বিভাগের অধ্যক্ষের স্ত্রী পারুল চক্রবর্তী, ডাক্তার ইন্দুজ্যোতি ঘোষের স্ত্রী রেবা ঘোষ এবং মীরা সরকার। প্রত্যেকেই শ্রীজীবনকৃষ্ণকে অন্তরে দেখে ধন্য হতে লাগলেন। দুটি স্বপ্ন নির্দেশ পাওয়া গেল এই মর্মে যে পাঠচক্রের সকলের অনুভূতি নিয়ে 'মানিক' নামে একটি হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ করতে হবে। এই পত্রিকার খুঁটিনাটি সমস্ত বিষয়ে অজস্র স্বপ্ন নির্দেশ আসতে লাগল। কী কী রং ব্যবহার করতে হবে, কী জাতীয় শিরোনাম হবে, প্রচ্ছদ কী হবে ইত্যাদি সব কিছুই জানা গেল বিভিন্ন জনের স্বপ্নের মাধ্যমে। **১৩৯১** সালে ৭ই জ্যৈষ্ঠ মানিকের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হল। পত্রিকার প্রচ্ছদ সাজাবার দায়িত্ব নিলেন শোলাশিল্পী কমল মালাকার। কিছুদিন পর তিনি স্বপ্নে দেখলেন স্টলে অনন্ত মালাকার একমনে শোলার সূক্ষ্ম কাজ করছেন। কাছে গিয়ে মুখের দিকে ভাল করে তাকাতেই চম্‌কে উঠলেন, আরে এ যে আমাদের ঠাকুর স্বয়ং! এরপর থেকে কমলের হাতের কাজ অন্য এক মাত্রা পেল। জীবন শিল্পীকে অন্তরে পেয়ে কর্মের সাথে ধর্মজীবনও সমানতালে চলল এগিয়ে—ঈশ্বরের অনন্ত মহিমা উপলব্ধির সুযোগ হতে লাগল।

প্রেমময় গাঙ্গুলী স্বপ্নের ব্যাপারটা বিশ্বাস করত না। হাসাহাসি করত। একদিন সে স্বপ্নে দেখল – সিনেমার পর্দায় মহাযোগী শ্রীজীবনকৃষ্ণ ধ্যানমগ্ন। দর্শকের আসন থেকে ছুটে গিয়ে জীবনকৃষ্ণের পায়ে প্রণাম জানিয়ে অন্তরে এক গভীর তৃপ্তি অনুভব করল। এই স্বপ্নের পরও কিন্তু প্রেমময় মৃন্ময়ী বাড়িতে পাঠে যেত না। একরাত্রে স্বপ্নে নির্দেশ পেল ওখানে যাবার জন্য। তখন থেকে যেতে শুরু করল। এবং কিছুদিন পর থেকেই ওর স্থূলে কুণ্ডলিনী জাগরণ প্রত্যক্ষ করে সকলে বিস্ময়ে অভিভূত হল। অনেকে এ জিনিসকে রোগ বিশেষ বলে ভাবল। পাঠচক্রের এক সদস্যা ছবি ব্যানার্জীর সংশয় কাটেনি। কয়েকদিন পর স্বপ্নে তাঁর নিজের কুণ্ডলিনী জাগরণ হল। পরদিন পাঠে তার সংশয় মোচনের বিচিত্র স্বপ্নটি নিবেদন করলেন। এমনি করে ধীরে ধীরে শ্রীনিকেতন পাঠচক্র ক্রমেই প্রসার লাভ করতে লাগল। এলেন শ্রীমতি সন্ধ্যা রুদ্র, অঞ্জলি গড়াই, শিবানী গড়াই, নিখিল দাস, প্রণতি সিংহ, রেন্টু চক্রবর্তী, গোপাল মুখার্জী প্রভৃতি আরও অনেকে।

শ্রীনিকেতন লীলায় নতুন অধ্যায় সংযোজিত হল যখন থেকে কিছু মুসলিম ছেলে এই পাঠচক্রে যোগ দিল। ফজলুল হক একদিন স্বপ্নে দেখল—ফটো থেকে জীবন্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ। তিনি বললেন—"তোর এত ছোটাছুটি করবার কী দরকার ? তুই আমাকেই ভাব, তাহলেই হবে, আমিই তো ভগবান!" এরপর তিনি ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আর এক স্বপ্নে দেখলেন, চারিদিক অন্ধকার, শুধু সামনে একটু জায়গা আলোকিত, সেখানে শ্রীজীবনকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি একটি লেখা কাগজ এগিয়ে দিয়ে বললেন, "জানবি, লোকে জানে আমি ভগবান।"

আমি ভগবানকে দেখেছি—এমন কথা না বলে শ্রীজীবনকৃষ্ণ বলতেন, 'ঠাকুর কৃপা করে আমাকে ভগবান দর্শন করিয়ে দিয়েছেন। ফজলুলের স্বপ্নে সেই একই সুরে তিনি তাঁর ভগবানত্বের সত্যতা ঘোষণা করছেন। এরপর বহু বিচিত্র স্বপ্নে ফজলুল শ্রীজীবনকৃষ্ণকে দেখতে লাগল। ওর এক স্বপ্ন* থেকে আমরা জেনেছি শ্রীজীবনকৃষ্ণই সেই আদি পুরুষ তথা অখণ্ড চৈতন্য যার প্রকাশে মানুষের জীবচৈতন্য শিবচৈতন্যে পরিবর্তিত হয় – মানুষের ভিতরের আদিম মানুষটা সভ্য মানুষ হয়ে ওঠে। তাঁর পুনরাবির্ভাব কামনা মানুষের মনে যুগ যুগ ধরে এক অতিমানবের দর্শনাকাঙ্খা জাগিয়ে তুলেছে। তাই বুদ্ধদেবকে মানুষ বললো 'তথাগত'। চৈতন্যদেব বললেন, 'মুই সেই'। কিন্তু প্রমাণ ফুটে ওঠেনি জগতে। তাই রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'পূর্ণপুরুষ আগন্তুক। তাঁর রথ ধাবমান। রথ চলার ঘর্ঘর ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। কিন্তু তিনি এখনও এসে পৌঁছাননি।' শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবসানের পর স্বামী বিবেকানন্দ বললেন, 'The hour comes when great men shall arise and cast off these kindergartens of religions and shall make vivid and powerful the true religion, the worship of the spirit by the spirit' ইত্যাদি। শ্রীজীবনকৃষ্ণের আবির্ভাবে মানুষ সেই চির আকাঙ্খিত পূর্ণপুরুষকে অন্তরে পেল। ফজলুল হকের মত এই অঞ্চলের আরও অনেকের দর্শনে তার প্রমাণ ফুটে উঠল যার কিছু কিছু উল্লেখ পাওয়া যাবে 'মানিক' পত্রিকায়। 'ফজলুল' শব্দের অর্থ ভগবানের উপহার। বাস্তবিক ফজলুল ছিল শ্রীনিকেতন পাঠচক্রে ঈশ্বরের এক অপূর্ব উপহার।

একজন মুসলিম ফেরিওয়ালা, নাম তার সেখ আলিমুদ্দিন, ইলামবাজারে এক ক্লাব

*_দেখছি জঙ্গলের মধ্যে বসে আদিম যুগের কয়েকজন মানুষ কাঁচা মাংস চিবিয়ে খাচ্ছে। হঠাৎ সেখানে একজন ধুতি পাঞ্জাবি পরা বাঙালি ভদ্রলোক এলেন। এই মানুষটি আসার সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্য বদলে গেল। দেখি একটা বড় হলঘরে ভোজসভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বুনো মানুষগুলো কোন অজানা মন্ত্রবলে সকলেই আধুনিক সভ্য মানুষ হয়ে গেছে। তারা সেখানে চেয়ারে বসে কাঁটা চামচ দিয়ে রান্না করা আধুনিক খাবার খাচ্ছে। ...দেখতে দেখতে একরাশ বিস্ময় নিয়ে স্বপ্ন ভাঙলো।_

স্বপ্ন ভাঙার পর মনে হলো, আরে, ঐ স্বপ্নদৃষ্ট বাঙালি ভদ্রলোক হিসেবে আমি তো জীবনকৃষ্ণকে দেখলাম। তবে কি উনিই সেই আদিপুরুষ যার আবির্ভাবে মানুষ সভ্য হয়েছিল ?

ঘরে দুপুরবেলা কাপড়ের বোঝাটির উপর মাথা রেখে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। হঠাৎ দেখলেন তাঁর সামনে এক উজ্জ্বল মনুষ্যমূর্তি তার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। একটু পর ঐ মূর্তি অদৃশ্য হল। দীর্ঘ দু'বছর ধরে সেই ফেরিওয়ালা বিভিন্ন স্থানে খোঁজ খবর নিয়ে তিনি কাকে দেখলেন তা জানার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কোনও হদিস মেলেনি। হঠাৎই এক গ্রীষ্মের দুপুরে কমল মালাকারের বাড়ীতে জলপানের উদ্দেশ্যে হাজির হলেন। সেখানে দুই-তিনজন জীবনকৃষ্ণ অনুরাগী স্বপ্ন আলোচনা করছিলেন। ঐ আলোচনা তার কানে যাওয়ায় তিনি নিজের দর্শনের কথা তাদের বললেন। তাকে জীবনকৃষ্ণের ফটো দেখানো হল। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তিনি বললেন, 'আমি যে এই মহাপুরুষকেই দেখেছি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আজ আমি পরম শান্তি পেলাম।'

শ্রীনিকেতন বাজারে ক্ষৌরকারের কাজ করে মহম্মদ সৌকত আলী। তিনি কয়েকদিন পাঠে আসার পর একদিন নামাজ পড়তে গিয়ে সারাক্ষণ তার পাশে শ্রীজীবনকৃষ্ণকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন স্থূলে। আর একদিন গভীর রাত্রে নির্জন রাস্তা পেরিয়ে ভয়ে ভয়ে বাড়ী যাচ্ছেন। জীবনকৃষ্ণকে মনে মনে স্মরণ করছেন। এমন সময় দেখলেন ওনার ঠিক পিছনেই খালি গায়ে হাঁটু পর্যন্ত ধুতি পরে এক ভদ্রলোক হাঁটছেন। উনি গ্রামের কাছে আসতেই ঐ ভদ্রলোক বললেন, 'ভয় নেই, বাড়ী যা।' পিছন ফিরে আর ওনাকে দেখতে পেলেন না। বাড়ী গিয়ে দরজায় কড়া নাড়তেই স্ত্রী উঠে এসে দরজা খুলে দিল। বলল, "আমি একটা সুন্দর স্বপ্ন দেখছিলাম। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এসে বললেন, 'মা, তুই কোন চিন্তা করিস না। আমি আছি, তোর কোন ভাবনা নেই।' ঠিক এই সময়েই দরজার কড়া নাড়ার শব্দ হ'ল। ঘুম ভেঙে গেল। স্বপ্নে দেখা বৃদ্ধের যে বর্ণনা উনি দিয়েছিলেন তা হুবহু শ্রীজীবনকৃষ্ণের সাথে মিলে গেল।

পাঠের প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়তে থাকায় সপ্তাহে দু'দিন পাঠ করা হবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। মঙ্গল ও বুধবার। ঝড় জল মাথায় নিয়ে সাত মাইল দূরে সুপুর গ্রাম থেকে রামকৃষ্ণ ভদ্র, নরেন দত্ত ও শান্তিময় সরকার নামে তিনটি যুবক সাইকেলে চড়ে প্রতি সপ্তাহে পাঠ শুনতে আসত। তাদের এই নিষ্ঠা বাকীদের আরও বেশী করে উদ্বুদ্ধ করল। যেদিন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বেশী মাত্রায় হত প্রত্যেকেই ভাবত আজ নিশ্চয়ই অন্য কেউ পাঠে যাবে না, আমি কিন্তু যাবই, জ্যাঠামশাই (জিতেনবাবু) দেখে বুঝবেন জীবনকৃষ্ণের প্রতি আমার টান কত আন্তরিক। কিন্তু মৃন্ময়ীতে ঢুকে অবাক হয়ে দেখতেন ঘর ভর্তি হয়ে গেছে শ্রোতাদের উপস্থিতিতে।

পাঠের দিন ছাড়াও সপ্তাহের বাকী দিনগুলিতে বিকালে স্বপ্ন আলোচনার আসর বসত মৃন্ময়ীতে। বেশ কিছু শিক্ষিত যুবক-যুবতীকে নিয়ে জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে কেন্দ্র করে ব্রহ্মবিদ্যা চর্চার এক অভিনব আয়োজন পূর্ণতার পথে পা বাড়াল। আর অগ্রগতির জীবন্ত

দলিল হিসাবে বছরে দুটি করে 'মানিক' পত্রিকা প্রকাশিত হতে লাগল। প্রতিদিনই নতুন কিছু শেখার সুযোগ হত। কেউ না কেউ বিশেষ ধরণের শিক্ষণীয় স্বপ্ন দেখত। জীবনকৃষ্ণকে অন্তরে দেখে ব্রহ্মবিদ্যার সূচনা হয় দেহেতে। তারপর ক্রমাগত এগিয়ে চলা। অনন্ত অসীম পরব্রহ্মকে জানার শেষ নেই। তাঁর ঐশ্বর্যের অন্ত নেই। এই আপনাকে জানার পথে শ্রীনিকেতন পাঠচক্রে আশ্রিত মানুষেরা কিভাবে এগিয়ে চলেছে তার কিছু বিবরণ সংকলিত করে ৭ই জ্যৈষ্ঠ জীবনকৃষ্ণের জন্মদিনে প্রভাতী অনুষ্ঠানে পাঠ করা হত। এই জন্ম দিনের অনুষ্ঠান নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হল। কারণ যতদিন দেহ নিয়ে শ্রীজীবনকৃষ্ণ বেঁচেছিলেন, তিনি তাঁর জন্মদিন পালন সমর্থন করেন নি। কালের পরিবর্তনে এ বিষয়ে নতুন চিন্তা কতটা যুক্তিসংগত তা নিয়ে মতভেদ দেখা দিল। শ্রীদর্পনারায়ণ পাল জন্মদিন পালনের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু আল্লা সুকৌশলী, তিনিই স্বপ্নে দেখলেন– "মৃন্ময়ী বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ। উনি তাঁকে সরাসরি প্রশ্ন করলেন, 'আপনার জন্মদিন পালন করা কি ঠিক হবে ?' শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, 'হ্যাঁ।' তখন আবার শ্রীপাল জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার জন্মদিন পালন করব কেন ?' শ্রীজীবনকৃষ্ণ উত্তরে বললেন, 'অনুভূতি হবে'। উনি বললেন, 'এ কথা আমি বিশ্বাস করি না'। স্মিতহাস্যে শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, 'করেই দ্যাখ না'। তারপর তিনি গেটের দিকে না গিয়ে সোজা রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলেন। দ্রষ্টা আদর্শ সম্পর্কে কী একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি অনেকটা এগিয়ে গেছেন। তাঁর পিছনে লেখা 'আদর্শ' কথাটা দ্রষ্টার চোখে ভাসতে লাগল।" জন্মদিনের অনুষ্ঠান করে হবে অনুভূতি, আর তার আলোয় দৃষ্টি হবে স্বচ্ছ। আমরা উপলব্ধি করতে পারব যে শ্রীজীবনকৃষ্ণ মনুষ্য জাতির আদর্শ পুরুষ। স্বপ্নটির সত্যতার প্রমাণ পাওয়া গেল হাতে হাতে। ৭ই জ্যৈষ্ঠের অনুষ্ঠানের পরদিন খোঁজ নিয়ে দেখা গেল যারা সেদিন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন তারা প্রায় সকলেই ঐ রাত্রে দেবস্বপ্ন দেখেছেন।

কিছুদিন পর শ্রীনিকেতন বেড়াতে এলেন শ্রীজীবনকৃষ্ণের সঙ্গলাভে ধন্য শ্রীজ্যোতির্ময় বসাক। তিনি টেপে ঐ জন্মদিনের অনুষ্ঠান শুনতে শুনতে ধ্যানে ডুবে গেলেন। দর্শন হল-–শ্রীজীবনকৃষ্ণ বলছেন, 'ওরে, শ্রীনিকেতনের শ্রী ফিরেছে।'

সংসারের নিষ্ঠুর রূপ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে মানুষের দেহের অফুরন্ত সৌন্দর্য্যের দিকে যাতে তা অনুক্ষণ আবদ্ধ থাকে তারই আয়োজন হিসাবে নিত্যনূতন চমকপ্রদ দর্শনের খবর আসত পাঠচক্রে। একবার বাংলাদেশ থেকে একটি মেয়ে এল শান্তিনিকেতনের সংগীতভবনে পড়বার উদ্দেশ্যে। মৃন্ময়ী বাড়ীতে Admission Test এর আগের রাত্রিটা কাটাল। পরদিন বিকালে স্বপ্নালোচনার আসরে সে যেন বিস্ফোরণ ঘটাল। ইসলাম ধর্মাবলম্বী এই কিশোরী (ডাক নাম বিম্বি) বলল, গতরাত্রে সে একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছে। রোজ কেয়ামতের দিন আল্লাতালাহ্ সকল জীবিত ও মৃত মানুষের বিচার করবেন বলে মুসলিমরা বিশ্বাস

করে। আজ যেন সেই রোজ কেয়ামতের দিন। আল্লার আবির্ভাবের জন্য সকলে উন্মুখ। এমন সময় দেখা গেল আকাশ থেকে আল্লা নেমে আসছেন। তিনি একজন মানুষ। ন্যাড়া মাথা, খালি গা, পরনে ধুতি, যোগাসনে উপবিষ্ট অবস্থায় ধীরে ধীরে নেমে এলেন। দেওয়ালে টাঙানো শ্রীজীবনকৃষ্ণের ফটোটির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'স্বপ্নে দেখা আল্লা ঠিক এনার মত দেখতে।'

একদিন সকালে হুগলীর (গুড়াপ) শ্রীপ্রভাত মুখার্জী জিতেনবাবুর সঙ্গে কিছুক্ষণ ঈশ্বরীয় কথা আলোচনা করলেন। সেই দিন দুপুরেই তিনি স্বপ্নে দেখলেন, তিনি একটি খাটে শুয়ে আছেন। হঠাৎ মনে হল এক ভদ্রলোক নীচে বসে আছেন। 'আপনি এখানে উঠে বসুন'– বলে উনি তাড়াতাড়ি ভদ্রলোককে ধরে খাটের উপর তুলে বসালেন। ভদ্রলোকের দেহ থেকে জ্যোতি বেরোচ্ছে। ভাল করে দেখে বুঝলেন উনি স্বয়ং জীবনকৃষ্ণ। প্রভাতবাবু বিস্মিত হলেন। তিনি অনুকূল ঠাকুরের নিষ্ঠাবান শিষ্য। পরদিন প্রাতে অভ্যাসমত ধ্যান করতে গিয়ে আবার দেখলেন, তাঁর গুরুদেব রয়েছেন দাঁড়িয়ে। হঠাৎ জীবনকৃষ্ণ ঐ ঘরে ঢুকতেই গুরুদেব মাথা নীচু করে কোন কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। এই দর্শনে জানা গেল সমস্ত প্রথাগত ধর্মীয় আচার পরিত্যাগ হয়ে যায় শ্রীজীবনকৃষ্ণকে অন্তরে লাভ করলে।

শিখা গোস্বামী এলেন সুরুলে তার মামার বাড়ীতে। স্নেহময়ের কাছে জীবনকৃষ্ণের কথা শুনে বললেন, তোমরা নিজেদের গুরুদেবকে ভগবান বলছ কেন ? স্নেহময় বলল, তিনি সত্যিই ভগবান তাই তাকে ভগবান বলি। তিনি কৃপা করলে স্বপ্নে তোমাকে জানিয়ে দেবেন যে তিনি কে ? সেই রাত্রি থেকে শুরু হল বিচিত্র সব স্বপ্ন দর্শন। প্রথম রাত্রেই তিনি দেখলেন–শ্রীজীবনকৃষ্ণ তার সামনে দাঁড়িয়ে, সম্পূর্ণ নিরাবরণ। ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠলেন। ঘুম ভাঙল। সে বার মাত্র বারোদিন মামার বাড়ীতে থেকে প্রায় ছয় সাতটি স্বপ্নে নানাভাবে শ্রীজীবনকৃষ্ণকে দর্শন করে তাঁকে জগতগুরু বলে মেনে নিয়ে চিরকুণ্ডার (ধানবাদ) বাড়ীতে ফিরে গেলেন। পরেও বহুবার শ্রীজীবনকৃষ্ণকে দর্শন করেছেন, পাঠচক্রে চিঠি লিখে সেই সব দর্শনের কথা জানিয়েছেন।

স্নেহময় একদিন সাঁইথিয়ায় বহড়া গ্রামে অনাদি মণ্ডলের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়ে চমকপ্রদ খবর নিয়ে এল। ঈশ্বরীয় কথা প্রসঙ্গে স্বপ্নের কথা শুরু হয়েছিল। অনাদি মণ্ডলের স্ত্রী শিবানী মণ্ডল একটি স্বপ্নের কথা বললেন। উনি দেখছেন, উনি যেন কোন মহাপুরুষের খোঁজে গঙ্গার ধারে ঘুরছেন। হঠাৎ একস্থানে দেখলেন রামকৃষ্ণের মত অনেকখানি দেখতে এক যোগী পুরুষ অথচ তিনি রামকৃষ্ণ নন বলেই মনে হচ্ছে স্বপ্নে। সেই যোগীর কাছে গিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন, অমনি ঘুম ভাঙল। স্নেহময়ের কাছে জীবনকৃষ্ণের ফটো ছিল। সেটি দেখাতেই ভদ্রমহিলা চমকে উঠে বললেন, আরে এই তো সেই মহাপুরুষ।

এরপর অনাদি মণ্ডল ও তার সেজ মেয়ে জীবনকৃষ্ণকে বেশ কয়েকবার স্বপ্নে দেখেছেন।

কীর্তনীয়া শ্রীভরত মণ্ডল এই পাঠচক্রে যোগ দেবার পর আসর আরও জমে উঠল। বাউলের সুরে ভরত মণ্ডলের কন্ঠে জীবনকৃষ্ণ বন্দনা যিনি শোনেন তিনিই অভিভূত হয়ে পড়েন। শ্রীমণ্ডল জীবনকৃষ্ণের কৃপায় প্রথম দিন পাঠ শুনতে শুনতে স্থূলে দর্শন করলেন যে পাঠকক্ষে শ্রীজীবনকৃষ্ণ ওনার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

দেখতে দেখতে কয়েকটি পরিবার জীবনকৃষ্ণময় হয়ে উঠল। তাদের বাড়ীতে যেসব আত্মীয়-স্বজন আসে তারাও তার আস্বাদ কিছুটা পায়। প্রেমময়দের বাড়ীতে একদিন মাত্র থেকেই ওর এক আত্মীয় (ষষ্ঠী খাওয়াস) রাত্রে স্বপ্নে দেখলেন শ্রীজীবনকৃষ্ণকে। পরদিন শ্রীজীবনকৃষ্ণের ফটো দেখিয়ে বললেন, 'ঐ ভদ্রলোককে কাল স্বপ্নে দেখেছি। উনি নাকে নস্যি নিয়ে রুমাল দিয়ে নাক পুঁছছিলেন।' অথচ ওনাকে আগে জীবনকৃষ্ণ সম্পর্কে কিছু শোনানো হয় নি। এমনিভাবে প্রতিদিনই এক একটি নতুন নতুন দর্শনের কথা শুনে শ্রীনিকেতন পাঠচক্রের অনুগামীরা এক স্বর্গরাজ্যের সৌন্দর্য্যরস পান করার সুযোগ পেতেন।

শ্রীজীবনকৃষ্ণকে দেখা পরিবারটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। বাড়ীর কাজের মেয়েরাও অদ্ভুতভাবে তাঁর দর্শন লাভ করে ধন্য হত। গোবিন্দ গাঙ্গুলীর বাড়ীতে কাজ করত সন্ধ্যা বাগ্দী। তিনি একদিন দেখলেন, মন্দিরের কালীমূর্তি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে দিব্যকান্তি জ্যোতির্ময় শ্রীজীবনকৃষ্ণের রূপ ধারণ করল। এমনি আরও কত বিচিত্র সব দর্শনের কথা জানাতেন পাঠে এসে। জিতেনবাবুর বাড়ীতে যে কাজ করত সে একদিন বলল, 'দাদু, আমি তো কাল স্বপ্নে জীবনকৃষ্ণকে দেখেছি কিন্তু ওনার গলায় পৈতে ছিল। উনি কি বামুন ?' জিতেনবাবু ওকে কেমন করে বোঝাবেন যে কায়স্থ বংশোদ্ভব এই মানুষটিকে (শ্রীজীবনকৃষ্ণ ঘোষ) কেন অন্যেরা অন্তরে ব্রাহ্মণ রূপে দর্শন করে!

আর এক পরিচারিকা গৌরী বাগ্দীর ঘটনা আরও বিস্ময়কর। তিনি বেশ কিছুদিন ধরে জীবনকৃষ্ণকে স্বপ্নে দেখছিলেন। কিন্তু জানতেন না কাকে তিনি দেখছেন। মেলার সময় মেলায় গিয়ে অসংখ্য লোকের ভীড়ে মনের মানুষটিকে খুঁজে বেড়াতেন। রাস্তা দিয়ে চলার সময় সব পথিকের দিকে ভাল করে নজর করতেন; কিন্তু কোথাও তার দেখা না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়লেন। একদিন স্বপ্নে দেখলেন—শ্রীনিকেতন বাজারে যাওয়ার পথে মৃন্ময়ী বাড়ীর পাশ দিয়ে যাবার সময় বাড়ীর ভিতর উঁকি মারলেন। দেখলেন অনেক লোকজন বসে রয়েছে, গুরুগম্ভীর আলোচনা হচ্ছে আর দেওয়ালে একজন মানুষের ফটো টাঙানো রয়েছে। ফটোটির দিকে দৃষ্টি পড়তেই শিউরে উঠলেন, এ যে সেই মানুষের ছবি, যাকে তিনি প্রায়ই স্বপ্নে দেখেন! ঘুম ভাঙল। পরদিন স্নেহময়কে সব কথা জানালেন। মৃন্ময়ীতে এসে স্বপ্নে দেখা মানুষটির ফটো দেখে লাভ করলেন পরম তৃপ্তি, উপস্থিত সকলের হৃদয়ে সঞ্চারিত হ'ল তার অন্তরের সেই অনির্বচনীয় আনন্দ-অনুভূতি।

একবার শ্রীনিকেতন মেলার সময় পাঠ হবে না ঘোষণা করা হল। কারণ সকলেই মেলা দেখতে যাবে। একজন স্বপ্নে দেখলেন, জীবনকৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে বলছেন, 'গত দু'দিন পাঠ হয়নি কেন ?' জ্যাঠামশাই বললেন, 'সারাদিন তো স্বপ্নালোচনা হচ্ছে, এ তো পাঠেরই সমান।' কিন্তু জীবনকৃষ্ণ বললেন, 'না। আমার নির্দেশ রইল কোন পাঠের দিন পাঠ বন্ধ করা চলবে না।' এই স্বপ্ন নির্দেশের পর থেকে মৃন্ময়ী বাড়ীতে ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলনের প্রতি কৃপাময় শ্রীজীবনকৃষ্ণের সজাগ দৃষ্টির সবিশেষ পরিচয় পেয়ে সকলে জীবনকৃষ্ণ-চর্চায় গভীরতর মনোনিবেশে উদ্দীপিত হলেন। এই চর্চা-কেন্দ্রের খ্যাতি দিন দিন বাড়তে লাগল। ঐ বাড়ির পাশের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে লোকে বাড়ীটির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলত, 'জানিস এটি জীবনকৃষ্ণের বাড়ী।' মৃন্ময়ীর এক পাশে যে নতুন বসতি গড়ে উঠল সেখানকার প্রায় প্রত্যেকেই জীবনকৃষ্ণের কৃপায় অভিষিক্ত হয়েছেন। পল্লীটিও জীবনকৃষ্ণপল্লী নামে খ্যাত হ'ল।

চার বছর ধরে বিচিত্র পথ পরিক্রমা শেষ করে **১৩৯৩** সালের ২৬ কার্তিক বিদায় বেলার রাগিনী বেজে উঠল। আগের রাত্রে জীতেনবাবু নিজে স্বপ্নে দেখলেন—সেদিন যেন বিজয়া দশমী। বাড়ীতে পাঠ হল। দু'একজন বলল, খাবার কই ? তখন ওনার মেয়ে বলল, 'খাবার ইচ্ছা থাকলে দোকানে গিয়ে কিনে খান। এখানে অমৃত খেয়ে পেট ভরল না ?'

এরপর থেকে অমৃত বিতরণের এই কেন্দ্রটি কার্যত বন্ধ হয়ে গেল। কেননা যাকে কেন্দ্র করে জীবনকৃষ্ণ-চর্চার এই বিপুল আয়োজন গড়ে উঠেছিল সেই জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তিনি বাড়ী বিক্রি করে ফিরে গেলেন কলকাতায়। কিন্তু অগ্নিবিদ্যার লেলিহান শিখা মৃন্ময়ীতে নিষ্প্রভ হয়ে গেলেও ইতিমধ্যে তার আরও ব্যাপক দহন প্রস্তুতি পার্শ্ববর্তী চারুপল্লী গ্রামে যে নিঃশব্দে সম্পূর্ণ হয়ে গেছে তা কেউ টের পায় নি।

নতুন উদ্যোগ

চারুপল্লীর (জামবুনির) শ্রীনন্দা স্কুলের সামনের মাঠে প্রতিদিন বিকালে একদল ছোট ছেলেমেয়ে খেলা করত। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল স্নেহময়। খেলা শেষে কচিকাচাদের সঙ্গে গল্প করতে করতে একদিন উঠল স্বপ্নের প্রসঙ্গ। অনেকেই জানাল তারা খুব মজার মজার স্বপ্ন দেখে। স্নেহময় আগ্রহ ভরে স্বপ্ন শোনে। তাই দেখে সকলে নিজের নিজের স্বপ্ন বলতে অনুপ্রাণিত হল। জীবনকৃষ্ণের কথা শুনল ওরা। একে একে অনেকেই দেখতে পেল জীবনকৃষ্ণকে বিচিত্র সব স্বপ্নে। টুলি, বুলি, লালী, রাজেশ, মণিদীপ, সুকুমার, নূপুর, ময়না, ঝুমা, সুব্রত, গৌতম আরও অনেককে নিয়ে সৃষ্টি হল অধ্যাত্মচর্চার সুন্দর এক পরিবেশ। স্বপ্ন নির্দেশ এল নিয়মিত পাঠ করার। সপ্তাহে একদিন পাঠ শুরু হল স্নেহময়দের

বাড়ীতে। পরে বেশ কতকগুলি স্বপ্ন নির্দেশ হল এই মর্মে যে হাতে লেখা মাণিক পত্রিকার ধারা বজায় রাখতে হবে। কোন ভয় নেই, শ্রীভগবান সহায় থাকবেন। জিতেনবাবু শ্রীনিকেতন ছেড়ে যাওয়ার পর মানিক পত্রিকা প্রকাশ করার দুঃসাহস কেউ করেনি, কিন্তু অতগুলি স্বপ্নের (৭/৮টি) নির্দেশকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব হল না। **১৩৯৪** এর ৭ই জ্যৈষ্ঠ মানিকের ৭ম সংখ্যা প্রকাশ হল (জিতেনবাবু থাকতে ছ'টি সংখ্যা বেরিয়েছিল)। ক্রমাগত এগিয়ে চলার সাক্ষ্য বহন করে এ যাবৎ মানিকের আঠারোটি সংখ্যা প্রকাশ পেয়েছে। ঐ বছর এই পল্লীতে নতুন বসতি গড়লেন শ্রীধর ঘোষ। স্বপ্ন নির্দেশ অনুসারে **১৩৯৫** সাল থেকে সপ্তাহের প্রতি বুধবার বিকালে তার বাড়ীতেও পাঠের আয়োজন হয়ে আসছে। বহু মানুষ এসেছেন এই পাঠে, ভগবৎ কৃপায় অভিষিক্তও হয়েছেন। তারপর তাদের অনেকেই অনিয়মিত হয়ে পড়েছেন, কেউ বা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। তবু এই পাঠচক্র যে এতদিনে বহু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে স্থিতিশীলতা (Stability) অর্জন করেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যিনি এই অপূর্ব জিনিস সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তা রক্ষা করছেন, ভবিষ্যতেও করবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস।

পরবর্তী অংশে পাঠকের হাতে মানিক পত্রিকার একটি নমুনা তুলে দেওয়া হল।

——— ঃ ———

বহুরূপে

বহু মানুষের মধ্যে শ্রীজীবনকৃষ্ণ বহু বিচিত্র রূপে উদ্ভাসিত হচ্ছেন। এই অঞ্চলে তাঁর বিচিত্র লীলার কিছু পরিচয় বিধৃত আছে হাতে লেখা 'মানিক' পত্রিকায়। এখানে তারই গুটিকয়েক উদাহরণ সন্নিবেশিত হল।

মধুময়

প্রয়োজনের তাগিদে একদিন জামবুনিতে শ্রীধরবাবুর বাড়ীতে গেলাম। তখন পাঠ চলছিল। পাঠ শুনতে বসে পড়লাম। শুনতে ভীষণ ভাল লাগছিল। দু'বার পাঠে যাবার পর শ্রীজীবনকৃষ্ণ স্বপ্নে দেখা দিয়ে আমার সংশয় নিরসন করলেন। দ্বিতীয় যে অভিনব স্বপ্নে তিনি দেখা দিলেন সেটি আমি জীবনে কখনও ভুলতে পারব না। স্বপ্নে দেখলাম--আমি বেড়াতে গেছি। আমার সঙ্গে সন্ধ্যাদি আছেন। আমরা দুজনে পায়ে হেঁটে ঘুরছি। ঘুরতে ঘুরতে এক পাহাড়ে গেলাম। সেখানে অনেক পাহাড়। আমরা এক পাহাড়ের তলায় গিয়ে পড়লাম। দিদি একটা পান দিলেন। বললাম, এখানে কথা বলার কেউ নেই, চলুন অন্য কোথাও যাই। তারপর চোখে পড়ল আশেপাশে রয়েছে অনেক মৌমাছি। এমনকি একটা মৌমাছির পাহাড়। মনে হল এটা মৌমাছির দেশ। এই মৌমাছিগুলো সাধারণ মৌমাছি নয়। অনেক বড় মৌমাছি। এমন সময় একটা মৌচাক থেকে মৌমাছিগুলো বলল, 'আপনারা চলে যাবেন কেন ? আপনারা আমাদের দেশে এসেছেন, আপনাদের এমনি তো যেতে দেব না। আপনাদের যা কিছু বলার আছে আমাদেরকে বলুন। আমরা আপনাদের সাহায্য করব।' এই কথা শুনে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। আমি সন্ধ্যাদিকে বললাম, ছোটবেলাতে বইতে পড়েছি না যে–মৌমাছি মৌমাছি কোথা যাও নাচি নাচি, দাঁড়াওনা একবার ভাই। তখন মৌমাছি বলেছিল যে–ঐ ফুল ফোটে বনে যাই মধু আহরণে দাঁড়াবার সময় তো নাই। এখন মৌমাছিদের দাঁড়াবার সময় আছে, তাই আমরা কথা বলার সুযোগ পেলাম। তারপর মৌমাছিরা আমাদের বসতে বলল। আমরা পাহাড়ের নীচে বসলাম। চোদ্দ পনেরোটা মৌমাছি এসে একটু করে মধু দিয়ে গেল। আমরা সেই মধু হাত পেতে নিলাম এবং পান করলাম। মধু তো নয় যেন অমৃত। ঐ মধু খেয়ে আমাদের পেট ভরে গেল। মনে হচ্ছিল একটা পাত্র আনলে ভাল হত। একটু মধু নিয়ে যেতাম বাচ্চাটার জন্যে। এই রকম মধু তো কোথাও পাওয়া যায় না! বাড়ীতে নিয়ে গেলে সবাই খুশী হত, আনন্দ পেত। মৌমাছিরা বলল, 'আসুন, আপনাদের সাথে পরিচয় করি।' আমরা বললাম, 'আমরা বোলপুর থেকে এসেছি। আমরা জীবনকৃষ্ণের ভক্ত। কিন্তু আপনাদের পরিচয় এখনও পাই নি। আপনাদের নাম কী ?' একজন মৌমাছি বলল, 'আমার নাম মধুমিতা। ২য় জন বলল– মধুশ্রী, ৩য়--মধুমালতী, ৪র্থ– মধুঅনামিকা, ৫ম–মধুবার্তা, ৬ষ্ঠ–মধুসূদন, ৭ম– মধু-আলেয়া, ৮ম–মধুরঞ্জন, ৯ম–মধুরজনী, ১০ম– মধু-দিবাকর, ১১শ–মধুসন্ধ্যা, ১২শ–মধুমালবিকা, ১৩শ--মধুমতা, ১৪শ–মধুআহরণ'। আমি বললাম, 'আপনারা এখানে কতদিন ধরে আছেন ?' এমন সময় একজন ব্রাহ্মণ সেখানে এলেন। ঠিকমত চিনতে পারলাম না। খালি গা,

ধুতি পরে, মাথায় ছোট ছোট করে ছাঁটা চুল, চিবুকে সামান্য দাড়ি। তিনি কাছে এসে বসলেন। তারপর বলতে লাগলেন–'মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্ণঃ সন্তোষধী মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দৌরস্তু নঃ পিতা মধুমান্নো বনস্পতিঃ মধুমান্ অস্তু সূর্যঃ। মাধ্বী গাবো ভবন্তু'– এই কথা বলা মাত্র সমস্ত মধু পাহাড় থেকে ঝর্ণার মত পড়তে লাগল। চারিদিকে শুধু মধুর স্রোত। পাশের ভদ্রলোক অদৃশ্য হলেন। আমার ভিতর থেকে হঠাৎ কান্না জেগে উঠল। আনন্দের কান্না। ঘুম ভাঙার পরও বহুক্ষণ কেঁদেছি। তারপর হ্যারিকেন জ্বেলে স্বপ্নটি লিখে ফেললাম। চোদ্দটি মৌমাছির নাম ও সংস্কৃত মন্ত্রটি স্পষ্ট মনে ছিল।

পরদিন সকালে জামবুনি গেলাম। স্নেহময়কে স্বপ্নটা বলতে বলতে আবার আনন্দে দেহ তোলপাড় হল, চোখে জল এল। মনে হল ঐ স্বপ্ন যদি আরও কিছুক্ষণ দেখতাম তাহলে আমিই মধু হয়ে যেতাম। স্বপ্নটা শুনে স্নেহময় যখন উপনিষদ খুলে ঐ সংস্কৃত মন্ত্রটি দেখিয়ে দিল, আমি হতবাক হয়ে গেলাম। আমি আগে কখনও ঐ মন্ত্র শুনিনি অথচ স্বপ্ন দেখে হুবহু তা লিখে ফেলেছি। বিস্ময়ের পালা এখানেই শেষ নয়। স্নেহময় যখন জীবনকৃষ্ণের দেহ যাবার সময়কার ফটো আমার চোখের সামনে মেলে ধরল, আমার চোখ তো ছানাবড়া। আরে ইনিই তো সেই স্বপ্নে দেখা ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক। আমি আগে তো এ ফটো দেখিনি, নেড়া মাথা কামানো মুখের ফটোটা দেখেছিলাম। আমি আর ভাবতে পারছি না। 'ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং ত্বং নমামি।'

ব্যাখ্যা ঃ মধু–অমৃত। মৌমাছি–অমৃতপিয়াসী মানুষ। ব্রাহ্মণ–ব্রহ্মবিদ তথা ব্রহ্ম–অমৃতপুরুষ–অমৃতের উৎস। আমি অমৃত হতে চাই–দ্রষ্টার অন্তর মধ্যে এই শাশ্বত বৈদিক প্রার্থনা জেগে উঠেছে। তাই ঈশ্বর বিরহ সহ্য করতে না পেরে দ্রষ্টা কাঁদছেন।

কার্তিক মুখোপাধ্যায়
শুঁড়িপাড়া, বোলপুর

এই আলোকে

শ্রীজীবনকৃষ্ণ সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে মনে পড়ে শ্রীরামকৃষ্ণের একটা কথা– 'শিব ঠাকুর গো, তোমার কথা কি বলব, সমুদ্র যদি কালি হয়, মৈনাক পাহাড় যদি কলম হয় তবু তোমার কথা লিখে শেষ করা যাবে না।' শ্রীজীবনকৃষ্ণের মহিমা তাঁর কৃপায় যেটুকু উপলব্ধি করেছি তার কণাটুকু আমি লিখে প্রকাশ করতে পারব না। একমাত্র তিনিই পারেন বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুকে সংহত করতে। তাই আমি শুধু তাঁর দেওয়া একটি স্বপ্ন উল্লেখ করব। দেখছি–কোন এক বিয়ে বাড়ী গেছি। ক্রমে বেলা পড়ে গেল। কিন্তু ফটো তোলা হবে যে! সকলে ভাবছে আলোর অভাবে এই মিলনের স্মৃতিকে ফটোতে ধরে রাখা যাবে কি ? আমার মনে হল সূর্য ডুবে যায় নি। আপন মনে খিড়কী দরজা

পেরিয়ে পাশের পুকুরে হাতমুখ ধুতে নামলাম। হঠাৎ দেখি ভাসমান অবস্থায় জলের মধ্যে থালার মত সূর্য। ধীরে ধীরে সেই সূর্য জলের উপর সোজা হয়ে উঠছে। তখনও দেখছি সূর্যের উপরে জলের ছোট ছোট ঢেউ খেলছে। যখন সূর্য জলের একটু উপরে উঠেছে তখন অবাক হয়ে দেখছি সূর্যের মধ্যে পুরো সূর্যটি জুড়ে শ্রীজীবনকৃষ্ণের মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে আছে। আনন্দে চিৎকার করে অন্যদের উদ্দেশ্যে বলছি, 'দেখ তোমরা, এই তো সূর্য উঠছে।' পিছনে তাকিয়ে দেখি সূর্যের আলো জানলা দিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকছে। সেই আলোতে ফটো তুলতে সকলে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

(পুকুর–সহস্রার। সহস্রারে প্রাণবায়ুর শেষ রূপ সূর্যমণ্ডল, আর এই সূর্যমণ্ডলের মধ্যে মানুষের রূপে পরমাত্মা বা পরমব্রহ্ম। স্বপ্নদ্রষ্টা পরম সৌভাগ্যবশত সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষকে দর্শন করেছেন। ঈশোপনিষদের ঋষিদের সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষকে দেখার প্রার্থনা আজ পূরণ হয়েছে। আর সাথে সাথে ঋষিদের জগতের মানুষের সঙ্গে বহু আকাঙ্খিত আত্মিক মিলনের (একত্ব লাভের) ছবিটি (ফটো) বাস্তব হয়ে উঠছে।)

এই পরম ধনকে অন্তরে যে পায় তার আর চাইবার কিছু থাকে না। আমার বড় ছেলেও (বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়) শ্রীজীবনকৃষ্ণের কৃপাধন্য। ওর কিছুদিন আগে দেখা একটি স্বপ্ন ওর নিজের লেখা থেকে তুলে দিচ্ছি। "দেখছি–জীবনকৃষ্ণের সংগে বোলপুর থেকে হাঁটতে হাঁটতে আসছি। উনি আমাকে বললেন, 'মণির (আমার স্ত্রী) স্বপ্নের কথা শুনে খুব তো বলছিলি আমাকে ঠাকুর বর দিতে এলে অনেক কিছু চেয়ে নেব। আজ আমি তোকে বর দেব। তুই তোর ইচ্ছামত বর চেয়ে নে।' আমি চুপ করে রইলাম। দুজনে একটা দোকানে ঢুকলাম। উনি চায়ের অর্ডার দিলেন, চা খেতে লাগলাম। আবার বললেন, 'কই কিছু চাইলি না তো! বল কি চাস ?' তিনবার জিজ্ঞাসা করলেন। আমি ভাবছি টাকা পয়সা চাইব, অভাবের সংসারে সুখের মুখ দেখতে পাব। কিন্তু কিছুতেই মুখ ফুটে কিছু চাইতে পারলাম না। .... ঘুম ভাঙল।"

আমার বড় নাতির (চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়) বয়স যখন সাত, তখন একদিন ও দেখল, ওর মায়ের সঙ্গে গেছে মামার বাড়ী চারুপল্লী। ওরা বাড়ীর কাছে যেতেই গেট খুলে এগিয়ে এলেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ। ওদের আদর করে ভিতরে নিয়ে গেলেন। রামকৃষ্ণ বলেছেন– 'আমাদের মামার বাড়ী ঈশ্বরের কাছে।' সেই মামার বাড়ী পৌঁছে গেল কত সহজে, কত অল্প বয়সে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন-'তিন পুরুষে আমীর।' তিন পুরুষকে একসাথে দর্শন দিয়ে তিনি নিজেকে ধরা দিয়েছেন আমাদের কাছে। এত সৌভাগ্যের অধিকারিণী হয়েও মন বলে, তাঁকে আঁকড়ে ধরে জীবন কাটানো হচ্ছে কই ?

কনকনলিনী চ্যাটার্জী
সুলতানপুর, বীরভূম

জন্মান্তর

আজ থেকে বারো বছর আগে আমরা 'নবদ্বীপে শ্রীভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে এসে প্রথম জানতে পারি শ্রীজীবনকৃষ্ণের কথা। আগে নানা ধরনের স্বপ্নদর্শন হলেও এর গুরুত্ব ঠিকমত উপলব্ধি করিনি। ভোলাদার বাড়ীতে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' এবং 'ধর্ম ও অনুভূতি' পাঠ শোনার পর আমার স্ত্রী ও কন্যা শ্রীজীবনকৃষ্ণের দর্শন পেতে লাগলো। স্বপ্নে এবং জাগ্রতে। কিছুদিন পর আমরা এলাম বোলপুরে। যুক্ত হলাম শ্রীনিকেতন পাঠচক্রে। ফলে এই চর্চা অব্যাহত থাকল। কিন্তু আমি কোন স্বপ্নে শ্রীজীবনকৃষ্ণকে দেখতে পাইনি। মনে মনে বলতাম, তোমার সত্য পরিচয় ওদের মত আমাকেও দেখা দিয়ে বুঝিয়ে দাও। দীর্ঘকাল অপেক্ষা করার পর এল সেই শুভ সময়। গত ১৯৮৯ সালে ২৬শে জানুয়ারী কলকাতায় হিমাংশুবাবুর বাড়ীতে জীবনকৃষ্ণ অনুরাগীদের এক সমাবেশে যোগ দেবার কথা ছিল। কিন্তু যেতে পারি নি। ঐ রাত্রেই স্বপ্নে দেখলাম- –হিমাংশুবাবুর বাড়ীতে গেছি। যে ঘরে অনুষ্ঠান হচ্ছে সেই ঘরের ভেজানো দরজা ঠেলে ভিতরে তাকিয়ে দেখি ঘরভর্তি লোক। একপাশে চারুপল্লী পাঠচক্রের ছেলেমেয়েরা বসে অনুষ্ঠান করছে। ওদের পিছনে একটা সিংহাসন। তাতে বড় করে বাঁধানো শ্রীজীবনকৃষ্ণের একটা ফটো রাখা আছে। ফটোর সামনে দাঁড়িয়ে শ্রীজীবনকৃষ্ণ। উনি অভয় মুদ্রা দেখিয়ে আশীর্বাদ জানালেন। ভীষণ আনন্দ হল। ঘুম ভাঙল। জীবনকৃষ্ণকে নিয়ে দেখা দ্বিতীয় স্বপ্নটি আমার অন্তরকে আরও বেশী নাড়া দিয়েছে। ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৯২, স্বপ্নে দেখি–আমি ভেসে রয়েছি আমার জন্মভূমি সংলগ্ন ব্রহ্মপুত্র নদে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অবনতিতে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ভয়-ভীতিজনিত চাপা উত্তেজনা। প্রত্যেকে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য চিন্তিত। সাঁতার কেটে হিন্দু পাড়ার ঘাট দিয়ে ডাঙ্গায় উঠে এক নারীকন্ঠে (সম্ভবত মায়ের) শুনলাম সেখানে অনেক শরণার্থী এসেছে। তারপর হঠাৎ দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো সামনে একটা কাঁচের দেওয়ালে। তার ভিতর সরষের মতো অনেক বীজের মধ্যে যেন প্রাণসঞ্চার প্রক্রিয়া চলছে। বীজগুলি খৈ ফোটার মত শুভ্র আলো বিচ্ছুরণ করে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। নির্ভয় প্রশান্ত মনে এই দৃশ্য দেখতে দেখতে আনন্দে বিভোর হয়ে এই সৃষ্টি কর্মের পশ্চাতে যিনি অদৃশ্য রয়েছেন সেই সৃষ্টিকর্তাকে দর্শনের উদগ্র বাসনা জেগে উঠলো মনে। দেখছি একটা সার্চ লাইটের আলো পড়ল অনতিদূরে এক বিস্তৃত চত্বরসহ বিশাল এক রাজবাড়ীতে। সেখানে বড় ঘড়ি ও স্থাপত্য কর্মের বহু নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হল। বাড়ীটি জনমানব শূণ্য। অতৃপ্তমন সৃষ্টিকর্তার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় উতলা হয়ে উঠলে দেখি ব্রাহ্মণ পুরোহিতের বেশে প্রৌঢ় জীবনকৃষ্ণ সাইকেলে চড়ে আমার সামনে আট দশ ফুট দূরে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন। অবাক বিস্ময়ে তাঁকে দর্শন করলাম। মন প্রচণ্ড উল্লাসে ভরে উঠল। স্বপ্ন ভাঙল।

(ব্রহ্মপুত্র নদ অর্থাৎ সুষুম্নার পথ ধরে নিজের পাড়ায় মানে সহস্রারে মন এল। শরণার্থী এসেছে–দ্রষ্টার সারা দেহে পরিব্যপ্ত প্রাণশক্তি দেহকোষ ছেড়ে সংকলিত হয়েছে এই সহস্রারে। রাজবাড়ি বোঝাচ্ছে যে দ্রষ্টার আধার বেড়েছে। তাই প্রাণ সঞ্চারের কর্তা আর অদৃশ্য থাকলেন না তার কাছে। ধারাবাহিক সাধনে শ্রীজীবনকৃষ্ণ ব্রহ্মত্ব লাভ করেছেন, আর তারই পরিণতিতে বহু জীবের মধ্যে ব্রহ্মত্বলাভ বা পূর্ণতা অর্জনের পথে প্রাণের উদ্‌বোধন ঘটছে (বীজের মধ্যে প্রাণসঞ্চার)—অন্তরে সচ্চিদানন্দগুরু (ব্রাহ্মণ পুরোহিত) রূপে তাঁকে দর্শন করে।)

আমাদের ছোট পরিবারে আমার বৃদ্ধা মা-ও (সম্প্রতি ইহলোক ত্যাগ করেছেন) তাঁর কৃপা থেকে বঞ্চিত হন নি। তিনি একদিন দেখলেন – 'একটি ঘরে ঢুকলাম। ভিতরে নিখিল (জামাতা) বসেছিল সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায়। কিন্তু নিখিলের মত দেখতে নয়। আমাকে দেখেই বলল, তোমার জন্য বসে আছি। এত দেরী করলে কেন ? আমি অবাক হয়ে ভাবছি কোথায় যাব, কে কে যাবে কিছুই জানি না। ও রাগ করছে কেন ? ঘুম ভাঙল।' পরে জীবনকৃষ্ণের ফটো দেখে বলেছিলেন স্বপ্নে দেখা নিখিল ঠিক এনার মতো দেখতে। (নিখিল—পূর্ণ। —জীবনকৃষ্ণকে বোধ হচ্ছে নিখিল—তিনিই সেই পূর্ণ পুরুষ। দেরী কেন ? —স্বপ্নদ্রষ্টা জীবনের শেষভাগে এসে ভগবানের কৃপা পেলেন, বড় দেরীতে।)

আমার স্ত্রীর (সন্ধ্যা রুদ্র) একটি স্বপ্ন—"স্বপ্নে দেখছি জীবনকৃষ্ণ আমায় ডাকছেন-–'আয়, আত্মা-সাক্ষাৎকার করবি আয়।' তাকে অনুসরণ করে অনেকখানি পথ অরণ্যের ভিতর দিয়ে এগিয়ে এলাম। একসময় একটা বেল গাছের গোঁড়ায় পৌঁছলাম। আমি বললাম, 'কই আপনি আমাকে আত্মাসাক্ষাৎকার করালেন না ?' উনি বললেন, 'ঐ তো! উপরে তাকা, ঐ তো! কি দেখছিস ?' আমি বললাম, 'জ্যোতির্ময় আকাশ'। এরপর শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, 'এবার তোকে বীজ নিতে হবে। আমার মায়ের কাছে পাবি যা।' এরপর ওনাকে আর দেখতে পেলাম না। এগিয়ে গেলাম, চোখে পড়ল একটি ভাঙা পর্ণ-কুটির। আবার জীবনকৃষ্ণের সুমিষ্ট কন্ঠস্বর শুনলাম! বললেন, 'মা ওদের বীজ দাও।' কুটির থেকে বেরিয়ে এলেন এক বিধবা মহিলা। দুটো কাগজের মোড়ক হাতে দিলেন। খুলে দেখি ওগুলো শশা, মটর, ঝিঙে ইত্যাদির বীজ।"

(জ্যোতির্ময় আকাশ—অনন্ত জ্যোতি—আত্মা। 'জীবের হৃদয়াকাশই আত্মার বাসস্থান। এই আত্মা জ্যোতিঃস্বরূপ'-তৈত্তিরীয় ১।১৮। আত্মাসাক্ষাৎকারের পর জীবনকৃষ্ণের ইচ্ছায় মা অর্থাৎ দেহ কৃপা করল, বেদান্তের সাধনে বিশ্ব বীজবৎ অনুভূতি হল।)

আমার মেয়ে সুনন্দিতার একটি স্বপ্ন উল্লেখ করি। 'দেখছি– মাসিমণি, মেসোমশাই ও আমি গ্যাংটকের রামটেক গুম্ফাতে গেছি বেড়াতে। বাস্তবে দেখে এসেছিলাম সেই

বৌদ্ধমন্দিরগুলোতে সমস্ত লামাই ছেলে। কিন্তু স্বপ্নে দেখছি সব লামাই মেয়ে। ওরা আমাদের ঘুরে ঘুরে সব দেখাচ্ছে। ক্রমে রাত হল। ওরা মশারীর ভিতর ঢুকে বাল্বের আলোয় পড়াশুনো করতে বসল। আমরা ওই ঘরেরই একপাশে দাঁড়িয়ে ওদের ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করছি। হঠাৎ দরজার বাইরে একটা ঘন্টার আওয়াজ শুনলাম। সংগে সংগে সমস্ত মশারিগুলো যে একটা সূতোয় বাঁধা ছিল তাতে টান পড়ল। অমনি মশারি ছেড়ে ওরা বাইরে এসে দাঁড়াল। ঘরে ঢুকলেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ। পরনে ধূতি, খালি গা, চন্দনে চর্চিত কপাল। হাতেও চন্দন। আমাদের মধ্যে থেকে একজন আমায় বলল, উনিই আমাদের বর্তমান গুরু নির্বাচিত হয়েছেন। আমি তো মনে মনে দারুণ খুশী। যদিও ভাবলাম ওদের তো দুবছরের শিশুকেই গুরু বলে স্থির করা হয়। বিগত গুরুদেব স্বপ্নাদেশ পেয়ে পরবর্তী গুরুর কথা লিখে রেখে যান এক চিঠিতে এবং দেহত্যাগ করেন। দু'বছর পর কোন এক বুদ্ধ পূর্ণিমায় সেই চিঠি খোলা হয়। তাতেই লেখা থাকে পরবর্তী গুরু কোথায় জন্মাবেন। সেই অনুযায়ী গুরু স্থির করা হয়। জীবনকৃষ্ণ তাঁর হাতের চন্দন আমার কপালে লেপে দিলেন তারপর বললেন, একটি বাচ্চা লামা অসুস্থ হয়ে পড়েছে তার শুশ্রূষার জন্য আমাকে যেতে হবে। তুমিও চল আমার সঙ্গে। আমি তাঁর সঙ্গে গেলাম। একটা ছোট্ট খাটে সেই বাচ্চাটা ঘুমিয়ে আছে। বাচ্চাটা বিদেশী। দুজনে খাটটা ধরে ওকে হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। ...ঘুম ভাঙল।'

(লামা-এই মঙ্গোলীয় শব্দটির অর্থ পুনর্জন্মপ্রাপ্ত সন্ন্যাসী। সব লামাই মেয়ে–যারা অন্তরে সচ্চিদানন্দগুরু দর্শনে দ্বিতীয় জন্ম লাভ করেছেন তারাই ভক্ত বা গোপী। লামাদের গুরু–স্বপ্নাদিষ্ট গুরু বা সচ্চিদানন্দ-গুরু যিনি বহু মানুষের অন্তরে রূপ ধারণ করে ফুটে উঠে তৃতীয় জন্ম লাভ করেছেন—জগৎগুরু।)

মাইকেল মধুসূদন দত্ত বলেছিলেন, I Speak in English, think in English and dream in English. ঐ কথারই প্রতিধ্বনি করে বলি আমাদের পরিবারের সকলের অন্তরের কথাটি হল আমরা জীবনকৃষ্ণকে কতটা বুঝেছি জানি না তবে তাঁর কথা আলোচনা করতে ভালবাসি, ভাবতে ভালবাসি এবং তাঁকে স্বপ্নে দেখতে ভালবাসি।

নিত্যগোপাল রুদ্র
স্কুলবাগান, বোলপুর

তাঁরে চিনি গো চিনি

শ্রীজীবনকৃষ্ণের কথা শোনার আগেই তাঁকে নিয়ে অনেকগুলি স্বপ্ন দেখেছিলাম। প্রথম স্বপ্নে দেখলাম- কালী ঠাকুর আমাকে বাঁ হাতে করে ফুল দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। পরে দেখছি–একটি ছোট ঘরে রয়েছে নেড়া মাথা একজন বৃদ্ধ। সেখানে অনেক প্রবীণ মানুষও বসে আছেন। তাদের একজন আমাকে বললেন, 'এঁকে চিনিস, ইনি জীবনকৃষ্ণ।'

জীবনকৃষ্ণ হাসতে লাগলেন। আমার খুব আনন্দ হল। ঘুম ভাঙল।

দ্বিতীয় স্বপ্ন— আমি স্নান করতে গেছি। দেখছি আমার হাতে কিছু খাবার রয়েছে। সেটা ঘাটে একটা কেউটে সাপকে খেতে দিলাম। তাও যেন ও শান্ত হল না। ফোঁস ফোঁস করতে লাগল। যেমনি ঘাট থেকে উঠছি অমনি আমার হাঁটুতে কামড়ে দিল। তারপর বলল, 'তোর কপালে ছিল তাই আমি কামড়ালাম।' কিন্তু কোন জ্বালা যন্ত্রণা হ'ল না। আবার পুকুর পাড়ে এসে দেখছি একটি বড়ো কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে শ্রীজীবনকৃষ্ণ বসে রয়েছেন। প্রচণ্ড আনন্দে ঘুম ভেঙে গেল।

(সাপ-কুণ্ডলিনী। কামড়াল—শক্তি দিল। কপালে ছিল—বহুভাগ্যে এ জিনিস হয়। গাছের নীচে—সহস্রারে।)

এমনি আরও কত স্বপ্নে জীবনকৃষ্ণকে দেখতে থাকলাম। একদিন দাদা প্রতিবেশী একজনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ জীবনকৃষ্ণের নাম করায় আমি চমকে উঠলাম। পরে দাদাকে বললাম, তুই যার কথা বলিছিলি সেই জীবনকৃষ্ণকে আমি চিনি। দাদা খুব অবাক হল। বলল, কি করে জানলি ? বললাম, উনি যে আমাকে প্রায়ই স্বপ্নে দেখা দেন। দাদা পরদিন জামবুনী থেকে জীবনকৃষ্ণের ছোট্ট একটি ফটো নিয়ে এল। দেখা মাত্র গায়ে শিহরণ দিল। বললাম, 'হ্যাঁরে, এনাকেই আমি স্বপ্নে দেখি।' এরপর আমার মা ও দিদি জীবনকৃষ্ণকে স্বপ্নে দেখতে পেল। বাবাও সুন্দর সুন্দর দেবস্বপ্ন দেখতে লাগল। আর দাদা (সুকুমার চ্যাটার্জী) তো দেখেই।

পাঠে যাবার সুযোগ হয় না আমার। তবে জামবুনিতে ৭ই জ্যৈষ্ঠ ও ২৬ কার্তিকের অনুষ্ঠান শুনতে গেছি কয়েকবার। বেশ ভাল লাগে।

জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়
রূপপুর, বীরভূম

তাঁরি প্রেমে

জীবনকৃষ্ণকে আমি অনেকবার স্বপ্নে দেখেছি। যখনই মনে কোন প্রশ্ন দানা বেঁধেছে অমনি স্বপ্নে তিনি তার উত্তর জানিয়ে দিয়েছেন। একবার তো প্রশ্ন করে বসলাম, 'আচ্ছা আপনি মিডিয়াম (মাধ্যম) হিসাবে স্বপ্নকে বেছে নিলেন কেন ?' উনি বললেন, 'অনেক খুঁজলাম রে, কিন্তু এর চেয়ে ভাল মিডিয়াম আর কিছু পেলাম না। মানুষ স্বপ্ন দেখে তার inward eye (অন্তর্দৃষ্টি) দিয়ে। বারবার inward eye দিয়ে স্বপ্ন দেখতে দেখতে মানুষটার মন আপনা থেকে অন্তর্মুখী হয়ে যায়।'

তবে স্থূল দর্শনও আমার প্রচুর হয়েছে। বেশ মনে করতে পারি জীবনকৃষ্ণের কথা জানার বহু আগে উলুবেড়িয়ায় একদিন একা একা বেড়াবার সময় জ্যোতির্ময় এক পুরুষকে স্থূলে চাক্ষুস করেছিলাম। কিছুক্ষণ পর সেই পুরুষ হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যান।

তাঁর রূপ আমি ভুলিনি। আমি নিশ্চিত সেদিন শ্রীজীবনকৃষ্ণই আমাকে কৃপা করে দেখা দিয়েছিলেন। জিতেনদার বাড়ীতে যে শেষ অনুষ্ঠানটা হ'ল, (২৬ কার্তিক, ১৩৯৩) সেদিন একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়েছিল। আমি মানিক পত্রিকা ধরে নিজের স্বপ্ন পড়তে যাব – ওমা, চোখের সামনের দৃশ্য বদলে গেল, দেখলাম বরফের পাহাড় থেকে গরম পোষাক পরে নেমে আসছেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ। কাছে এলে বললাম, 'একি ঠাকুর, আপনি!' উনি বললেন, 'হ্যাঁ। তোরা যে আমাকে ডাকছিস, আমি কি না এসে পারি রে ?' উনি আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করে বললেন, 'আমি এখন আসি কেমন!' এই বলে চলে গেলেন।

আমি লক্ষ্য করেছি, জীবনকৃষ্ণের কথা শুনলে বা আলোচনা করলেই দর্শন অনুভূতি হয়, অন্য কারও কথায় তা হয় না। কিছুদিন আগে পাঠ প্রসঙ্গে স্নেহময়কে বললাম, জীবনকৃষ্ণের সঙ্গে অন্য আচার্যদের পার্থক্য কোথায় ? উনিও তো অনুশীলন করতে অর্থাৎ প্রকারান্তরে সাধন করতেই বলছেন। ও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে উত্তর দেবার উদ্যোগ করতেই আমি বললাম, তোমাকে আর উত্তর দিতে হবে না। ঠাকুর এক্ষুনি দেখা দিয়ে আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন। দেখলাম জীবনকৃষ্ণ এক দুর্গম পর্বতের চূড়ায় দাঁড়িয়ে। তাঁর হাতে একগুচ্ছ দড়ি। সেগুলো চারিদিকে ছড়ানো। তাদের প্রত্যেক প্রান্ত একজন করে ধরে আছি। আমরা মাটি থেকে দু'এক ধাপ উঁচুতে অবস্থান করছি। তিনি একাই সজোরে টান দিয়ে আমাদের উপরে উঠিয়ে নিচ্ছেন। বুঝলাম আমাদের সকলকে উচ্চ আত্মিক অবস্থায় টেনে তোলার দায়িত্ব বহন করছেন তিনি নিজেই। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন–প্রেম রজ্জুস্বরূপ। শ্রীজীবনকৃষ্ণের প্রতি প্রেমের আকর্ষণে আপনা হতেই (বিনা সাধনে) মন উঠে যাবে হাড় মাসের পাহাড় এই দেহের ঊর্দ্ধভূমিতে।

শ্রী দর্পনারায়ণ পাল
জীবনকৃষ্ণ পল্লী, শ্রীনিকেতন

পরিপূর্ণ

বছর ছয়েক আগে যখন খেলার মাঠে প্রথম জীবনকৃষ্ণের কথা শুনলাম তখন থেকে শুরু করে আজও নানা স্বপ্নে ঠাকুর জীবনকৃষ্ণের দেখা পাই। ওনার ফটো দেখার আগেই ওনাকে স্পষ্টভাবে স্বপ্নে দেখে বেশ অবাক হয়েছিলাম। স্বপ্নে তিনি নানাভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে তিনিই ভগবান। আমার দুই দিদি ও মা তাঁর দেখা পেয়েছেন।

আমার একটি স্বপ্নঃ— প্রথমে দুটি পা হাঁটু পর্যন্ত দেখা গেল। মনে হল ভগবানের পা। পায়ের উপর অনেক এক টাকার কয়েন (coin)। পা দুটি থেকে দুটি হাত বেরিয়ে কিছু কয়েন নিয়ে আমাকে বলল, 'এই নে।' আমি নিয়ে দেখি প্রতিটি কয়েনে জীবনকৃষ্ণের ছবি। এরপর শূণ্য থেকে নেমে এলেন জীবনকৃষ্ণ। তিনি আমার হাত ধরে আকাশে

উড়িয়ে নিয়ে চললেন। কী ভালো যে লাগছিল! এমন সময় ঘুম ভেঙ্গে গেল।

(এক টাকা–ষোল আনা, পূর্ণ। এক টাকার কয়েনে জীবনকৃষ্ণের ছবি–পরিপূর্ণ (perfect) জীবনের ছবি। কবি-প্রার্থনার বাস্তবরূপ–

"এই কল্লোলের মাঝে নিয়ে এসো কেহ, পরিপূর্ণ একটি জীবন
নীরবে মিটিয়া যাবে সকল সন্দেহ, থেমে যাবে সহস্র বচন।"

বড়দির (বনানী মণ্ডল) স্বপ্নঃ 'দেখছি–শ্রীনন্দা স্কুলে গানের প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছি। ওখান থেকে আমাকে চারটে কুপন দিল। কুপন দেখিয়ে শ্রীনন্দার ভিতরে খেতে বসলাম। খাবার প্লেটে জীবনকৃষ্ণের ছবি আঁকা। সন্দেহ দূর করার জন্য প্লেটটা নিয়ে গৌতমদার বাড়ীতে ছুটে গেলাম। ওখানে জীবনকৃষ্ণের ফটো ছিল। মিলিয়ে দেখলাম হুবহু একই ছবি। খুব আনন্দ হল। ঘুম ভাঙল।'

(গানে প্রথম হয়েছি–কুণ্ডলিনী সুরে জেগেছে, দ্রষ্টার দেবত্ব লাভ হয়েছে, উত্তম পুরুষ (first) হয়েছেন। প্লেট–সহস্রার। সকলেরই সহস্রারে আছে জীবনকৃষ্ণের রূপ। কুণ্ডলিনী জেগে উঠলে দেহী তার প্রমাণ পান, অবশ্য তাঁর কৃপায়।)

মায়ের (সরস্বতী মণ্ডল) স্বপ্ন ঃ 'দেখছি–একটি বিড়ালকে খুব মারছি। মৃতপ্রায় হয়ে গেছে। আমার স্বামী বলল, 'আর মারছ কেন ?' তখন বিড়ালটি হঠাৎ জীবনকৃষ্ণে পরিবর্তিত হল। হাতে ওনার ছোট লাঠি। উনি রেগে বললেন, 'প্রতিদিন আমি আসি আর ফিরিয়ে দিস আমাকে!' আমি চমকে উঠলাম ওনার কথা শুনে। তখন বড় মেয়ে ডেকে দেওয়ায় ঘুম ভেঙে গেল।

(বিড়াল-দেবত্বের প্রতীক। দ্রষ্টার দেহে (বাড়ীতে) ভগবান নানা স্বপ্নে ইঙ্গিতে (বিড়াল) তাঁর মহিমা জানাতে চাইছেন, কিন্তু দ্রষ্টার যোগবিরোধী কাজকর্ম তাতে বাধা দিচ্ছে (ফিরিয়ে দেয়)। কৃপাময় ভগবান অবশেষে জোর করে (লাঠি হাতে) ফুটে উঠলেন। এ যুগে ভগবৎ কৃপার এই ধারা।)

শর্মিষ্ঠা মণ্ডল
সপ্তম শ্রেণী

প্রণমি তাঁহারে

বছর পাঁচেক আগে প্রেমময়ের মুখে প্রথম আমি জীবনকৃষ্ণের কথা শুনেছিলাম। বড় অদ্ভুত লেগেছিল। কিন্তু পুরোপুরি বিশ্বাস হয় নি। সেই রাত্রে স্বপ্নে দেখলাম–একজন বয়স্ক বিশালবপু ভদ্রলোক আদুড় গা, মাথা ন্যাড়া, হাঁটু পর্যন্ত ধুতি পরে আছেন। তিনি দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকতে চাইছেন আর আমি ভয় পেয়ে দরজা বন্ধ করার চেষ্টা করছি। অনেকক্ষণ দু'জনে এই রকম ঠেলাঠেলি করছি। এক সময় ঘুম ভেঙ্গে গেল। পরদিন জিতেনবাবুর বাড়ীতে পাঠে গেলাম। পাঠ কক্ষে টাঙানো জীবনকৃষ্ণের

ফটো দেখে চমকে উঠলাম, আরে আমি তো এনাকেই দেখেছি।

ঘটনাচক্রে পরে আর কখনও পাঠে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। দীর্ঘ পাঁচ বছর পর হঠাৎ ১৯৯০ এর ডিসেম্বরে এক দুপুরে স্নেহময় আমাকে ওদের হাতে লেখা 'মানিক' পত্রিকা পড়তে দিল। সেই সময় আমি প্রচণ্ড মানসিক অশান্তি ভোগ করছিলাম, কিন্তু পত্রিকাটি পড়ে অদ্ভূত এক প্রশান্তি লাভ করলাম। নতুন জীবনের আস্বাদ পেলাম। শুরু হ'ল দেবস্বপ্নের বন্যা। আমার জীবনের সমস্যার প্রেক্ষাপটে যে সব শিক্ষা বিশেষ তাৎপর্যবহ সে জাতীয় শিক্ষাই বয়ে আনতে লাগল প্রতিটি দেবস্বপ্ন। আর 'জ্ঞানমূলং গুরোর্মূর্তিম্'টি যে শ্রীজীবনকৃষ্ণের রূপ সে কথা কতভাবেই না তিনি বোঝালেন। যেমন একদিন দেখছি–পুরোন পুঁথিপত্রের স্তূপ আর তার মাঝে ধ্যানতন্ময় সৌম্যকান্তি শ্রীজীবনকৃষ্ণ।

একটু একটু করে বোধে আসতে লাগল যে, তিনি আমার আপনার জন, আমার পরমাত্মীয়। কাজের ফাঁকে অবসর পেলে তাঁর চিন্তাই আসে মনে। স্বপ্নে দেখি, আমি ওজন করে করে চায়ের প্যাকেটে চা ভরছি আর উনি আমাকে সাহায্য করছেন। কখনও বা আমি অন্য কাজে ব্যাপৃত, দেখি উনি ঘরের মধ্যে ঘোরাফেরা করছেন। ঠিক যেন আমার অভিভাবক রয়েছেন ঠিক পাশে পাশেই।

পরমপিতা কিভাবে আমাকে তাঁর শ্রীচরণে প্রণত করিয়ে নিয়েছেন সেই কথাটি বলেই শেষ করব। প্রসঙ্গত বলে রাখি আমি লোকনাথ বাবার বিশেষ অনুরাগী, তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি নিত্য। কিন্তু কোনদিন কোন স্বপ্নে তাঁকে আজ পর্যন্ত দেখিনি। একদিন রাত্রে ঘরে রাখা দেবদেবীর মূর্তিগুলিকে ও লোকনাথ বাবার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে শুতে গেছি। ঐ রাত্রে শ্রীজীবনকৃষ্ণকে প্রণাম করতে ভুলে গিয়েছিলাম। বিছানায় উঠতে গিয়ে খালি চোখে স্পষ্ট দেখলাম শ্রীজীবনকৃষ্ণ আমার খাটের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। তাড়াতাড়ি ওনাকে প্রণাম করলাম। মাথা তুলে দেখি উনি আর নেই। সেদিনের সেই একটি প্রণামে আমার সমগ্র জীবন ধন্য হয়ে গেছে।

অরবিন্দ নন্দী
চারুপল্লী, বোলপুর

অন্তরের পথে

জিতেনবাবুর কাছে প্রথম জীবনকৃষ্ণের কথা শুনেছিলাম। আমিও স্বপ্নে নানাভাবে জীবনকৃষ্ণকে দেখেছি। একবার দেখেছিলাম- আমি গঙ্গায় চান করতে যাচ্ছি। বিশাল চেহারার এক ভদ্রলোক পথ আগলে দাঁড়ালেন। খালি গা, ধুতি পরে আছেন। বেশ বড়সড় ভুঁড়ি। পিছনে আরও একজন অজানা লোক দাঁড়িয়ে ছিল। আমাকে বললেন, 'তোকে গঙ্গায় চান করতে যেতে দেব না।' আমি বললাম, 'ছেড়ে দে'। কিন্তু কিছুতেই

পথ ছাড়ল না। ঘুম ভেঙ্গে গেল। পরে ফটো দেখে বুঝেছিলাম ঐ ভদ্রলোক স্বয়ং জীবনকৃষ্ণ। (দ্রষ্টার গঙ্গাস্নানের সংস্কার কাটল।)

একবার স্নেহময় আর মণি স্বপ্নের কথা আলোচনা করছিল বারান্দায় বসে। হঠাৎ আমার চোখ পড়ল পাশের বাড়ীর আম গাছটায়। অবাক হয়ে দেখলাম ওখানে জীবনকৃষ্ণের মুখখানি জ্বলজ্বল করছে। খালি চোখেই অনেকক্ষণ ধরে দেখলাম। আর একবার স্বপ্নে সূর্যের মধ্যে জীবনকৃষ্ণকে বসে থাকতে দেখেছিলাম। সেই দৃশ্য বেশ কয়েকদিন আমার চোখের সামনে সব সময় ভাসত। (সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষ রূপে দর্শন।)

অনেক স্বপ্ন দেখেছি। এখন আর সব মনে পড়ছে না। তবে কিছুদিন আগে দেখা একটা স্বপ্ন বলি। দেখছি–বারি পুকুরে একটি মাছের মাথা আর দেহ আলাদা হয়ে ভাসছে। বিনয় মাছের মাথাটা তুলে এনে দুর্গার বেদীর উপর রাখল। ধড়টা খুঁজে পেল না। বেদীর কাছে গিয়ে দেখলাম ওটা মাছের মাথা নয়, ওটা জীবনকৃষ্ণের মুখ। উনি যেন অসুস্থ, অবসাদ গ্রস্ত। দেখে খুব কষ্ট হল।

(পুকুর–সহস্রার। ধড় ও মাথা বিচ্ছিন্ন–দেহ ও আত্মা পৃথক। জলে ভাসছে–সচ্চিদানন্দ বারিতে বিলাস করছে। দুর্গার বেদী–ষষ্ঠভূমি। জীবনকৃষ্ণের মুখ–জীবনকৃষ্ণের রূপে আত্মার প্রকাশ। অসুস্থ–ষষ্ঠভূমিতে সঠিক (পূর্ণ) ভগবান দর্শন হয় না। উপলব্ধি ত্রুটিপূর্ণ। দ্রষ্টার মন ষষ্ঠভূমিতে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করছে না, এর উপরে গিয়ে (সপ্তমভূমিতে) পূর্ণ জীবন্মুক্তির স্বাদ অনুভব করতে চাইছে।)

ওনার এই ম্লান মুখটা দেখে ভেতরটা কেবলই খচ্ খচ্ করতে লাগল। কয়েকদিন পর দেখলাম, আমি কূয়োতলায় বাসন মাজছি আর জীবনকৃষ্ণ উঠোনে পায়চারী করছেন। বেশ সুন্দর চেহারা, হাসিখুশী মুখ। ওনাকে আনন্দিত দেখে আমিও স্বস্তি পেলাম। ঘুম ভাঙল।

ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা হলেও ঘরে যে পূজো-আর্চ্চা উঠে গেছে তাতে কিছু মনে হয় না। আমাদের বাড়ীতে দুর্গাপুজো হ'ত। এখন অন্য শরিকদের উপর দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছি। প্রথম প্রথম দুর্গাপুজোর সময় মন খারাপ হয়ে যেত। কিন্তু স্বপ্নেও তো মা দুর্গা দেখা দিয়ে কিছু বলেন নি। জীবনকৃষ্ণকে নিয়ে কত জনের কত স্বপ্ন শুনি আর নিজেও নানারকম দেখেছি। এখন মনে বিশ্বাস জন্মেছে যে উনি সাধারণ মানুষ নন, উনি স্বয়ং ঠাকুর। বেশিদিন ওনাকে স্বপ্নে দেখতে না পেলে কষ্ট হয়, মনে হয় আমার কি কোন অপরাধ হ'ল ? আবার ওনার দর্শন পেলেই মন আনন্দে ভরে যায়।

লক্ষ্মী রায় (বয়স-৮৭)
চারুপল্লী, বোলপুর

এগিয়ে চল

আমার বাবা জীবনকৃষ্ণকে খুব ভক্তি করেন কিন্তু আমি কখনও জীবনকৃষ্ণকে স্বপ্নে দেখি নি। গত বছর অক্টোবর মাসে জামবুনি এসেছিলাম। ওখান থেকে বাসে চেপে সুলতানপুর যাবার সময় কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম আমার দু'চোখে দু'জন জীবনকৃষ্ণ ধুতি পাঞ্জাবী পরে বসে রয়েছেন। হাত তুলে আমাকে আশীর্বাদ করলেন। ...ঘুম ভেঙ্গে গেল। (বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে চক্ষুতে অবস্থিত এই পুরুষই সত্য, ইনিই ব্রহ্ম (চক্ষুপুরুষ)।)

এই দর্শনের পর থেকে নানান স্বপ্নে জীবনকৃষ্ণকে দেখতে পাই। একবার দেখলাম--খালি গায়ে ধুতি পরে জীবনকৃষ্ণ এলেন বাড়ীতে। আমি শুয়ে ছিলাম। বিছানা থেকে নেমে এসে ওনাকে প্রণাম করলাম। বললাম, 'ঠাকুর আমাকে বুদ্ধি দাও। আমি যেন ভাল করে পড়াশুনো করতে পারি।' উনি বললেন, 'বেশ তাই হবে।' এই বলে আশীর্বাদ করলেন। আমি বললাম, 'একটু দাঁড়ান, মিষ্টি নিয়ে আসি।' উনি খাটে বসলেন। মিষ্টি জল আনতে গেলাম। ফিরে এসে দেখি উনি নেই। ঘুম ভাঙল। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল।

(ধিয়ো যঃ নঃ প্রচোদয়াৎ—যিনি আমাদেরকে বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করেন, সেই পুরুষের কৃপা পেল। কিন্তু ভগবৎচর্চার অনুকূল পরিবেশ না পাওয়ায় আত্মিক পরিপুষ্টি লাভ (খাওয়ানো) সম্ভব হচ্ছে না।)

আমার মা কিন্তু মঙ্গলচণ্ডীর ভক্ত। জীবনকৃষ্ণ যে ভগবান, তা বিশ্বাস করেন না। একদিন স্বপ্নে মা মঙ্গলচণ্ডী দেখা দিলেন লালপাড় সাদা শাড়ী পরে। মা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন মুখটা জীবনকৃষ্ণের মুখ। তখন থেকে মা বিশ্বাস করেন যে যিনি মঙ্গলচণ্ডী তিনিই জীবনকৃষ্ণ।

সৌভিক মুখার্জী (পঞ্চম শ্রেণী)
মালীবান্দি, গুড়াপ, হুগলী

আমার বাবা, মা, ভাই স্বপ্নে জীবনকৃষ্ণের দেখা পেয়েছে। আমি তাঁর দর্শন পেলাম অনেক পরে। এ বছর পুজোর সময় দশমীর দিন স্বপ্নে দেখলাম—কোন একটি ঠাকুর প্রতিমার সামনে দাঁড়িয়ে প্রণাম করছি। অমনি মূর্তিটি থেকে জীবনকৃষ্ণ বেরিয়ে এসে আমাকে আশীর্বাদ জানালেন।

(সাকার মূর্তি বহু আবার এক। যখন এক তখন জীবনকৃষ্ণের রূপ, নিত্যসাকার।)

এর আগে অবশ্য এক স্বপ্নে দেখেছিলাম যেন রাস্তা দিয়ে হাঁটছি। ক্লান্ত হয়ে

পড়েছি। হঠাৎ জীবনকৃষ্ণের কন্ঠস্বর শুনতে পেলাম। উনি যেন বললেন–'বৎস, এগিয়ে চল।' ঘুম ভাঙল। কিন্তু এই স্বপ্নে স্পষ্টভাবে ওনাকে দেখতে পেয়ে ভীষণ আনন্দ পেয়েছি। গ্রামে কোন পাঠচক্র নেই, তাই দু'ভাইয়ে মিলে প্রতি বুধবার ও শুক্রবার বিকেলে কিছুক্ষণ 'ধর্ম ও অনুভূতি' পাঠ করি। (দু'ভাইয়ে মিলে পাঠ করাই এগিয়ে যাওয়ার নমুনা।)

কৌশিক মুখার্জী
মালীবান্দি, হুগলী

দাবী পূরণ

দীর্ঘদিন পাঠে যাই। সবার স্বপ্ন শুনি। জীবনকৃষ্ণ আমায় বাদে সকলকে স্বপ্নে দেখা দেন। ভাবি এরা মিথ্যা বলে। জ্যাঠামশাই (জীতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়) বললেন, 'বাবা, ঠাকুর বলতেন বড় ফুল দেরীতে ফোটে। তোমার আধার বড়। তাই অনুভূতি ফুটতে দেরী হচ্ছে।' এসব কথায় মন ভরত না। একবার আমার একটি বিচিত্র স্বপ্ন হল। ব্যাখ্যা দিলেন জ্যাঠামশাই। কিন্তু পরের রাতে স্বপ্নেই ঐ স্বপ্নের ব্যাখ্যার ভ্রম সংশোধন করে দিলেন কৃপাময় ঠাকুর। এ ঘটনায় স্বপ্ন ব্যাপারটা মনের মধ্যে গভীরভাবে দাগ কাটল। ৭ই জ্যৈষ্ঠ আসার আগে স্নেহময় স্বপ্ন চাইল। মন খারাপ হয়ে গেল। পাঠচক্রে কত ছেলেমেয়ে আসে তারা কতভাবেই না জীবনকৃষ্ণের দেখা পায়। শুধু স্বপ্নে নয়, জাগ্রত দর্শনও হয় ওদের। আর আমি এত দিনেও কোন স্বপ্নে জীবনকৃষ্ণের দেখা পেলাম না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম ৭ই জ্যৈষ্ঠের আগে জীবনকৃষ্ণের দেখা না পেলে আর পাঠে যাব না। ৭ই জ্যৈষ্ঠের দিন দুই তিন আগে স্বপ্নে দেখলাম–আম বাগানে বসে আছি। মাথার উপর থোকা থোকা আম ঝুলছে। ছাত্র হয়ে নীচে বসে অংক কষছি। শিক্ষক মশাই হেসে কাছে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'কিরে কেমন আছিস ? চিনতে পারছিস ?' ওনার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি আরে এ যে জীবনকৃষ্ণ! ঘুম ভাঙল। ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষার পরমগুরু (শিক্ষক) হৃদয় মধ্যে প্রকাশ পেলেন, আমার দাবী পূরণ করলেন।

রামকৃষ্ণ ভদ্র
সুপুর, বীরভূম

দ্বিজ

ছোটবেলা থেকেই আমি ঠাকুর দেবতা বিশ্বাস করি। বছর দুয়েক আগে প্রেমময়দার কাছে শোলার কাজে যোগ দিই। সেখানেই জীবনকৃষ্ণের কথা শুনলাম। তারপর থেকে নানা স্বপ্নে রামকৃষ্ণ ও জীবনকৃষ্ণকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। শ্রীজীবনকৃষ্ণ এখন আমার অতি আপনজন। সম্প্রতি দেখা কয়েকটি স্বপ্ন লিখে জানাচ্ছি।

১) দেখছি–একটা ছোট সাপ, আঙুলের মত সরু, আমার কাছে এল। ওর মুখ থেকে জ্যোতি বেরিয়ে আমার দু'চোখে পড়ল। তারপর সাপটি আমার গা চেটে দিল। ভয় ভয় করছিল। তখন দেখি জীবনকৃষ্ণ সামনে দাঁড়িয়ে। উনি বললেন, 'ভয় করিস না, আমি আছি। আমি সব মানুষের কাছেই থাকি। যে আমাকে চায় সেই দেখতে পায়।'

২) স্বপ্নে প্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণ, পরে জীবনকৃষ্ণ, শেষে বিবেকানন্দ দেখা দিয়ে আমাকে একই কথা বললেন। প্রত্যেকে বললেন, 'তোর ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে।'

৩) একজন বলল, 'বিষ্ণুদা মারা গেছেন, না ?' আমি বললাম, 'না, নারানবাবু মানে আমার বাবা মারা গেছেন।' একটু পরে জীবনকৃষ্ণ এলেন। বললেন, 'তুই চিন্তা করছিস কেন ? তোর হয়ে ঈশ্বর ভাববেন। তোকে কিছু চিন্তা করতে হবে না। দুঃখ করবি না।' ওনার কথা শুনে আমার মনে আর কোন দুঃখ রইল না। (সচ্চিদানন্দগুরুর কৃপায় শোকাতীত অবস্থা লাভ।)

৪) দেখছি–আমি যেন মারা গেছি। কেউ কিন্তু দুঃখ করছে না। সকলে বেশ আনন্দ করছে। কিছুক্ষণ পর দ্বিতীয় এক আমি সেখানে উপস্থিত হলাম। সবাই অবাক হয়ে দেখছে আমাকে। আমি বললাম, আসল নব কায়া ছেড়ে চলে গেছে। আমি দ্বিতীয় নব।... ঘুম ভাঙল। (দ্রষ্টা দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হয়েছেন।)

৫) দেখছি–বিশ্বভারতীর শিল্পসদনের কাছে রাস্তার উপর আমি, ভরতদা ও আরও অনেক লোকজন রয়েছি। ভরতদা খোল বাজাচ্ছিল। বলল, 'নব, তুমি একবার বাজাও।' আমি খোলটা গলায় নেবার পর চারিদিক টলমল করতে লাগল। যেদিকে পা দিচ্ছি সেই দিকের মাটি যেন কেঁপে যাচ্ছে। এমন সময় হঠাৎ খোলটা ভেঙে দু'ভাগ হয়ে গেল। খোলের ভিতর থেকে একটা সোনার কৃষ্ণমূর্তি বেরিয়ে এল। মাথায় তার হীরের চূড়ো। সেই অপরূপ কৃষ্ণমূর্তি, পাশে ঝোলানো একটি ছবিতে ঠাকুর রামকৃষ্ণের বুকে ঠেকল, তারপর সেখান থেকে সরে এসে অপর একটি ছবিতে ঠাকুর জীবনকৃষ্ণের বুকে ঠেকে মিলিয়ে গেল।

(ভরত–ভারতবর্ষের মানুষ। খোল বাজাচ্ছে–দেহ থেকে আত্মা পৃথক করার চেষ্টা করছে। সোনার কৃষ্ণমূর্তি–প্রতীকে আত্মা। রামকৃষ্ণের ও জীবনকৃষ্ণের বুকে ঠেকল–শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীজীবনকৃষ্ণের দেহ থেকে আত্মা পৃথক হয়ে দেখা দিয়েছিল। এ যুগে ওনাদের কৃপায় দ্রষ্টার মত সাধারণ মানুষও দেহ আত্মা পৃথক হওয়া প্রত্যক্ষ করছেন এবং পরাবিদ্যা লাভ করছেন।)

নবকুমার বাউরী
সুরুল, বীরভূম

কৃপাহি কেবলম্

আমি তখন ক্লাস ফাইভে পড়ি। একদিন বন্ধু অরবিন্দর স্থূলে জীবনকৃষ্ণকে দর্শনের কথা শুনে জীবনকৃষ্ণ সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলাম স্যারের (স্নেহময় গাঙ্গুলী) কাছে। উনি বললেন, 'তুই স্বপ্নে দেখতে পাবি, তখন বুঝতে পারবি জীবনকৃষ্ণ কে ? এখন বলব না।' তারপর রাত্রিবেলা নীচের স্বপ্নটা দেখলাম।

দেখছি–আমাদের পুকুরে বিরাট একটা সোনার মাছ জালে ধরা পড়েছে। আমি বাবাকে বললাম, 'মাছটিকে ছেড়ে দাও।' বাবা রাজী হল না। তখন মাছটি নিজেই কথা বলে উঠল। বলল, 'ও ঠিকই বলেছে, আমাকে ছেড়ে দে।' আমি আর থাকতে না পেরে জোর করে মাছটিকে ধরে পুকুরে ছেড়ে দিলাম। এই সময় দেখলাম মাছটির দুটি পা রয়েছে মানুষের মত। এরপর বাবারা বাড়ী চলে গেল। রাত্রি হল। চাঁদ উঠল। আমি পুকুরের ধারে দাঁড়িয়েই আছি। হঠাৎ মাছটি দেখা দিয়ে বলল, 'এবার বাড়ী যা।' পরক্ষণে মাছটি সোনার পদ্মফুল হয়ে গেল। তার উপর শ্রীজীবনকৃষ্ণ বসে রয়েছেন। তিনি বললেন, 'তুই এখনও দাঁড়িয়ে আছিস ? বাড়ী যা।' বলেই মিলিয়ে গেলেন। আবার ঐ দৃশ্য ফুটে উঠল। চাঁদ থেকে সূর্যের মত এক ঝলক আলো ওনার মুখে এসে পড়েছে। তা আবার মুখ থেকে প্রতিফলিত হয়ে সামনের জলে পড়ছে। অপূর্ব দৃশ্য। তখন মনে হচ্ছিল এখন বুঝি দিন। আবার সব মিলিয়ে গেল। আমি বাড়ী ফিরব বলে পিছনে তাকালাম। এবার বুঝলাম এখন রাত্রি। বাড়ী ফিরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নে দেখলাম জীবনকৃষ্ণ মশারীর বাইরে ঘরের ভিতর দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আবার বললেন, 'তুই এখনও বাড়ী যাস নি ? বাড়ী যা।' চমকে উঠলাম। সেদিন সারাক্ষণ ধরে স্বপ্নটি আমার চোখে ভাসছিল।

(কোন বিশাল মাছ যেমন নদীর এপার এবং ওপার উভয় পারেই বিচরণ করে তেমনি এই পুরুষ স্বপ্ন এবং জাগরণ উভয় অবস্থায় বিচরণ করেন–বৃহদারণ্যক উপনিষদ্। বাড়ী–দেহ। বাড়ী যা— দ্রষ্টা হঠাৎ করে পরম পুরুষকে দর্শন করায় মনের লয় ঘটেছিল, দেহেতে ফিরতে পারছিল না, জাগতিক বোধ জাগছিল না, তাই এরূপ নির্দেশ।)

এরপর থেকে আমি প্রায় প্রতি রাত্রেই জীবনকৃষ্ণকে নিয়ে অদ্ভুত অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখতে লাগলাম। যে রাত্রে জীবনকৃষ্ণকে দেখতে পাই না মনে হয় সে রাত্রিটা বৃথা কাটল। একটা বিশেষ দর্শনের কথা জানাই। পাঠে নিয়মিত যোগ না দেওয়ায় স্যার একদিন আমাকে বকলেন। বললেন, পাঠ না শুনলে জীবনকৃষ্ণকে দেখা বন্ধ হয়ে যাবে। আমার খুব ভয় হল। তবে কি আমি আর জীবনকৃষ্ণকে দেখতে পাব না ? সেই রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম, পথে জীবনকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা। স্যারও রয়েছেন ওনার পাশে। জীবনকৃষ্ণকে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি কি আর আমাকে দেখা দেবেন না ? উনি

বললেন, 'কেন ?' বললাম, প্রায়দিনই আমার পাঠে যাওয়া হয় না বলে! স্যার যে বললেন। জীবনকৃষ্ণ বললেন, 'ও ভুল বলেছে। আমার কৃপাই বড় কথা। তারপরে পাঠ। আমি কৃপা না করলে পাঠ শুনেও কেউ আমার দেখা পায় না।' তখন স্যার তাড়াতাড়ি ঠাকুরকে প্রণাম করলেন। ঠাকুর জীবনকৃষ্ণ স্যারকে বললেন, 'ওকে প্রণাম কর।' স্যার আমাকে প্রণাম করলেন। প্রচণ্ড অস্বস্তিতে ঘুম ভেঙে গেল।

(দ্রষ্টা এই স্বপ্নের মাধ্যমে তাঁর গৃহশিক্ষককে শিক্ষা দিলেন এবং শ্রীভগবানের কৃপায় তিনিও শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তা গ্রহণ করলেন। জগতগুরু লাভ হলে জগতের বিভিন্ন মানুষের স্বপ্ন থেকে শিক্ষা পেয়ে আত্মজ্ঞান লাভের পথে অগ্রসর হওয়া যায়।)

তপন ঘোষ

ধরমপুর, ইলামবাজার

ভয় নাই

সুকুমারের কাছে জামবুনিতে অধ্যাত্ম-চর্চার অভিনব ধারার কথা শুনে বেশ উৎসাহ বোধ করলাম। পাঠে যোগ দিয়ে অনেক নতুন কথা শিখলাম। আমি কিন্তু জীবনকৃষ্ণের দেখা পেয়েছি অনেক পরে। বাড়ীর অন্য লোকেরা দেখেছে আগে। ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত লাগত। স্নেহময়দাকে বলতাম, আমি জীবনকৃষ্ণকে দেখছি না কেন ? হয়ত শোনামাত্র ওনাকে দেখলে মনের চিন্তার প্রতিফলন ভেবে তা অগ্রাহ্য করতাম। যাইহোক পরে অনেকবারই তিনি দেখা দিয়েছেন।

বাড়ীতে মা ও বোনকে বলেছিলাম কোন স্বপ্ন দেখলে যেন জানায়। দু'একদিন পর মা একটি স্বপ্নের কথা বলল। মা দেখেছে- ঢেঁকিতে ধান ভাঙছে। হঠাৎ ঢেঁকির গড় থেকে উঠে এলেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ। স্বপ্নেই মায়ের মনে হয়েছিল ইনি জীবনকৃষ্ণ। (কঠোপনিষদে আছে- ধানের খোসা হইতে মধ্যের শাঁস বের করার ন্যায় দেহ হইতে আত্মা নিঃসৃত হয়। ঐ স্বপ্নে দ্রষ্টাকে আত্মা রূপ ধারণ করে দেখা দিয়েছেন।) এরপরও মা জীবনকৃষ্ণকে অনেক স্বপ্নে দেখেছেন।

বোনও (রূপালী) জীবনকৃষ্ণের কথা শোনার আগেই একদিন স্বপ্নে দেখল– ঘরের ভিতর আলু আনতে গেছে। দেখে দরজায় সৌম্যকান্তি দীর্ঘকায় এক পুরুষ দাঁড়িয়ে। ভয়ে চিৎকার করে উঠল। জেঠিমাকে বলল, 'ওনাকে সরিয়ে দাও।' জেঠিমা বলল, 'উনি যে ঠাকুর। ওনাকে কি করে ঠেলে সরাই।' পরদিন সুকুমারদের বাড়ীতে জীবনকৃষ্ণের ছবি দেখে চিনতে পারল যে স্বপ্নে দেখা মানুষটি স্বয়ং জীবনকৃষ্ণ। আমাকে সেকথা বলল। আমি তো হতবাক। কয়েক দিন পর একটি স্বপ্ন লিখে আমার হাতে দিয়ে বলল, পাঠচক্রে নিয়ে যেও। স্বপ্নটি পড়ে এর কারণ বুঝতে পারলাম। ও দেখেছে— "মনসা পুজোর জন্য আমি ও দিদি দোকানে বাতাসা কিনতে গেছি। পথে জীবনকৃষ্ণের সঙ্গে

দেখা। উনি বললেন, 'কোথায় যাচ্ছিস ?' বললাম, 'পুজোর বাতাসা কিনতে যাচ্ছি।' উনি বললেন, 'বাতাসা নিয়ে কি ঠাকুরের পুজো হয় ?' তারপর আবার দেখছি দুর্গা তলায় পুজো দিতে গেছি। সেখানেও দেখা হল জীবনকৃষ্ণের সঙ্গে। উনি বললেন, 'এভাবে পুজো করিস না। বাড়ী ফিরে যা। আর তুই এই যে স্বপ্ন দেখলি এটা লিখে পাঠচক্রে পাঠাবি।' তবে কি আমি স্বপ্ন দেখছি ? যেই ভাবা অমনি ঘুম ভাঙল।''

আমি একদিন দেখছি জীবনকৃষ্ণের কাঁধে চড়ে নানান জায়গা দেখে বেড়াচ্ছি। এ জাতীয় স্বপ্নের আনন্দ বলে বোঝান যায় না। আমি প্রতিদিন শোবার সময় জীবনকৃষ্ণকে স্মরণ করে শুই। M.S.W পরীক্ষার সময় একদিন হয়েছে কি গভীর রাত্রি পর্যন্ত পড়াশুনো করে কোন এক সময় বুকের উপর বইটি রেখে ঘুমিয়ে পড়েছি। হঠাৎ শুনলাম আমার কানের কাছে কে যেন একটানা 'জীবনকৃষ্ণ' নাম জপছে। ধড়মড় করে উঠে বসলাম। পাশে কাউকে দেখতে না পেয়ে বুঝলাম এতক্ষণ স্বপ্ন চলছিল। আর এক রাত্রে দেখছি– আজ যেন বিজয়া দশমী। মা আর আমি সকলকে খই নাড়ু দিচ্ছি। একটি মুখোশ পরা লোক এল। সে বলল, 'আমি বিভিন্ন মহাপুরুষকে দর্শন করেছি। আমি যীশুকে দেখেছি'– বলামাত্র লোকটি যীশু হয়ে গেল। পরে বলল, 'আমি ভগবানকে দেখেছি'– অমনি মানুষটি জীবনকৃষ্ণ হয়ে গেল। মাকে বললাম, 'এবার তোমার বিশ্বাস হল তো ?' ...ঘুম ভাঙলে মনে হল এ স্বপ্ন আমারই সংশয় মোচনের জন্য।

এখন একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছি যে ভয় পেলে আপনা থেকে আমার মুখ দিয়ে জীবনকৃষ্ণ নাম বেরিয়ে আসে। জীবনকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করলে আমি যেন ভীষণ সাহস পাই! তাছাড়া যখনই মানসিকভাবে খুব চাপের মধ্যে থাকি তখন খুব ভাল ভাল স্বপ্ন হয়, ঠাকুর জীবনকৃষ্ণ বুঝিয়ে দেন যে আমি ঠিক পথে আছি আর তিনি আমার সহায় আছেন। মনে খুব জোর পাই।

উত্তম প্রধান
রূপপুর, বীরভূম

মানিক এসেছে

দিদির কাছে শুনলাম ওরা নাকি স্বপ্নে রামকৃষ্ণ ও জীবনকৃষ্ণকে দেখতে পায়। ওরা এখন পুজোটুজো তুলে দিয়েছে। কথামৃত পাঠই ওদের পুজো। কয়েকদিন পর আমিও স্বপ্নে ঠাকুর জীবনকৃষ্ণের দেখা পেলাম। দেখছি–আকাশের গায়ে ভেসে চলেছে দুটি সাদা বলদ। তাদের শিংগুলো সামনের দিকে বাঁকানো। পিছন পিছন চলেছে একজন নেড়া মাথা ভদ্রলোক, পরনে তাঁর ধুতি, খালি গা। স্বপ্নেই মনে মনে বলছি, আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না। বুঝতে পেরেছি তুমিই ভগবান। ঘুম ভাঙলে বুঝলাম, আরে আমি তো জীবনকৃষ্ণকে দেখলাম! মন আনন্দে ভরে গেল।

(দেহ জমি কর্ষণের ভার যার উপর সেই সচ্চিদানন্দগুরু জীবনকৃষ্ণ যে এক রূপে শ্রীভগবান—এই সত্য দ্রষ্টার কাছে প্রকাশিত হল।)

আমার বাবার ঠাকুর দেবতায় কোন ভক্তি বিশ্বাস ছিল না। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে স্বপ্নে জীবনকৃষ্ণকে দেখে ধ্যান ধারণা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। ওর পরিবর্তনে বাড়ীর সকলেই খুব অবাক হয়েছি। বাবা একদিন দেখল—ঘরের বারান্দায় বসে আছেন জীবনকৃষ্ণ। বাবা ওনাকে প্রণাম করতে গেলে উনি বললেন, 'যা, যা, আমার কাছে আসিস না।' বাবা বলল, 'আপনি যাই বলুন আমি আপনাকে ছাড়ব না, আমার দায়িত্ব আপনাকে নিতেই হবে।' বাবার নাছোড়বান্দা ভাব দেখে ঠাকুর বললেন, 'বেশ, তবে কিন্তু আমার নির্দেশ মেনে চলতে হবে।' বাবা রাজী হল। উনি কতকগুলি নির্দেশ দিলেন। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুটা ছাড় পাওয়া যাবে তাও বলে দিলেন। ঘুম ভাঙল।

আমার মা-ও ঠাকুরের কৃপা পেয়েছে। একদিন মায়ের শরীর ভাল ছিল না। গা হাত পা ব্যথা করছিল। রাত্রে স্বপ্ন হল—মা অসুস্থ অবস্থায় শুয়ে আছে। কে এক ভদ্রলোক পাশে এসে বসলেন। তারপর মায়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। মা জিজ্ঞেস করল, 'কে তুমি ? তুমি কি চোর, না ডাকাত ?' উনি শান্ত গলায় বললেন, 'তোর শরীর খারাপ বলে দেখতে এসেছি। আমাকে চিনতে পারছিস না ?' ওনার মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে মা বুঝতে পারল উনি স্বয়ং জীবনকৃষ্ণ। মা তখন চিৎকার করে সকলকে ডাকতে লাগল, 'ওরে কে কোথায় আছিস দেখে যা—আমার ধন এসেছে, আমার মানিক এসেছে!' ...মায়ের চিৎকারে বাড়ী শুদ্ধ সকলেরই ঘুম ভেঙে গেল।

জীবনময় ভাণ্ডারী
যাদবপুর, বীরভূম

মহাসিন্ধুসম

শ্রীজীবনকৃষ্ণকে যে স্বপ্নে প্রথম দেখেছিলাম সেটি এখানে উল্লেখ করছি। দেখছি আমি আর রামদা এক জায়গায় গেছি। সেখানে বহু লোক। সকলে অধীর আগ্রহে একটি আকাশচুম্বী তোরণের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছে। হঠাৎ একটা বিরাট কালো রঙের ওড়নার মত কাপড় উপর থেকে ভেসে ভেসে নামতে লাগল। জানা গেল ঐ কাপড়টি যার মাথায় পড়বে সে ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রাপ্ত বলে বিবেচিত হবে। আশ্চর্যের বিষয় ভো-কাট্টা ঘুড়ির মত কাপড়টি ভাসতে ভাসতে এক সময় অভাবনীয় ভাবে আমাদের দুজনের মাথায় জড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বসিত জনতা আমাদের ঘিরে উল্লাস করতে লাগল।

সেখান থেকে ফিরবার পথে দেখছি আশ্রমিক পরিবেশে একটা গাছের নীচে একটা আসনে বসে আছেন আমাদের সুপরিচিত সাগরদা। ধুতি পাঞ্জাবী পরিহিত সৌম্য শান্ত

মূর্তি। পাশে বসে আছে স্নেহময়। কাছে এগিয়ে গিয়ে সাগরদাকে প্রণাম করে কুশল জিজ্ঞাসা করলাম। স্নেহময় কৌতুক ভরে মুচকি হেসে মৃদুস্বরে আমায় জিজ্ঞাসা করল, 'এনাকে চিনতে পেরেছ ?' আমি বললাম, হ্যাঁ, ইনি তো সাগরদা। স্নেহময় হেসে বলল, 'ইনিই জীবনকৃষ্ণ।' আমি তখন গভীর বিস্ময়ে সাগরদার পানে তাকালাম। দেখি উনিও মৃদু হাসছেন। আমি একদৃষ্টে তাকিয়েই আছি। ধীরে ধীরে মুখের অবয়বটা যেন পাল্টে জীবনকৃষ্ণে পরিবর্তিত হল। (শ্রীজীবনকৃষ্ণ মহাসমুদ্রের মতই অন্তহীন।)

অসীম আত্মিক চৈতন্যের আধার শ্রীজীবনকৃষ্ণের লীলা যত দেখি বা শুনি ততই অদ্ভুত এক আনন্দে দেহমন ভরে ওঠে, নতুন প্রাণ পাই যেন। তাই বারবার পাঠচক্রে ছুটে যাই মনের ক্লান্তি দূর করে নতুন উদ্যম লাভ করার মানসে।

আমার একটা মজার স্বপ্ন জানাই। দেখছি জয়ন্তীদির সাথে বাবার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। বললাম, 'দিদি, ইনি আমার বাবা। আর বাবা, ইনি সেই জয়ন্তীদি যার কথা তোমায় আগে বলেছি। বলতে বলতেই মনে হল আরে এতো আমার বাবা নয়। তখন দেখি সামান্য দূরে আমার বাবা দাঁড়িয়ে। রেগে কটমট করে তাকাচ্ছেন আমার দিকে। আমি বললাম, 'সরি (Sorry), ভুল হয়ে গেছে। ঐ যে দেখছেন, উনি আমার বাবা। এই ভদ্রলোক ঠিক বাবার মত দেখতে বলে আমার ভুল হয়েছিল।' বাবা বললেন, 'লজ্জা করে না, নিজের বাবাকে চিনতে পারছ না, বেশ ছেলে!' লজ্জায় মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকলাম। একরাশ অস্বস্তি নিয়ে ঘুম ভাঙল। পাঠচক্রে এসে স্বপ্নের ব্যাখ্যা পেয়ে আমার দুশ্চিন্তা ঘুচল।

(দ্রষ্টার ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন–ব্রহ্মজ্ঞান হলে জগৎ ভুল হয়ে যায়। তাই স্বপ্নে বাবাকে চিনতে ভুল হচ্ছে।)

শান্তিময় সরকার
সুপুর, বীরভূম

অঙ্গুষ্ঠবৎ

দু'একদিন পাঠ শোনার পর থেকেই আমার স্বপ্ন হতে লাগল। আমার দেখা কয়েকটি স্বপ্ন নীচে উল্লেখ করলাম।

১) দেখছি (৪/১২/১৯৯০) - একটি দেশলাই কাঠি দেওয়ালে ঘসে দেওয়ায় মুহূর্তে সারা ঘরে আগুন জ্বলে উঠল। মাকে বললাম, 'পালিয়ে এসো।' মা বলল, 'এই তো জ্বালা তোকে নিয়ে।' বাড়ীর সামনে আমার সমান দৈর্ঘ্যের একটি বাঁশ পোঁতা ছিল। বাঁশটির ভিতর খুব ছোট্ট (আঙুল পরিমাণ) জীবনকৃষ্ণকে দেখতে পেয়ে প্রণাম করলাম। উনি অমনি বড় আকৃতির হয়ে গিয়ে আমাকে আশীর্বাদ করলেন! তখন দেখি ঘরের আগুন নিভে গেছে। দেওয়ালে হাত দিয়ে দেখছি সব জায়গা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

(বাঁশ–দেহ, আধার। 'কোন বাঁশের ফুটো বেশী'–শ্রীরামকৃষ্ণ। আঙুল প্রমাণ জীবনকৃষ্ণ–সকল প্রাণীর অন্তরাত্মা অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত পুরুষরূপে যোগীদের হৃদয়ে প্রকাশমান হন–শ্বেতাশ্বেতর ৩।১২। আত্মা বা ভগবান প্রসন্ন হলে কামনার আগুন নিভে যায়।)

২) দেখছি (৫/৮/১৯৯২)–পুকুরে একটি রাজহাঁস চরছে। হঠাৎ হাঁসটি জীবনকৃষ্ণ হয়ে গেল। খুব অবাক হলাম। আমি বললাম, 'তুমি কে ?' উনি বললেন, 'আমি সূর্য।' বললাম, 'তাহলে তোমার সেই আলো কই ?' উনি বললেন, 'দেখবি তবে ?' বললাম, 'দেখব।' তখন ওখানে একটি সূর্য হয়ে গেল। তার ভিতর একটি পদ্মফুল। সেই ফুলের উপর বসে জীবনকৃষ্ণ ধ্যান করছেন। তার দেহ থেকে প্রচণ্ড জ্যোতি বেরোতে লাগল। চোখ ধাঁধিয়ে গেল। বললেন, 'দেখছিস তো ?' ...ঘুম ভাঙল।

(সূর্য–তেজ (ভগ) আছে যার, ভগবান–ঋক্‌বেদ। যিনি পরমহংস বা ভগবান হয়েছেন তিনি অপরের সহস্রারে (সহস্রদল পদ্মে) সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষরূপে উদ্‌ভাসিত হয়ে নিজের আত্মিক অবস্থার প্রমাণ দেন।)

৩) দেখছি–বনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি। একটি গাছে চোখ পড়তেই অবাক হয়ে দেখি পাতার বদলে এক একটি ছোট্ট ধ্যানমগ্ন জীবনকৃষ্ণ পাতার মত গাছটিতে লেগে রয়েছে। গাছে অন্য কোন পাতা নেই। ...ঘুম ভাঙল।

(গাছের পাতাটি নড়ে শ্রীভগবানের ইচ্ছায়, বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীজীবনকৃষ্ণ একধাপ এগিয়ে বললেন, গাছের পাতাটি নড়ে না, শ্রীভগবানই নড়েন।)

দেবরঞ্জন চ্যাটার্জী
চতুর্থ শ্রেণী

ধর্ম কি নিয়ে বাবা ? এই দেহ আর সেই দেহেতে শ্রীভগবানের লীলা! এই হল ধর্ম।
——শ্রীজীবনকৃষ্ণ

জগদ্‌গুরু

জিতেনবাবু থাকতে আমি পাঠে যেতাম। সেসব দিন খুব আনন্দে কেটেছে। চারুপল্লীতে পাঠে যাবার সময় পাই না। তবে ৭ই জ্যৈষ্ঠ ও ২৬শে কার্তিকের অনুষ্ঠান শুনতে যাই, আর মানিক পত্রিকা পড়ি। ঠাকুরের কৃপায় এখনও সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন হয়। আমার স্বামী ও ছেলেরা শ্রীজীবনকৃষ্ণের দেখা পেয়েছে স্বপ্নে। আমার একটি স্বপ্ন ঃ দেখছি–কেদারনাথ যাচ্ছি। কোন এক জায়গা থেকে যেন ঘোড়ায় চড়ে যেতে হয়। ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছি দু'পা একই দিকে রেখে। সব ঘোড়াগুলি একজন লোকের। তিনি একাই সব দেখাশোনা করছেন। ভদ্রলোক হাঁটু পর্যন্ত ধুতি পরেছিলেন, মাথাটা নেড়া। ওনাকে বললাম, 'দেখুন, আমার পায়ে ব্যথা করছে। এভাবে তো যেতে পারব না।' তখন উনি বললেন, 'আচ্ছা, ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।' এই বলে অন্য একটি ছোট ঘোড়া এনে তার উপর আমাকে বসিয়ে

দিলেন। ঘোড়ায় চড়ে যেতে যেতে ঘুম ভাঙল। উঠে দেখি পায়ে সত্যি সত্যিই খুব যন্ত্রণা হচ্ছে, দাঁড়াতে পারছি না। আরও খেয়াল করতে পারলাম যে ঘোড়াগুলোর মালিক হিসাবে যাঁকে দেখেছি তিনি আর কেউ নন স্বয়ং শ্রীজীবনকৃষ্ণ।

(ঘোড়া—কুণ্ডলিনী, যার ঊর্দ্ধমুখী গতি মানুষের মনকে সহস্রারে (কেদারবদ্রী) পৌঁছে দেয়। শ্রীজীবনকৃষ্ণের কৃপায় বহু মানুষের কুণ্ডলিনী জাগ্রত ও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এবং তারা কেদারনাথ শিব অর্থাৎ এককে জানার পথে এগোচ্ছেন।)

বড় ছেলে সুভাষময়ের স্বপ্ন ঃ 'দেখছি—একটি মস্তান গোছের লোক সকলকে জোর করে ধরে ইঞ্জেকসন্ দিয়ে দিচ্ছে। মা-কেও দিল। আমি তাকে এক ঘুষি মেরে পরক্ষণে ভয় পেয়ে ছুটে পালালাম। দিলীপবাবুর ঘরে লুকিয়েছি। মস্তানটির লোকজন তা দেখে ফেলেছে। শেষে ওর কাছে ধরা দিতে বাধ্য হলাম। ও একটি চৌদোলা আনালো। তার ভিতর আমাকে ঢুকতে বলল। ভয়ে ঘুম ভেঙে গেল। জীবনকৃষ্ণের ফটোর সাথে মস্তানটির চেহারার মিল দেখে খুব অবাক হয়েছিলাম।'

(জোর করে ইঞ্জেকসন্ দিচ্ছেন—সচ্চিদানন্দগুরু জোর করে অন্তর ভেদ করে ফুটে উঠে অহংরূপ ব্যাধি দূর করেন। মনে হচ্ছে মস্তান—প্রাণশক্তিতে পূর্ণ।)

আমার স্বামীর (সূর্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়) দর্শন ঃ 'জামবুনিতে বিশ্বনাথ মণ্ডলের বাড়ীতে ভরতের গলায় জীবনকৃষ্ণ কীর্তন শুনছি। ভরতের পাশে আমার গুরুদেব জগদীশ বাবা দাঁড়িয়ে রয়েছেন দেখলাম। হাত কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম জানালাম। প্রণামের পর দেখছি ইনি তো আমার গুরুদেব নন। হাঁটু পর্যন্ত ধুতি পরে, খালি গায়ে নেড়া মাথা ভদ্রলোকটি কে ? যতক্ষণ গান হল ততক্ষণ আমি ওনাকে স্পষ্ট দেখলাম। গান শেষ হলে আর দেখা গেল না। পরে ফটো দেখে বুঝলাম উনিই শ্রীজীবনকৃষ্ণ।'

ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়
সুরুল, শ্রীনিকেতন

দাও পরিচয়

শ্রীজীবনকৃষ্ণের কথা যখন প্রথম শুনলাম বেশ ভাল লাগল। সম্পূর্ণ নতুন কথা। তবে সত্যি কথা বলতে কী, মনেপ্রাণে পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারি নি। পরে যখন বিভিন্ন স্বপ্নে শ্রীজীবনকৃষ্ণের দেখা পেয়ে তাঁর সম্বন্ধে শোনা কথাগুলির প্রমাণ পেলাম তখন থেকে আমার অধ্যাত্মচিন্তার আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল। প্রথমবার যখন তাঁর দর্শন পাই তখন ছিলাম কলকাতায়। ওখানে ছাব্বিশে জানুয়ারী হিমাংশু বাবুর বাড়ীতে অনুষ্ঠিত বিশেষ পাঠে যোগ দেবার কথা ছিল। কিন্তু চোখে ইন্‌ফেক্‌স্‌ন হয়ে গেল। ভাল করে তাকাতে পারছিলাম না। তাই যাওয়া সম্ভব হল না। দুপুরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি। স্বপ্নে দেখলাম—শ্রীজীবনকৃষ্ণ কাছে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'তুই পাঠ শুনতে যাবি

তো আমার সাথে আয়।' এই বলে হাতের লাঠিটি এগিয়ে ধরলেন। সেটি ধরে ওনার পিছু পিছু যেতে লাগলাম। যত যাচ্ছি ততই গভীর আনন্দে ডুবে যাচ্ছি। ...ঘুম ভাঙল। শ্রীজীবনকৃষ্ণকে দেখার গুরুত্ব বোঝাবার জন্য তিনি আমার স্ত্রীকে একটি অভিনব স্বপ্নে জানালেন যে আমার ভগবান দর্শন হয়েছে। ধন্য কৌশল!

আমি এখন চাকরী সূত্রে গৌহাটিতে থাকি। এখানেও আমার প্রায়ই সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন হয়। শ্রীজীবনকৃষ্ণ কৃপা করে দেখা দেন। একটি স্বপ্ন এখানে উল্লেখ করছি। দেখছি—একটা হলঘরে অনেক লোক বসে আছে। আমি দাঁড়িয়ে আছি। তাদের যেন কিছু বোঝাচ্ছি। পাশে ব্লাকবোর্ডের জায়গায় মহাশূন্য। বোধ হচ্ছে এটাই মহাবিশ্ব। আমার হাতে লম্বা ছড়ি। সেই মহাশূন্যে ঢেউ খেলানো অংশ রয়েছে। তার একটি ভাঁজ থেকে লাল আলো জ্বলে উঠে শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তি ফুটে উঠল। আমি রামকৃষ্ণ সম্পর্কে ঐ লোকেদের কিছু কথা বললাম। এরপর শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তি অদৃশ্য হল। অনুরূপভাবে আর একটি ভাঁজ থেকে লাল আলো জ্বলে উঠে বিবেকানন্দের মূর্তি ফুটে উঠল সেখানে। তাঁর সম্পর্কেও কিছু বললাম। এরপর রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি আরও কয়েকজন মহাপুরুষের দেখা মিলল একে একে। তাদের পরিচয় দেবার পর সবশেষে জীবনকৃষ্ণের রূপ ফুটে উঠল। ওনার কথাও বললাম। আমার বলা শেষ হলে উনি বললেন, 'এবার তোর পরিচয়টা ওদের কাছে বল।' ওনার এই কথাটা আমার মাথার মধ্যে বারবার অনুরণিত হতে লাগল। আমার আর বলা হল না। স্বপ্ন ভেঙে গেল।

(লাল আলো—চৈতন্যের প্রকাশ। বিভিন্ন মহাপুরুষ প্রসঙ্গে—আত্মিক জগতে আলোকবর্তিকা যাঁরা সেই সব মহাপুরুষদের নব মূল্যায়ন প্রয়োজন। তোর পরিচয়টা বল—এতদিন সাধারণ মানুষ মহাপুরুষদের দূর থেকে সম্মান দিয়ে এসেছে, পুজো করেছে কিন্তু নিজেদের আত্মিক পরিচয় বিস্মৃত হয়েছিল। শ্রীজীবনকৃষ্ণ এই আত্মবিস্মৃত সাধারণ মানুষের অন্তরে উদ্ভাসিত হয়ে তাদেরকে এই সত্য জগতের দরবারে ঘোষণা করার অধিকার দিলেন যে প্রত্যেকে ব্রহ্মের এক একটি রূপ, অনন্তশক্তির আধার।)

অভিজিৎ গায়েন
জামবুনি, বোলপুর

কর পার

আমাদের গ্রামের লাইব্রেরীয়ান শ্রীধরদার সংগে আমার দীর্ঘদিনের জানাশোনা। লাইব্রেরীতে গিয়ে ওনার সাথে নানা বিষয়ে আলোচনা চলত। বছর চারেক আগে একদিন কথা প্রসঙ্গে উনি বললেন, 'আচ্ছা, উত্তম তুমি কি কোন স্বপ্ন দেখ ?' আমি বললাম, 'কেন বলুন তো ?' উনি বললেন, 'স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে ভগবান মানুষের শরীরে ফুটে ওঠেন।' আমি তো হেসেই উড়িয়ে দিলাম। কৌতূহল বশে একদিন ওনার বাড়ীতে

গেলাম পাঠ শুনতে। পাঠ শেষ হলে স্নেহময়দা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। আমি সেদিন কিছুই বুঝলাম না। যাইহোক বাড়ী ফিরে এলাম। ঐ রাত্রেই একটি ছোট স্বপ্ন দেখলাম। কে যেন আমায় বলছে—'ওঠ্, জাগ।' কে যে বলল ঠিক চিনতে পারলাম না। সেইদিন বিকালে শ্রীধরদাকে এই স্বপ্নের কথা বললাম। উনি বললেন, 'এই অচেনা পুরুষই ভগবান।' তখন থেকেই আমার পাঠে যাওয়া শুরু হল। যদিও সংসারে ঘাত-প্রতিঘাতে নিয়মিতভাবে পাঠে যাওয়া হয়ে ওঠে না, তবে নিত্য স্মরণ-মনন বজায় আছে তাঁর কৃপায়। নীচে আমার দুটি দর্শনের কথা উল্লেখ করলাম।

১) একবার পারিবারিক কলহের পরিণতিতে এক আত্মীয়ের দ্বারা ছুরিকাহত হই। ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ি। সিয়ান হাসপাতালে আমার কোনরূপ জ্ঞান ছিল না। আমাকে বর্ধমান হাসপাতালে বদলি করা হল। অপারেশন থিয়েটারে আমি শুয়ে আছি। হঠাৎ দর্শন হল–শ্রীজীবনকৃষ্ণ আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। বললেন, 'আমি তো আছি, তোর কোন ভয় নাই।' পরে অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে আমি আরোগ্য লাভ করি।

২) স্বপ্নে দেখছি—ভোর রাত্রে বেড়াতে বেরিয়েছি গঙ্গার পাড় ধরে। আমি যে পাড় ধরে চলেছি সেই পাড়টা ফাঁকা আর অপর পাড়টি জঙ্গলে পরিপূর্ণ। অনেকক্ষণ ধরে হাঁটছি। পিছন থেকে একজন বৃদ্ধলোক এসে আমাকে অতিক্রম করে চলে গেলেন। উনি নদীর জলের উপর দিয়ে হেঁটে ওপারের দিকে এগোতে লাগলেন। দেখাদেখি আমিও জলের উপর হাঁটতে গেলাম কিন্তু আমার পা ডুবে যাচ্ছে। তখন ভদ্রলোকটির উদ্দেশ্যে বললাম, 'বাবা, ও বাবা, আমাকে ওপারে নিয়ে চলুন না।' উনি ডাক শুনে ফিরে এলেন। তারপর আমার হাত ধরে ওপারে নিয়ে গেলেন। আমরা যখন মাঝ নদীতে, তখন দেখি ওপারে সূর্য উঠছে। ওপারে পৌঁছেই আমি বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে চিনতে পারলাম, উনি শ্রীজীবনকৃষ্ণ। সূর্যটা তখন ওনার পিছনে চালির মত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল আর উনি ডান হাতটা আশীর্বাদ করার ভঙ্গীতে উপরে তুললেন। ...স্বপ্ন ভেঙে গেল।

(ভোর রাত্রে অনেকক্ষণ ধরে হাঁটছি—'রাত্রি অন্ধকারে চলেছে মানবযাত্রী, যুগ হতে যুগান্তর পানে।' এক বৃদ্ধ আমাকে অতিক্রম করে গেলেন— আবহমানকালের আত্মিক অগ্রগতিকে ডিঙিয়ে গেলেন। নদীর ওপারে যাচ্ছেন–জীবকূল থেকে মানুষ-কূলে, জীবত্ব থেকে শিবত্বে উত্তরণ। হাত ধরে ওপারে নিয়ে গেলেন—মনুষ্যজাতির পরিত্রাতা (saviour of humanity)। সূর্য উঠছে—নতুন যুগ শুরু হল। চিনতে পারলাম... সূর্যটা পিছনে চালির মত—জগতের মানুষের মধ্যে তাঁর (শ্রীজীবনকৃষ্ণের) চিন্ময় রূপ ফুটে উঠল। প্রাণ চৈতন্যের (প্রাণসূর্য) নানাবিধ বিকাশের (নানান দর্শন অনুভূতির) মাধ্যমে এ যুগের মানুষ সহজেই চিনে নিতে পারছেন অন্তরের শাশ্বত পুরুষকে (বৃদ্ধকে), যাঁকে সে খুঁজে বেড়িয়েছে যুগ যুগ ধরে, যার জন্য সর্বপ্রকার কৃচ্ছ্রসাধনকে সে স্বীকার করেছে। সেই পুরুষকে জেনে সে উপলব্ধি করে মানুষই ব্রহ্ম, অমৃত ও অভয় (...'এতদ্ অমৃতম্, এতদ্ অভয়ম্')।

উত্তম যশ
সিয়ান, বীরভূম

পিপাসিত আমি

কাকীমার (সন্ধ্যা রুদ্র) কাছে চারুপল্লীতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ ও শ্রীজীবনকৃষ্ণের বিষয়ে শুনে মা (কৃষ্ণা আচার্য্য) ওনার সঙ্গে পাঠে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। পাঠ শুনে মায়ের খুব ভাল লেগেছিল। দু'একদিন পর উনি দেখলেন–আমার মামার বাচ্চা মেয়েটি মারা গেছে। সকলে কান্নাকাটি করছে। তখন সেখানে ধুতি পাঞ্জাবী পরে সৌম্যকান্তি এক ভদ্রলোক এলেন। তিনি বললেন, 'মেয়েটিকে দু'চামচ গরম জল খাইয়ে দাও। ও বেঁচে যাবে।' জল খাওয়াতেই মেয়েটি বেঁচে উঠল। ঘুম ভাঙল। ফটো দেখে নিশ্চিত হলেন যে ঐ ভদ্রলোক স্বয়ং শ্রীজীবনকৃষ্ণ।

(দ্রষ্টার নবজীবন লাভ হল শ্রীজীবনকৃষ্ণের কৃপায়।)

এরপর ৭ই জ্যৈষ্ঠের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে খুব আনন্দ পেলাম। আমিও নানা স্বপ্নে জীবনকৃষ্ণের দেখা পেতে লাগলাম। একটি স্বপ্ন এই রকম–হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছি। ডাক্তারের বেশে জীবনকৃষ্ণ আমার চিকিৎসা করলেন। কিছুক্ষণ পর দেখি উনি ধুতি পাঞ্জাবী পরে আমার কাছে এলেন। আমি জল খেতে চাইলাম। উনি বললেন, 'সব জল নোংরা, একমাত্র আমার কাছেই ভাল জল আছে।' এরপর উনি কাপড় ঢাকা মিলিটারীদের জলের বোতলের মত একটি বোতল থেকে ঢেলে এক গ্লাস জল আমায় দিলেন। আমি সেই জল পান করে ভীষণ তৃপ্তি পেলাম। ...ঘুম ভাঙল।

(ডাক্তার–ভবরোগের বৈদ্য, ভগবান। সব জল নোংরা–রস স্বরূপ ভগবানের লীলা আস্বাদন ব্যতীত মানুষের চাহিদা (তৃষ্ণা) মেটানোর কোন ব্যবস্থাই মানুষকে প্রকৃত অর্থে সুস্থ (অহং শূন্য) হতে সাহায্য করে না।)

এই সুযোগে আমার ছোট বোনের (পিয়ালি আচার্য্য) প্রথম দর্শনটিও উল্লেখ করছি। 'কলকাতায় ছাব্বিশে জানুয়ারীর জীবনকৃষ্ণ-অনুষ্ঠানে দিদিরা যখন 'প্রেম মুদিত মনসে কহ জীবনকৃষ্ণ নাম'–গানটি গাইছিল তখন আমি দেখলাম ফটো থেকে জীবনকৃষ্ণ জীবন্ত হয়ে ধীরে ধীরে নেমে হারমোনিয়ামের উপর দাঁড়ালেন। তারপর ওখান থেকে ছোট ছোট পা ফেলে এগিয়ে এসে আমার দেহে মিলিয়ে গেলেন।'

(দ্রষ্টাকে দেখালেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ মৃত (ফটো, ছবি) নন, তাঁর বিকাশ (গতি) অব্যাহত। তিনি হারমোনি (Harmony) অর্থাৎ বহুত্বে একত্ব প্রতিষ্ঠা করে চলেছেন দ্রষ্টার মত অসংখ্য মানুষের দেহাভ্যন্তরে জেগে উঠে।)

শুক্লা আচার্য্য
স্কুলবাগান, বোলপুর

ভখিব গরল

আমি জীবনকৃষ্ণকে প্রায়ই স্বপ্নে দেখি। ওনাকে স্বপ্নে দেখতে পেলে ভীষণ আনন্দ হয়। আমার দেখা কয়েকটি স্বপ্ন এখানে জানাচ্ছি।

১) স্বপ্নে দেখছি (২/১/৯৩)–কয়েকজন লোক আমাকে মারতে চাইছে। ওদের চোখে আমি অপরাধী। তবে আমি কী দোষ করেছি তা জানি না। ওরা আমাকে এক গ্লাস বিষ খেতে দিল। আমি গ্লাসটা হাতে নিয়ে 'জয় জীবনকৃষ্ণ' বলে উঠলাম। অমনি আমার স্বপ্ন শুরু হল। স্বপ্নের মধ্যেই স্বপ্ন কিন্তু। দেখছি–আমি জীবনকৃষ্ণ হয়ে গেছি। আমার হাতে ধরা গ্লাসে বিষের পরিবর্তে রয়েছে মধু। মধুটা খেয়ে নিলাম। ঘুম ভাঙল।

(জগৎ আঘাত দেবেই। এর থেকে পরিত্রাণের পথ হল শ্রীভগবানের নাম নিয়ে আত্মিকে তাঁতে পরিবর্তিত হওয়া। তখন মধুময় অন্তরে জগতের মধুমতী রূপটি ধরা পড়ে, তারই রসাস্বাদনে দেহমন তৃপ্ত হয়।)

২) বন্ধুদের অনেকের স্থূলে (জাগ্রত অবস্থায় খালি চোখে) দর্শন হয়। আমার শুনে খুব অবাক লাগত। একদিন (৩১/৭/১৯৯২) পাঠ শুনতে শুনতে হঠাৎ আমার চোখের সামনের দৃশ্য বদলে গেল। মনে হচ্ছে আমি কলকাতায় বহুলোকের সামনে জীবনকৃষ্ণ সম্পর্কে বক্তৃতা দিচ্ছি। একজন আমার কথায় বিশ্বাস করছিল না। সে বলল, 'ওসব বাজে কথা।' আমি বললাম, 'প্রমাণ দেখবে ?' ও বলল, 'হ্যাঁ'। তখন, 'জয় জীবনকৃষ্ণ' বলে চেঁচিয়ে উঠলাম। অমনি উপস্থিত সব লোকের বুক থেকে পেটের মধ্যে একজন করে ছোট ধ্যানমগ্ন জীবনকৃষ্ণ দেখা গেল। অবিশ্বাসী লোকটি ঐ দৃশ্য দেখে হাত জোড় করে বলল, 'আমার ভুল হয়েছিল। এবার আমার বিশ্বাস হয়েছে।'

(একজন অবিশ্বাসী – একটুখানি অবিশ্বাস, দ্রষ্টার মনে (বিশেষত স্থূল দর্শন সম্পর্কে)। অনুভূতি হওয়ায় সংশয় পুরোপুরি ঘুচল।)

৩) গত ২৮/১০/১৯৯২-এ জেঠুর বাড়ীতে টিভি দেখতে গিয়ে একটি স্থূল দর্শনে খুব ভয় পেয়ে গেলাম। বাড়ী চলে এলাম। রাত্রে স্বপ্নে দেখছি–স্নেহময় মামাকে আমার ভয় পাওয়ার কথা বলছি। মামা আমার হাতে কি একটা দিয়ে বলল, 'এটা জীবনকৃষ্ণের হাতে দিবি তাহলে আর ভয় থাকবে না। গ্রামের শেষে যেখানে সাইকেল খেলা হচ্ছে সেখানে জীবনকৃষ্ণ আছেন।' আমি ছুটতে ছুটতে সেখানে গিয়ে দেখি প্রত্যেকেই জীবনকৃষ্ণ। আসল জীবনকৃষ্ণকে খুঁজে বের করার জন্য সকলের গা টিপে দেখতে লাগলাম। একজনের শরীর তুলোর মত নরম ঠেকল। মনে হল ইনিই সত্যিকার জীবনকৃষ্ণ। ওনার হাতে জিনিষটা দিয়ে দিলাম। অমনি উনি বিরাট হয়ে গেলেন। এত বড় যে পুরোটা দেখা যাচ্ছে না। বাকীরা তখন সাধারণ মানুষ হয়ে গেছে। তারপর জীবনকৃষ্ণের দেহ থেকে মাংস, হাড় ইত্যাদি খুলে ছিটকে গিয়ে প্রতিটি মানুষের দেহে কিছু কিছু করে

যুক্ত হতে লাগল। ওনার দেহের কিছুই অবশিষ্ট থাকল না। শেষ টুকরোটা আমার গায়ে লাগল। তখন মনে হল এই জন্যই সকলকে জীবনকৃষ্ণের রূপে দেখলাম।

(একটি জিনিষ দিল—ব্রহ্মজিজ্ঞাসার মূর্তরূপ। শরীর নরম—কাঠিন্য বর্জিত, ষোল আনা সাধন হয়েছে যার। বড় হলেন—ব্রহ্মত্বের পরিচয় দিলেন। ব্রহ্ম কথার অর্থ বৃহৎ, যে বৃহতের ইতি নেই। মানবব্রহ্ম শ্রীজীবনকৃষ্ণ নিজেকে মনুষ্য জাতির মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে ও মানুষকে তাঁর রূপে পরিবর্তিত করে—'আমরা বাইরে বহু ভিতরে এক'—এই জ্ঞান দান করছেন। এই জ্ঞান হলে আর ভয় থাকে না।)

৪) পাঠে শোনা কথাগুলো কত সত্যি তা আবার স্বপ্নে জানিয়ে দেয়। এই রকম একটা স্বপ্ন বলছি। দেখছি (১/৯/১৯৯২)- বন্ধুরা সকলে মিলে বেড়াচ্ছি। হঠাৎ চোখে পড়ল একটা আমগাছ। তাতে প্রচুর আম ধরে রয়েছে, তবে আমগুলি সোনার। আমি বললাম, স্নেহময় মামা পাঠে বলেছিল যে সোনার আম দেখা ভাল। অমনি আকাশের সূর্যটা খুব কাছে চলে এল। তার মধ্যে পদ্মফুলের উপর বসে আছেন জীবনকৃষ্ণ। উনি বললেন, 'স্নেহময় ঠিকই বলেছে। সোনার আম দেখা খুব ভাল।' ...ঘুম ভাঙল।

৫) ৫/৮/১৯৯২-এ স্বপ্ন দেখছি—সুলতানপুর থেকে আসছি। নদীর জল খুব বেড়ে গেছে। গরু ছাগল সব ভেসে যাচ্ছে ঐ জলে। একটু পর হঠাৎ সমস্ত জল সোনা হয়ে স্থির হয়ে গেল। আর মাঝামাঝি অংশে অনেকগুলি 'জয় জীবনকৃষ্ণ' লেখা চোখে পড়ল। তারপর দেখি ঐ লেখাগুলি ঠিক পর পর লাইন দিয়ে বয়ে চলেছে।

(শ্রীভগবানের কৃপায় প্রাণশক্তির সুষুম্না পথে ঊর্দ্ধমুখী প্রবাহ দ্রষ্টার জীবত্ব ভাসিয়ে নিয়ে গেল। ব্রহ্মত্ব লাভ হল (সোনা হল), চৈতন্যের গতি চরম লক্ষ্যে পৌঁছে স্থির হল। Being one with divinity there cannot be any further progress in that sense - Swami Vivekananda. তখন প্রাণের গভীরে শুধু নামের ধারা প্রবাহিত হতে থাকে।)

রামরঞ্জন চ্যাটার্জী
পঞ্চম শ্রেণী

সবারে জানাই

শ্রীধরদার সংগে পরিচয় দীর্ঘদিনের। ওনার বাড়ীতে পাঠ শুনে জীবনকৃষ্ণের কথা জানলাম। তারপর নানান অদ্ভুত স্বপ্নে শ্রীজীবনকৃষ্ণের মহত্ত্ব উপলব্ধি করে ধন্য হয়েছি। আমার ভাইও (নবম ঘোষ) সম্প্রতি পাঠে যাচ্ছে। জীবনকৃষ্ণ ওকেও কৃপা করে স্বপ্নে দর্শন দিয়েছেন। গত ৭/৩/১৯৯৩-এ দেখা আমার একটা স্বপ্ন এখানে জানাচ্ছি।

দেখছি—আমি ল্যাবরেটারীতে রক্ত পরীক্ষা করছি। লোকেরা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি সকলের কাছ থেকে রক্ত নিচ্ছি কাঁচের স্লাইডের উপর আর আমার

খাতাতে তাদের নামটা লিখে রাখছি। ঐ রক্ত একজন মুমূর্ষু রোগীর প্রয়োজন। দেরী হলে রোগীটি মারা যাবে। কিন্তু রোগীর রক্তের সংগে কারও রক্তের মিল খুঁজে পাচ্ছি না। হঠাৎ টেলিফোনে খবর পেলাম পাঁচ মিনিটের বেশী দেরী হলে রোগীকে বাঁচানো যাবে না। বিচলিত হয়ে পড়লাম। এমন সময় একজন বয়স্ক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে একটি স্লাইড আমার হাতে দিয়ে বললেন, আমার রক্তটা একটু পরীক্ষা করে দেখুন। তার কথামত স্লাইডটি মাইক্রোস্কোপে দেখে রোগীর রক্তের সঙ্গে মিল খুঁজে পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে ওনার রক্ত সংগ্রহ করে রোগীকে দিলাম। ওনাকে নাম জিজ্ঞাসা করায় হেসে বললেন, 'আমি মানুষ। তোরা আমাকে জীবনকৃষ্ণ বলে ডাকিস।' আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি এখানে কেন এসেছেন ?' উনি বললেন, 'সামনের ৭ই জ্যৈষ্ঠ আমার জন্মদিনে তোকে নেমন্তন্ন করতে।' আমি বললাম, 'আপনি রক্ত দিলেন কেন ?' উনি উত্তরে বললেন, 'আমার রক্ত তো সবার রক্ত, এতে সকলেরই অধিকার আছে।'

(তিনি সমগ্র মনুষ্যজাতির সম্মিলিত প্রাণশক্তি (collected life power of whole human race)– তাঁকে অন্তরে পেয়ে অহংরূপ ভব রোগ থেকে মুক্তি ও নবজীবন লাভের অধিকার আছে সকলেরই।)

এইরকম অভিনব বেশ কিছু দর্শন তাঁর কৃপায় আমার হয়েছে। যে সব স্বপ্নে এই পাঠচক্রের উপর তাঁর বিশেষ কৃপার কথা তিনি ঘোষণা করেছেন তার একটি উল্লেখ করছি। দেখছি—আমি কয়েকজন আত্মীয়সহ ঠাকুর দেখতে বেড়িয়েছি। প্রতিটি প্যাণ্ডেলের মধ্যে দেখলাম প্রতিমার একপাশে একজন বৃদ্ধ মানুষ একটি বিরাট পদ্মফুলের উপর বসে রয়েছেন। তাঁর হাতে একটি গ্লোব। তিনি বিশেষ রঙ দিয়ে ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার একটি স্থানকে চিহ্নিত করে তা আঙুল বাড়িয়ে দেখাচ্ছেন। ঐ নির্দেশিত জায়গাটির নাম লেখা রয়েছে সংস্কৃত অক্ষরে—'বোলপুর'। আমি তা দেখে অবাক। আত্মীয়দের ডেকে বললাম, 'দেখ, দেখ ঐ তো গ্লোবের মধ্যে বোলপুর।' ঘুম ভাঙল। মনে হল সকলকে চিৎকার করে ডেকে বলি, 'ওগো, তোমরা যারা ঈশ্বরের বিচিত্ররূপ দেখতে চাও, তাঁকে পরিপূর্ণভাবে আস্বাদন করতে চাও তারা এসো বোলপুরের পাঠচক্রে।'

('যে আন্তরিক ঈশ্বরকে ডাকবে তাকে এখানে আসতেই হবে'—শ্রীরামকৃষ্ণ।)

সপ্তম ঘোষ
সিয়ান, বীরভূম

Man becomes God. I have this tale to tell the world. Man is born to become God. This is the sole and fundamental aim of human life.
Sri Jiban Krishna.

পরম আশ্রয়

অনেকে জীবনে চলার পথে প্রধান অবলম্বন হিসাবে পেয়েছেন দেবস্বপ্নকে। স্বপ্নেশ্বরনাথ কিভাবে তাদের পথ দেখাচ্ছেন বা স্বপ্নের মধ্যে কিভাবে তারা পরম আশ্রয় লাভ করেছে – এই অধ্যায়ে সেদিকেই আলোকপাত করা হল।

মণিহার

প্রায়ই সুন্দর সুন্দর দেবস্বপ্ন দিয়ে ঠাকুর জীবনকৃষ্ণ আমার জীবন আনন্দে ভরিয়ে তুলেছেন। ব্যবহারিক জগতে কত সমস্যার সমাধান বলে দেন স্বপ্নে সে সব কথা ভাবলেও বিস্ময়ের সীমা থাকে না। দু' একটা উদাহরণ দিই।

আমি একবার স্বপ্নে দেখলাম এক আত্মীয়ের বাড়ীতে চশমাটা ফেলে চলে এসেছি। বাড়ী এসে মনে পড়ল। খুব চিন্তায় পড়ে গেলাম। স্বপ্ন ভাঙল। দাদা ব্যাখ্যা দিল, হয়ত আর চশমার প্রয়োজন হবে না। বাস্তবিক ঐ দিন থেকে আমাকে আর চশমা ব্যবহার করতে হয় নি। আমি কিছুদিন আগে ব্লকের উল বুনন শিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষিকা হিসাবে যোগদান করেছি। পৌষ মেলায় আমাদের সেন্টারের তৈরী উলের সামগ্রীও রাখা হবে প্রদর্শনীতে। আমাকে দু'একটা উলের চাদর বুনতে বলা হল। কিন্তু উলের চাদর বুনিনি আগে। খুব ভাবছি। রাত্রে স্বপ্নে দেখলাম স্বয়ং ঠাকুর জীবনকৃষ্ণ আমাকে কি রঙের উল নিতে হবে, কি ডিজাইন হবে, কিভাবে বুনতে হবে তা নিজে করে দেখিয়ে দিলেন। ঘুম থেকে উঠে মেসিনে বসে গেলাম। দুপুরে চাদরটা বোনা শেষ হতেই ব্লক থেকে পরিদর্শন করতে এল। চাদরটা দেখে সকলেই ভীষণ খুশি। মনে মনে ভাবলাম সত্যিই ঠাকুর তুমি পঙ্গুকেও গিরি লঙ্ঘন করাও।

তাঁর স্নেহদৃষ্টির কত উদাহরণ সৃষ্টি হয়েছে আমার জীবনে তার ইয়ত্তা নেই। কোন একদিন বাড়ীতে অনেক মিষ্টি আনা হয়েছিল। কিন্তু সকলকে বেশী করে খেতে দেওয়ায় সব মিষ্টি খরচ হয়ে গেল। আমার জন্য একটিও বাকী ছিল না। ননদ জিজ্ঞাসা করলে বললাম, 'খেয়েছি।' রাত্রে স্বপ্নে দেখছি শ্রীজীবনকৃষ্ণ একটা রেকাবীতে করে সন্দেশ নিয়ে এসে বললেন, 'কেউ দেখতে না পেলেও আমি দেখেছি যে তুই কোনও মিষ্টি খাস নি। তাই তোর জন্য আমি মিষ্টি নিয়ে এসেছি। নে খা'—বলে দুটি সন্দেশ মুখে জোর করে পুরে দিলেন। স্বপ্ন ভাঙল, আনন্দে দুচোখ জলে ভরে গেল।

একদিন হয়েছে কি, বাড়ীতে ঝগড়া করেছি—রাত্রে স্বপ্নে জীবনকৃষ্ণ শুধু তিরস্কারই করলেন না, সজোরে এক চড় মারলেন গালে। পরে কাছে টেনে নিয়ে আদর করতে লাগলেন, আমার ভুল ধরিয়ে দিলেন। বললেন, 'পুরোন কথা তুলে কখনও ঝগড়া করবি না, তাহলে অশান্তি থেকেই যাবে।' আবার স্নেহের অধিকারে আমিও বকেছি ঠাকুরকে। ওনাকে প্রায় সময়েই খালি গায়ে ধুতি পরা অবস্থায় দেখি। পৌষ মাসের কনকনে শীতের রাত্রে স্বপ্নে ওনাকে খালি গায়ে দেখে খুব বকলাম। বললাম, 'গায়ে অন্তত একটা চাদর দেবে নইলে রাগ করব।' আশ্চর্য এরপর থেকে সারা শীতকালে যখনই তিনি দেখা দিয়েছেন একখানা চাদর জড়ানো ছিল গায়ে।

সাইকেল চালানো শেখা প্রয়োজন হয়ে পড়ল। কিন্তু চালানো তো দূরের কথা আমি যে সাইকেল হাঁটিয়েও নিয়ে যেতে পারি না। সবাই বলত, তোমার পক্ষে সাইকেল শেখা অসম্ভব। না, মনের জোরে নয়, পরপর দুই রাত্রে স্বপ্নে শ্রীজীবনকৃষ্ণ আমাকে সাইকেল চড়া শিখিয়ে দিলেন। কি আশ্চর্য পরে মাত্র দু'দিনে খুব সহজেই সাইকেল চড়তে শিখে গেলাম। সকলের সঙ্গে আমি নিজেও কম অবাক হইনি।

ষান্মাষিক হিসাবের খাতা তৈরী করে শুয়েছি। স্বপ্নে জীবনকৃষ্ণ আমাকে দেখিয়ে দিলেন দু'জায়গায় হিসাবে ভুল হয়েছে। পরদিন ভুল শুধরে নিয়ে রিপোর্ট জমা দিলাম। এমনিভাবে বহুবার খুঁটিনাটি বহু বিষয়ে আমার ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন আবার যখন কোন বিষয়ে ভেবে পাইনি কি করা উচিত তখন স্বপ্নে তিনি বলে দিয়েছেন আমার কর্তব্য। এক নিকটাত্মীয়ের বিয়েতে কম দামে কি উপহার দেব ভাবছি তাও স্বপ্নে দেখিয়ে দিয়েছেন, এমনও ঘটেছে।

স্বপ্নে অনেকবার অসুখের জন্য ওষুধ জানিয়ে দিয়েছেন কখনও বা স্বপ্নেই ওষুধ খেয়ে সুস্থ হয়েছি। সেদিন নেমন্তন্ন বাড়ীতে খেয়ে রাত্রে খুব অস্বস্তি হচ্ছিল পেটে। স্বপ্নে জীবনকৃষ্ণকে বললাম, 'সোনা, আমার পেটে খুব কষ্ট হচ্ছে।' উনি খুব রেগে বললেন, 'এখানে ওখানে নেমন্তন্ন খেয়ে বেড়ালে কষ্ট তো হবেই। তোমাদের শরীর অন্যরকম যার তার বাড়ীতে খেলে সহ্য হবে না তা তো জান। এখনকার মত ওষুধ দিচ্ছি খাও।' এই বলে এক পুরিয়া হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খাইয়ে দিলেন। ঘুম ভাঙল। উঠে দেখি শরীর বেশ সুস্থ। আমার বড় ছেলের নাম বাদশা, বড্ড জেদী, খিটখিটে মেজাজের, ভীতু ও পড়াশোনা ঠিকমতো মনে রাখতে পারতো না। গার্জেনদের কড়া নজরদারির ফলে বেচারী মার খেয়ে মরত। বাড়ীর সকলেই ওকে নিয়ে বেশ দুশ্চিন্তায় পড়লাম। কিন্তু এটা যে ওর কোন রোগের লক্ষ্মণ তা টের পাইনি। হঠাৎ একদিন প্রতিবেশী একজন মহিলা (পাঠচক্রে আসেন) এসে দাদাকে বলল, 'ক্যাল্কেরিয়া কার্ব' বলে কোন ওষুধ আছে ?' দাদা বলল, 'হ্যাঁ। কিন্তু কেন ?' ও বলল, 'আমি স্বপ্নে দেখেছি–শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, বাদশাকে ক্যাল্কেরিয়া কার্ব খাওয়াতে বলবি। ওর অসুখ ভাল হয়ে যাবে।' সত্যিই ঐ ওষুধ খাওয়ানোর মাত্র সাতদিন পর থেকে ওর বিরাট পরিবর্তন এসেছে—এখন ও পুরোপুরি স্বাভাবিক।

শ্রীজীবনকৃষ্ণকে অন্তরে দর্শন করার পর আমার ছোট ছেলের জন্ম হয়। তার জন্মের নির্দিষ্ট তারিখও জেনেছিলাম স্বপ্নে। আশ্চর্যের বিষয় ডাক্তারের ধার্য করা দিনের এক মাস পরে স্বপ্ন নির্দিষ্ট দিনেই ওর জন্ম হয়েছিল।

বলার তো অনেক কিছুই আছে। আপাতত আর একটি ঘটনার উল্লেখ করেই শেষ করব। এক স্বপ্নে জীবনকৃষ্ণ আমাকে বললেন, 'প্রতিদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে

কিছুক্ষণ পাঠ করবি।' বললাম, 'কে শুনবে ?' বললেন, 'কেন বৈদ্যনাথ (আমার স্বামী)!' একই রাত্রে আমার স্বামী স্বপ্নে দেখল আমি পাঠ করছি আর ও শুনছে। পরস্পরের স্বপ্ন শুনে হতবাক হয়ে গেলাম। পাঠ শুরু হল কিন্তু ওর যেন তত আগ্রহ নেই। শুয়ে শুয়েই পাঠ শোনে। আমার খুব রাগ হত। পরে ও নিজে চার বার স্বপ্নে দেখল যে 'ধর্ম ও অনুভূতি' পাঠ করছে। শেষ স্বপ্নে দেখল, ও পাঠ শেষ করে বাইরে বেরোতে গেল কিন্তু বাইরে থেকে দরজা ছিল তালা বন্ধ। বাধ্য হয়ে ফিরে এসে আবার পাঠ করতে শুরু করল। সেইদিন থেকে বিছানা ছেড়ে উঠে প্রতিদিন ভোরে পাঠ করে। ওর পরিবর্তন আমাকে মুগ্ধ করেছে।

ভগবান জীবনকৃষ্ণ আমার দায়িত্ব নিয়েছেন। তাঁর দেওয়া সংসারে আনন্দের মধ্য দিয়ে ঠাকুর ঠাকুর করে যেভাবে দিন কাটছে এমনি করেই যেন জীবনের বাকী দিনগুলি কাটে–শ্রীজীবনকৃষ্ণের কাছে এই আশীর্বাদ প্রার্থনা করি।

বিশাখা চ্যাটার্জী (মণি)
জামবুনি, বোলপুর

আশ্রিতা

শ্রীজীবনকৃষ্ণ আমার কাছে মা, বাবা, ভাই, বোন, স্বামী, পুত্র ইত্যাদি সকল প্রিয়জন অপেক্ষাও প্রিয়। তিনি আমার পরম আশ্রয় চরম দুর্দিনের একমাত্র সাথী। আত্মিক লীলা প্রদর্শনে দিব্য আনন্দে ভরিয়ে তুলেছেন জীবন আবার নিষ্ঠুর সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে যখনই কেঁপে উঠেছে হৃদয় অমনি স্বপ্নে দেখা দিয়ে অভয় দান করেছেন, বলে দিয়েছেন কি করতে হবে।

স্বপ্ন নির্দেশ অনুসারে বাড়ী তৈরীর কাজে হাত দেওয়া হল। প্রতিবেশী একজনের দর্শনে শ্রীজীবনকৃষ্ণ জানালেন নতুন বাড়ীর প্ল্যান পছন্দ হয়েছে তাঁর। কাজ তো শুরু হল কিন্তু টাকা পয়সার খুব অভাব। স্বপ্নে জীবনকৃষ্ণ দেখা দিয়ে বললেন, 'চিন্তার কিছু নেই, টাকার ব্যবস্থা ঠিক হয়ে যাবে।' পরদিন আমার স্বামীর এক সহকর্মী এসে খবর দিল ডিপার্টমেন্ট থেকে ঋণ দেবার নতুন ব্যবস্থা চালু হয়েছে, সহজ শর্তে খুব কম সময়ের মধ্যে ঋণ পাওয়া যাবে। বাড়ী তো হল কিন্তু ছাদ থেকে জল পড়তে লাগল। দুশ্চিন্তার শেষ নেই। স্বপ্নে জীবনকৃষ্ণ দেখা দিয়ে বললেন, 'অত চিন্তা করছিস কেন ? আমি আছি না!' মনে জোর পেলাম। পরদিন মিস্ত্রী ভাই এসে বলল, 'আমি নিজের দায়িত্বে অল্প খরচে জল ছাদ করে দেব আপনারা ভাববেন না।' পাতলা করে সিমেন্ট ঢালাই করে দেওয়ায় জল পড়া একেবারে বন্ধ হয়ে গেল।

শুনলে অবাক হবেন বহুবার আমাদের স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া মিটিয়েছেন ঠাকুর জীবনকৃষ্ণ। দুজনকেই স্বপ্নে দেখা দিয়ে ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন। বকুনি দিয়েছেন। তাঁর এই শিক্ষা

যেন মনে রাখতে পারি। শুধু স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব নয়, সকলের সাথে সুসম্পর্ক যেন বজায় রাখতে পারি, আমার ত্রুটি যেন তিনি সংশোধন করে দেন – এই প্রার্থনা জানাই।

স্বপ্নে অনেক সময় ঠাকুর ওষুধ বলে দিয়ে ভোগান্তি কমিয়েছেন। শুধু নিজেদের নয় ঘনিষ্ঠ কারও কারও দূরারোগ্য অসুখের ওষুধ জানিয়ে দিয়েছেন স্বপ্নে, তাতে তাদের যেমন অশেষ কল্যাণ হয়েছে, তেমনি আমরাও নতুন করে উপলব্ধি করেছি কত বড় আশ্রয় আমরা লাভ করেছি।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও জীবনকৃষ্ণ উভয়েই শ্রাদ্ধ করতে ও শ্রাদ্ধান্ন খেতে নিষেধ করেছেন। সন্ধ্যাদির শাশুড়ী মারা গেলে নেমন্তন্ন করলেন আমাদের। মুখের উপর কিছু বলতে পারলাম না। পরদিন স্বপ্নে দেখলাম–শ্রাদ্ধ বাড়ীতে গেছি। সন্ধ্যাদি আমাদের কিছু খাবার জন্য খুব পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। আমরা বললাম আপনি তো জানেন আমরা শ্রাদ্ধে খাই না। উনি তবুও জোর করতে লাগলেন সামান্য কিছু মুখে দেওয়ার জন্য। তখন হঠাৎ সেখানে জীবনকৃষ্ণকে দেখলাম। উনি সন্ধ্যাদিকে বললেন, 'সন্ধ্যা, আমি তোর কাছে হাত জোড় করছি, শ্রাদ্ধান্ন খাইয়ে এদের পবিত্র আধারগুলো নষ্ট করে দিস না।' সন্ধ্যাদি তাড়াতাড়ি ঠাকুরকে প্রণাম করে ক্ষমা চাইলেন। স্বপ্নটা দিদিকে জানাতেই উনি নিজে থেকেই শ্রাদ্ধে যেতে নিষেধ করলেন।

কিছুদিন আগে আমার স্বামীর ঠাকুমা মারা গেলেন। আমরা শ্রাদ্ধ করিনি। অবশ্য জীবিত অবস্থায় এ বিষয়ে তাঁর কাছে অনুমতি চেয়ে রেখেছিলাম। আমার স্বামী স্বপ্নে দেখলেন, ঠাকুমা বলছেন, 'আমি তোর কাছে এলাম। তুই ঠাকুর জীবনকৃষ্ণের নাম কর, ওতেই আমার মুক্তি হবে। সবাইকে বলবি আমার ঠাকুমা স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছে অশৌচ পালন করতে হবে না। শুধু তোর জীবনকৃষ্ণকে ডাক তাহলেই আমি শান্তি পাব।' কয়েকদিন পর শ্রাদ্ধে লোক খাওয়ানোর জন্য বাড়ী থেকে আমাদের অংশের টাকা চেয়ে পাঠাল। কি করা উচিত ভেবে পাচ্ছি না। রাত্রে আমার স্বামী স্বপ্নে দেখলেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ বলছেন, 'শ্রাদ্ধের খরচ দেওয়া চলবে না। তাহলে তো শ্রাদ্ধ করাই হয়ে গেল। ঐদিন তুই পাঠ করবি।' আর আমি দেখলাম–ঠাকুমা, এসে বলছেন, 'মা তোর জীবনকৃষ্ণকে ডাক। তোদের ঠাকুর কৃপা না করলে যে মুক্তি হবে না। আমার জন্যে একবার তোদের ঠাকুরকে ডাক মা।' আমি জীবনকৃষ্ণকে এক মনে ডাকতে লাগলাম। তখন ঠাকুর দেখা দিলেন। ওনার হাতে একটি কমণ্ডলু ছিল। সেই কমণ্ডলুর জল ঠাকুমার গায়ে দিতেই উনি একজন সুন্দরী যুবতী নারী হয়ে গেলেন। উনি জীবনকৃষ্ণকে প্রণাম করলেন। ঘুম ভাঙল। মনে মনে ভাবছি এই ব্যবহারের বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবেই। কিন্তু দু'দিন পর পাড়ার এক গরীব মানুষের শ্রাদ্ধে খাওয়ানোর জন্য সাহায্য চাইতে এলে আমার স্বামী যখন তাদের বলল, 'শ্রাদ্ধে আমাদের কিছু দিতে নেই,' ওরা উল্টে

বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আপনাকে চাইলাম বলে আপনি যেন কিছু মনে করবেন না।' অবাক হলাম। বুঝলাম জগতকে মানানোর ভার তাঁর। আমার ও নিয়ে ভাববার কিছু নেই। বাস্তবিক অপ্রীতিকর কিছু ঘটে নি।

সম্প্রতি আমার ছেলে বিশ্বভারতীতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে কিনা এ নিয়ে খুব চিন্তা করছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম, স্বয়ং জীবনকৃষ্ণ বাবাইকে পড়াচ্ছেন। আমার প্রশ্নের উত্তরে বললেন, 'চিন্তা কোরো না, ও ঠিক চান্স পেয়ে যাবে।' বাস্তবে তাই ঘটল।

ঠাকুর চান না আমরা কারও দান গ্রহণ করি। সেদিন বাড়ীতে একটা দরজা বসানোর সময় একটি অতিরিক্ত ক্লাম্পের প্রয়োজন হল। প্রতিবেশী বিশুদা তা দিলেন। ওনার কাছে বাড়তি ছিল। দাম নিলেন না কিছুতেই। রাত্রে আমার স্বামী স্বপ্নে দেখলেন--জীবনকৃষ্ণ বলছেন কাল ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই বিশুকে ক্লাম্পের পয়সা দিয়ে আসবি। উনি বললেন, 'আমি তো ক্লাম্পের দাম জানি না।' জীবনকৃষ্ণ বললেন, 'ওর দাম তিন টাকা। আমার আদেশ মনে থাকে যেন।' তাঁর আদেশ শিরোধার্য করে সংসার সুখের হয়ে উঠেছে। প্রতিটি বিষয়েই ঠাকুরের সজাগ দৃষ্টি। তাঁকে পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি। আমার জন্ম সার্থক হয়েছে।

সবিতা ঘোষ
চারুপল্লী, বীরভূম

পরম ধন

জামবুনিতে শ্রীধরবাবুর বাড়ীতে চালা ছাওয়ানোর কাজে গিয়ে হঠাৎ করে কুড়িয়ে পেলাম জীবনের পরম সম্পদ। ওনাদের বাড়ীতে স্বপ্নালোচনা হত। শুনে বেশ মজা লাগল। আমিও স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম। স্নেহময় কাকু ব্যাখ্যা দিলেন। মনে দাগ কাটল। কয়েকদিন পর ঠাকুর জীবনকৃষ্ণ দেখা দিলেন স্বপ্নে। আমাকে সঠিক পথে চালানোর দায়িত্ব নিলেন তিনি।

আমি সুকুমারদার কাছে একটি লাল রঙের জামা কিনেছিলাম যেটা সুকুমারদা তৈরী করিয়েও পরে নি। কয়েকদিন পর স্বপ্নে দেখছি–পাঁচ ছয় জন মানুষসহ জীবনকৃষ্ণ লাঠি হাতে আমার বাড়ীর সামনে এসে আমার নাম ধরে ডাকলেন। আমি বাড়ী থেকে বের হয়ে এলাম, তখন জীবনকৃষ্ণ বললেন, 'তুই লাল জামা পরেছিস কেন ? কখনও ঐ রকম উজ্জ্বল রঙের পোষাক পরবি না।' এবার ওনার কাছে কিছু হাল্কা রঙের ছিট ছিল, তা দেখিয়ে তিনি বললেন, 'এই দ্যাখ, এই রকম হাল্কা রঙের জামা কাপড় পড়বি। সুকুমার ঐ জন্য ঐ জামাটা পরে নি, তুইও কখনও এমনটি করিস না।' ঘুম ভাঙল।

আরও একটি এই রকম অদ্ভুত স্বপ্নের কথা বলি। কিছুদিন ধরে মজুরী খাটতে না

গিয়ে ছাগল কেনাবেচার পাইকারী করে ভালই রোজগার হচ্ছিল। এতে অবশ্য অনেক মিথ্যা কথা বলার দরকার হয়। একদিন স্বপ্নে দেখছি–আমি একটি পুকুরে স্নান করব বলে দাঁড়িয়ে আছি। আমাকে কে যেন তাড়া করল। আমি কোথাও কিছু দেখতে না পেয়ে পাশেই আখ ক্ষেতের দিকে ছুটলাম। আখ ক্ষেতের মধ্যে ঢুকে পড়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। হঠাৎ শ্রীজীবনকৃষ্ণের গম্ভীর কন্ঠস্বর শুনে চমকে উঠলাম। ওনাকে দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু স্পষ্ট শুনলাম উনি যেন বললেন, 'পরকে ঠকিয়ে পয়সা রোজগার করার চেষ্টা করিস না, ঐ পয়সা থাকে না।' ভয়ে আমার বুক কাঁপতে লাগল। ঘুম ভেঙে গেল।

সুকুমারদার বোন ববির জন্য পাত্র দেখতে গেছি। পাত্রের বাড়ীতেই খেয়ে দেয়ে সুকুমারদার পাশে শুয়ে পড়লাম। স্বপ্নে দেখলাম– শ্রীধরদার বাড়ীতে শুয়ে আছি। পাত্র নিজে রথের চাকা আঁকা একটি কাগজের উপর কিছু লিখে সুকুমারদার গায়ে দিল। এরপর ঘরে থেকে বেরিয়ে উঠোনে নামলাম। সেখানে দেখলাম সুকুমারদার মা, জীবনকৃষ্ণ ও পাঠচক্রের অনেকে রয়েছেন। তক্ষুনি যেন পাঠ শেষ হয়েছে। তারপর পাত্র সম্পর্কে কথা উঠল। জীবনকৃষ্ণ বললেন, 'পাত্র ভাল। আর এখানে বিয়ে হলে ভালই হবে।'

(শ্রীধরদার বাড়ী–জীবনকৃষ্ণ-চর্চার স্থান। জীবনকৃষ্ণ-চর্চায় যুক্ত থাকলে স্পষ্ট দৈব নির্দেশ লাভ করা যায়। মঙ্গলময় শ্রীজীবনকৃষ্ণ দর্শন দিয়ে জানিয়ে দেন কিসে আমাদের ভাল হবে।)

একবার একটা আসরে কেষ্ট যাত্রা করতে যাচ্ছি। অন্য এক জনের সাইকেলের পিছনে বসে যাচ্ছি। যেতে যেতে হঠাৎ চোখ বুজে গেল। দর্শন হল–শ্রীজীবনকৃষ্ণ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাচ্ছিস ? বললাম গান করতে যাচ্ছি। ওনাকে প্রণাম করলাম। উনি আশীর্বাদ করলেন। বললেন, 'তোর গান ভাল হবে যা।' সত্যিই সেদিন আসরে গান বেশ জমেছিল। অনেক গুণী মানুষ উপস্থিত ছিলেন, তাদের প্রশংসা কুড়িয়ে ছিলাম।

একদিন স্বপ্নে দেখলাম, নদীর ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। বিরাট বড় মাপের একটি নৌকা এল। নৌকার মাঝি স্বয়ং জীবনকৃষ্ণ। আমি সেই নৌকায় উঠে ওপারে গেলাম। ঘুম ভাঙল। ভবনদী পারাপারের মাঝির নিরাপদ আশ্রয় লাভ করেছি। মনে খুব জোর পেয়েছি। জীবনকৃষ্ণকে নিয়ে বহুবার স্বপ্ন দেখেছি। কটা স্বপ্নই বা বলব। একদিন দেখছি–পাঁকে ডুবে যাচ্ছি। হঠাৎ কার যেন কন্ঠস্বর শুনতে পেলাম, 'ভয় নেই।' অমনি পাঁক শক্ত হয়ে গেল। উঠে গিয়ে সামনের পথ ধরে হাঁটতে লাগলাম। দেখি পথে আলো এসে পড়েছে কোথা থেকে। আলো ধরে এগিয়ে গেলাম। কিছুদূর এগিয়ে দেখি আলো আসছে জীবনকৃষ্ণের হাত থেকে। উনি দাঁড়িয়ে আছেন, হাতটি অভয়দানের ভঙ্গীতে

তুলে আছেন। ...ঘুম ভাঙল।

গ্রামের একজন শিক্ষিত ছেলে আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিল জীবনকৃষ্ণকে স্বপ্নে দেখে তুমি কি বুঝেছ ? আর পাঠচক্র সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি ? আমি বলেছিলাম, মানুষ আনন্দ ফূর্তি করতে চাইলে যাক মন্দিরে, পুজো করুক ঘটা করে। কিন্তু কেউ যদি ভগবানকে পেতে চায় তাকে যেতে হবে পাঠচক্রে। শুনতে হবে রামকৃষ্ণ ও জীবনকৃষ্ণের কথা, অন্তরে পেতে হবে তাঁদের দর্শন।

সত্যবান লোহার
রূপপুর, বীরভূম

শান্তিদাতা

বছর সাতেক আগে চারুপল্লীতে বাড়ী করে বসবাস শুরু করলাম। স্নেহময় কাকার কাছে জীবনকৃষ্ণের কথা শুনে মনে মনে হাসতাম। কিন্তু কয়েকদিন পর আমার স্ত্রী বলল ও নাকি স্বপ্নে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীজীবনকৃষ্ণকে দেখেছে। একটু অবাক হলাম। আবার ভাবলাম মেয়েছেলের নরম মন বলে জীবনকৃষ্ণের কথা শুনেই তাঁকে স্বপ্নে দেখেছে। কিন্তু আর কিছুদিন পর যখন আমি নিজেই ওনাকে স্বপ্নে দেখলাম তখন বেশ অবাক হলাম! আমার ইঁদারাটা তখনও বাঁধানো হয় নি। আগের দিন রাত্রে বৃষ্টি হওয়ায় ইঁদারা বসে গেল। খুব চিন্তায় পড়লাম। রাত্রে স্বপ্নে দেখলাম শ্রীজীবনকৃষ্ণ এসেছেন আমাদের বাড়ীতে। গল্প করতে করতে একসময় উঠে গিয়ে ইঁদারাটা দেখে এসে বললেন, 'কোন ভয় নেই, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।' তারপর স্নেহময় কাকাদের বাড়ীতে গেলেন। আমিও ওখানে গিয়ে ওনার মুখ থেকে অনেক উপদেশ শোনার সুযোগ পেলাম। একটা কথা বেশ মনে আছে। বললেন, 'সংসারে থেকেই সব কিছু হবে।' সত্যি সত্যিই কয়েকদিনের মধ্যে অভাবিত উপায়ে টাকার যোগাড় হল, ইঁদারা বাঁধানো হল। আর মনে ভীষণ জোর পেলাম। সেই শুরু। পরেও বহু বিপদে তিনি দেখা দিয়ে সাহস যুগিয়েছেন, সান্ত্বনা দিয়েছেন, উপায় বলে দিয়েছেন।

বছর চারেক আগে (১৯৮৯) এক লক্ষ্মীপূজোর দিন স্নেহময় কাকা খুব অসুস্থ হয়ে পড়লে হাসপাতালে ভর্তি করতে হল। রাত্রে স্বপ্নে দেখছি– কদমতলায় জীবনকৃষ্ণের ঘরে গেছি। উনি বললেন, 'আয় আয়, কী খবর ?' বললাম, 'কাকা খুবই অসুস্থ। হাসপাতালে আছে।' উনি বললেন, 'এতে ঘাবড়াবার কী আছে ? মানুষের অসুখ-বিসুখ তো হবেই। আবার ভাল হয়ে উঠবে। কেন, আমার জীবনটা ভেবে দ্যাখ, আমাকে হাসপাতালে যেতে হয় নি ? দুশ্চিন্তার কিছু নেই।' এরপর অন্য প্রসঙ্গে নানা কথা বললেন। সত্যিই তাঁর আদর্শ জীবন পর্যালোচনা করে খুঁজে পাই আমার বহু সমস্যার সমাধান।

তিনি আবার শক্ত হাতে শাসনও করেন। একবার দেখছি (২৯-০১-১৯৮৮)- একটি হনুমান সর্বদা আমার কাছে রয়েছে। বললাম, 'তুই আমার কাছে রয়েছিস কেন ? উত্তরে বলল, 'ঠাকুর জীবনকৃষ্ণ আমাকে পাঠিয়েছেন, তোমার উপর নজর রাখার জন্য, যাতে তোমার কোন অনিষ্ট না হয়।' হনুমানটি আমাকে খুব ভালবাসতে লাগল। একদিন বইয়ের দোকানে গেছি কিছু বই কিনতে। লাইব্রেরীয়ান বলে দোকানদার দু'একটা বই বিনা পয়সায় দিতে রাজী হল। সেই বইগুলি যেই নিতে গেছি অমনি হনুমানটি আমার হাত চেপে ধরল, বলল, ''ছি! ওভাবে অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করবে না! তোমাকে পুরোপুরি সৎ হতে হবে।''

বাস্তবিক রক্ষা কবচ লাভ হয়েছে আমার। একদিন দেখছি (১৯৯০)- জীবনকৃষ্ণ আমাদের বাড়ীতে বসে রয়েছেন। একটি পুরাতন তালপাতার পুঁথি থেকে কিছু অংশ ছিঁড়ে তাতে আগের লেখাগুলি কেটে নতুন কিছু লিখে দিয়ে মাদুলীর ভিতর ভরে অনেক মানুষকে দিচ্ছেন। এই রকম একটি মাদুলী একটি সাপের মাথায় রাখলেন। সাপটি শান্ত হয়ে মাথা নীচু করে বসে রইল। সকলে এই দৃশ্য দেখে মাদুলীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হল।

(মাদুলী-রক্ষাকবচ, অমঙ্গল থেকে অকল্যাণ থেকে যা মানুষকে রক্ষা করে। সেটি কি ? না শ্রীজীবনকৃষ্ণের অমৃতবাণী যা ধর্ম সম্বন্ধে পুরোন ধারণা দূর করে নতুন কথা শোনায় এবং সাপ অর্থাৎ দেহস্থ প্রাণশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে, অন্তর্মুখী করে।)

জীবনকৃষ্ণকে পেয়ে আমি লাভ করেছি যথার্থ অভিভাবক আর তার মঙ্গল করস্পর্শে অভাবের সংসারে থেকেও পেয়েছি গভীর শান্তি। তাই গত বছর (১৯৯২) এক স্বপ্নে দেখেছিলাম- সিয়ানে মিহিরদার বাড়ী গেছি। সেখানে শান্তিদা ছিল। আমাকে দেখে স্নেহভরে বললেন, 'আসুন, আসুন মিষ্টি খান।' এই বলে জোর করে পেট ভরে মিষ্টি খাওয়ালেন। স্বপ্নেই বোধ হল শান্তিদা মানে, ভগবান শান্তিদাতা রূপে অবতীর্ণ। তিনি আমাকে শান্তি দিচ্ছেন।

শ্রীধর ঘোষ
চারুপল্লী, বোলপুর

পরিবর্তন

আমি গত ৯-১০-১৯৯০ তারিখে সন্ধ্যাবেলায় জীবনকৃষ্ণকে প্রথম স্বপ্নে দেখেছিলাম। তারপর থেকে প্রায়ই নানা স্বপ্নে ওনাকে দেখতে পাই। আমি জীবনকৃষ্ণকে সবার চেয়ে বেশী ভালবাসি। প্রথম স্বপ্নটা হ'ল–আমি স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্ন দেখছি। ঘুম থেকে উঠলাম। বিছানায় আর কেউ নেই। পাশে লেপটা একটু উঁচু হয়ে রয়েছে। লেপটা আপনা থেকে সরে গেলে দেখলাম সেখানে আমার মত একটি ছেলে মাথায় মুকুট পরে শুয়ে রয়েছে।

তার গায়ে হাত দিতেই ওর দেহের সেই জায়গায় সোনার গহনা হয়ে গেল। গোটা গায়ে হাত বুলিয়ে দিলাম। অমনি ওর সারা গা সোনার গয়নায় ভরে গেল। তারপর ছেলেটি উঠে বসল। মনে হল ছেলেটি ভগবান। আমাকে বলল, 'কি চাও ?' আমি বললাম, 'আমি তোমাকে মামা বলব।' ও বলল, 'বেশ, তাই হবে। এখন কী চাস বল ?' আমি বললাম, 'আগে মুখ হাত ধুয়ে খাই চল। পরে ভাবা যাবে' তারপর মাকে ডাকলাম। বললাম, 'এই তোমার দাদা, প্রণাম কর।' মা তখন ভগবানকে প্রণাম করল। এরপর মুখ ধুতে গেলাম। কে যেন মাজনটা ঢেলে দিল। আপনা থেকে দাঁত মাজা হয়ে গেল। তারপর খেতে গিয়ে আপনা থেকেই পেট ভরে গেল। খেতে হল না। ভগবান আবার বলল, 'কি নিবি ?' আমি না চাইতেই আমার মনের কথা বুঝতে পেরে এক সেট পুলিশের ড্রেস আর একটি বন্দুক দিল। ঐ পোষাক পরে বন্দুক নিয়ে খেলতে গেলাম। বাবাই বন্দুকটা কেড়ে নিল। বন্ধুরা সকলে আমার পিছনে লাগল। ওদের সঙ্গে মারপিটে পারছি না। তখন ভগবান মামাকে বললাম, 'মামা শক্তি দাও।' পরে হাতের তালু থেকে একটি চক্র বেরিয়ে বুড়ো আঙুলের পাশের আঙুলে (তর্জনীতে) ঢুকল। ঘুরতে লাগল। আবার আঙুল থেকে বেরিয়ে তালুতেই মিশে গেল। এবার ঐ তালু থেকে সাদা ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা আলো বেরিয়ে আমার গায়ে পড়ল। আমি বললাম, 'মামা, শীত করছে। একটু গরম করে দাও।' এবার গরম আলো গায়ে ঠেকল। তখন আবার বেশী গরম করতে লাগল। মামাকে বলায় একটু ঠাণ্ডা একটু গরম আলো দিয়ে শক্তি দিলেন। গায়ে বেশ শক্তি হয়ে গেল। বন্ধুদের ধরে শূন্যে বাঁই বাঁই করে ঘুরিয়ে ছুঁড়ে দিলাম। বাড়ীতে এলে মামা আবার এক সেট পুলিশের পোষাক ও একটি বন্দুক দিল। খুব আনন্দ হল। এরপর খেয়ে দেয়ে ভগবানের সঙ্গে শুলাম। ভগবান নাক ডাকছে। মনে হচ্ছে ওর পাশে আর কেউ যেন রয়েছে সে নাক ডেকে দিচ্ছে। কিন্তু তাকে দেখতে পাচ্ছি না। আমারও নাক ডাকতে লাগল। আমার নাকও কে যেন ডেকে দিচ্ছে। এরপর ভগবান একটি সরু রডের উপর দাঁড়াল। আমিও তাই করলাম। ভগবান প্রথমে কালী হল, তারপর দশভুজা দুর্গা, তারপর নাড়ুগোপাল হয়ে নাড়ু খেতে লাগল, আড় চোখে মা যশোদার দিকে তাকিয়ে থাকল, শেষে জীবনকৃষ্ণ হয়ে ধ্যান করতে লাগল। আমিও ঠিক ভগবানের মতই কালী, দুর্গা ও নাড়ুগোপাল হলাম। শেষে আমিও বড় জীবনকৃষ্ণ হয়ে ধ্যান করতে লাগলাম। এরপর পাল্কী এল। তাতে চেপে ভগবান আকাশে চলে গেল। আর আমি তখন বিছানার চাদরে মিশে গেলাম। আমার শরীর বলে কিছু থাকল না। মামারা ডাকছে খাবার জন্য কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না। মেজমামা (প্রেমময়) এক সময় বিছানার চাদরটা ঝেড়ে দিল। অমনি আমি চাদর থেকে টুপ করে বেরিয়ে পড়লাম। মামা বলল, 'এই তো জয়'।

(মামা–চাঁদামামা, Universal self। তোমাকে মামা বলব - তুমি মামা হও, সর্বজনের হৃদয়ে পরিস্ফুট হও। বৈদিক ঋষিদের প্রার্থনা–'ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ'। পুলিশের ড্রেস–ব্যষ্টিতে আত্মিক নিয়ন্ত্রণ আরোপের উপযোগী দেহ। কেড়ে নিল–ব্যষ্টির সাধন পরিবেশের প্রভাবে বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আবার এক সেট পুলিশের পোষাক - সমষ্টির সাধনে অন্যের উপর আত্মিক নিয়ন্ত্রণে সক্ষম দেহ। কালী...জীবনকৃষ্ণ হল – আদ্যাশক্তি ব্রহ্মে পরিবর্তিত হ'ল। এই পরিবর্তন দ্রষ্টার শরীরে বর্তাল। তাই দ্রষ্টা চাদরে মিশে গেল অর্থাৎ জগৎব্যাপীত্ব লাভ করল (পূর্ণ অহংশূন্য হয়ে)। প্রেমময় বলল, এই তো জয়–যারা আন্তরিক ঈশ্বরকে ভালোবাসেন তাদের অন্তরে দ্রষ্টার রূপ ফুটে উঠে তার ভিতরের এই পরিবর্তনের প্রমাণ দাখিল করবে।)

গত ৯-৭-৯২-এ স্বপ্নে দেখছি–ঘন জঙ্গলের মধ্যে একটি গাছে চেপে বসে আছি। একটা গর্ত থেকে বিরাট একটা সাপ, প্রায় একশ হাত, বেরিয়ে এল। ভয় পেয়ে গেলাম। সাপটির মাথায় বিরাট একটা মণি জ্বলজ্বল করছে। সাপটি গাছে উঠতে লাগল। আমিও ভয়ে ভয়ে আরও কিছুটা উপরে উঠলাম। এক সময় বুকের কাছে হাত দুটি জোর করে মেলে ধরলাম। সাপটি আমার হাতে মণিটি ফেলে দিয়ে নেমে গেল। ভীষণ আনন্দ হল। মণিটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলাম। হঠাৎ দেখি মণিটিতে ফাটা ফাটা দাগ। ওটি পুরো ফাটিয়ে দিতেই ভিতরের ছোট্ট জীবনকৃষ্ণ বেরিয়ে পড়ল। তার গা থেকে মণির আলোর চেয়েও অনেকগুণ বেশী আলো বেরোচ্ছে। আবার ঐ সাপটি এল। জীবনকৃষ্ণ ঐ সাপটির মধ্যে মিশে গেল। তারপর সাপটি জীবনকৃষ্ণ হয়ে গেল। বললেন, আমি গাছের মধ্যে, সাপের মধ্যে, তোর বুকে সব জায়গায় আছি। আমি গাছ থেকে নেমে ওনার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে মাথা তুলতেই দেখি জীবনকৃষ্ণ নেই, সেখানে একটি সাপ। মনে হল আমি যেন সাপটিরই দু'চোখ ছুঁয়ে প্রণাম করেছি। ঘুম ভাঙল।

(সাপের মাথায় মণি–এ সেই সাত রাজার ধন এক মাণিক। সহস্রারে দেহস্থ প্রাণশক্তির সংকলিত রূপ, আত্মা। মণির ভিতর উজ্জ্বলতর জীবনকৃষ্ণ-পরমাত্মা, পরমব্রহ্ম। চোখে প্রণাম–'তিনি সর্বভূতে আছেন—' এই দৃষ্টিভঙ্গীর বন্দনা তথা তা কামনা করছেন দ্রষ্টা।)

খালি চোখেও অনেকবার জীবনকৃষ্ণকে দেখতে পেয়েছি। একবার খেলতে খেলতে মাধাইকে জড়িয়ে ধরেছি। হঠাৎ দেখি আরে আমি যে জীবনকৃষ্ণকে জড়িয়ে ধরেছি। তখন আরও জোরে টিপে ধরলাম। মাধাই 'ছাড়, ছাড়' বলে চিৎকার করতে লাগল। কিছুক্ষণ পর দেখি আমি মাধাইকে ধরে দাঁড়িয়ে আছি। এই দর্শনের পর শরীরটা কেমন যেন হয়ে গেল। আর খেলায় মন বসল না।

১৭/১১/১৯৯২ তারিখে স্বপ্নে দেখলাম খুব তেষ্টা পেয়েছে। হাঁটতে হাঁটতে এক

জায়গায় একটা ঝর্ণা দেখতে পেলাম। ঝর্ণার জল খেয়ে দেখি মিষ্টি লাগছে। বুঝলাম ওটা জল নয়, মধু। তখন চোঁ চোঁ করে ঐ মধু খেতে লাগলাম। হঠাৎ মাথার চুল ধরে পিছন থেকে কে যেন টান মারল। বলল, 'তুই একাই সব খেয়ে নিলে আমি খাব কি ?' পিছন ফিরে দেখি– জীবনকৃষ্ণ। বিশাল চেহারা ওনার। আমি তাড়াতাড়ি ওনার পা দুটি জড়িয়ে ধরলাম। পাগুলো খুব মোটা কিন্তু টিপে ধরতেই বুঝলাম স্পঞ্জের মত নরম। ঘুম ভাঙল।

(দ্রষ্টার ভগবৎ প্রেমতৃষ্ণা প্রবল। তিনি মধু বা অমৃতের পিয়াসী। শ্রীভগবানের বিশেষ কৃপালাভে মধু ছেড়ে মাধবকে সার বলে বোধ হয়েছে, আঁকড়ে ধরেছেন।)

এর ক'দিন পর (৩০/১২/১৯৯২) দেখলাম–বাবাই, দাদা, জগাই, মাধাই, লক্ষ্মীদি আর আমি স্কুল থেকে ফিরছি। পথে পড়ল একটি খাল। বাবাই পাশের একটা বাড়ী দেখিয়ে বলল, ওটা অন্তরা চৌধুরীর বাড়ী। আমরা অমনি আপনা থেকেই ঐ বাড়ীর মধ্যে পৌঁছে গেলাম। অন্তরা চৌধুরীর মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি অন্তরার মা ?' উনি বললেন, 'হ্যাঁ'। আমরা বললাম, 'ওকে বলবেন না যে আমরা এসেছি।' আমরা লুকিয়ে রইলাম। অন্তরা চৌধুরী কাছাকাছি এলে দেখলাম ও জীবনকৃষ্ণ। তখন দেখি অন্তরার বোন জীবনকৃষ্ণের ভাই মাণিকবাবু হয়ে গেল। ওর মা জীবনকৃষ্ণের মা আর বাবা জীবনকৃষ্ণের বাবা হয়ে গেল। অবাক হয়ে ওদের দেখতে লাগলাম। ঘুম ভাঙল।
[দ্রষ্টার অন্তরজগৎ (অন্তরা) জীবনকৃষ্ণময় হয়েছে। অন্তর্জগতে এই পরিবর্তনের সাথে সাথে আত্মিক যোগসূত্রে আবদ্ধ সকলেই (ভগবৎপ্রেমী যারা) এক পরিবারভুক্ত (জীবনকৃষ্ণের পরিবার)—এই দৃষ্টিভঙ্গী লাভ হল।]

জয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
দ্বিতীয় শ্রেণী

তুমি দেখাও যবে

শ্রীজীবনকৃষ্ণের কথা শোনার পর মনে হল কতকাল ধরে এঁনাকেই চেয়েছি। শ্রীরামকৃষ্ণকে আমি ভীষণ শ্রদ্ধা করি। জীবনকৃষ্ণের দেওয়া কথামৃতের দেহতত্ত্বে ব্যাখ্যা শুনে প্রাণ জুড়িয়ে গেল। মন আকূল হয়ে উঠল ওনার দেখা পাবার জন্য। কৃপাময়ের কৃপা হল। নানা স্বপ্নে তিনি দেখা দিতে লাগলেন। একদিন দেখছি–ঠাকুর পুকুরের পাড়ে প্রচুর সাদা হাতি রয়েছে। পুকুরে অনেক পদ্মফুল ফুটে রয়েছে দেখে খুব আনন্দ হচ্ছে। হঠাৎ একজনের ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। পরদিন ঐ স্বপ্নটিই দেখতে পেলাম। দেখলাম সাদা হাতীগুলো শুঁড়ে করে পুকুর থেকে ফুল তুলে আমার আঁচলে দিল। তারপর সকলেই শূন্যে উঠে গিয়ে আকাশে মেঘ হয়ে গেল। এরপর আমি ফুলগুলো নিয়ে শ্যামসুন্দরের মন্দিরে গেলাম। মন্দিরে ঢুকে দেখি ঠাকুরের সিংহাসনে রামকৃষ্ণ ও

জীবনকৃষ্ণ বসে রয়েছেন। নীচে দাঁড়িয়ে আছেন শ্রীকৃষ্ণ। আমার বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতেই দেখি আঁচলের ফুলগুলো আপনা থেকে ওনাদের পায়ে গিয়ে পড়ল।

(মন শুদ্ধ হলে (সাদা হাতী) দেহেতে সুন্দরতমের প্রকাশ ঘটে যে সব দর্শনে (পদ্ম), তার স্মরণ-মনন হতে থাকে—এই হল প্রকৃত পূজা-এতে মানবব্রহ্মের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি হয়।)

একবার সাংসারিক অশান্তি এড়াতে শাশুড়ীকে একটা বিষয়ে মিথ্যা কথা বলেছিলাম। শাশুড়ী তো বুঝলেন কিন্তু চটলেন আমার প্রাণের ঠাকুর। রাত্রে স্বপ্নে দেখছি—গোবিন্দ জামাইবাবু ছড়ি নিয়ে আমাকে শাসাতে লাগলেন। বললেন, 'তোমাকে এতদিন কী শেখালাম। তুমি জীবনকৃষ্ণ জীবনকৃষ্ণ করছ অথচ মিথ্যা কথা বলছ! জীবনকৃষ্ণকে যদি চাও তাহলে মিথ্যা কথা বলা একেবারেই চলবে না—এই কথাটা মনে থাকে যেন।'

জীবনকৃষ্ণকে পেয়ে শত দারিদ্রের মধ্যেও আমি পেয়েছি অপার শান্তির স্পর্শ। আমার জীবন ধন্য হয়ে গেছে। আর একটি বিষয় আমাকে খুব আনন্দ দেয় তা হল তাঁর কৃপায় এ যুগেও কিছু কিছু দৈবী মানুষ জন্মেছেন—একথা জেনে। যেসব স্বপ্নে এ সত্য জেনেছি তার একটি উল্লেখ করছি। দেখছি—মালা গাঁথছি। হঠাৎ জয় এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কি করছ তুমি ?' বললাম, 'ঠাকুরের জন্য মালা গাঁথছি।' ও অমনি গলাটা বাড়িয়ে দিল। আমিও মালাটা ওর গলায় পরিয়ে দিলাম। পরক্ষণে মনে হল এ আমি কী করলাম! ঠাকুরের জন্য গাঁথা মালা জয়কে পরিয়ে দিলাম! জয় বলল, 'তুমি ঠাকুর দেখবে ? তবে এসো আমার সঙ্গে।' একটা উঁচু জায়গায় নিয়ে গেল। তারপর পূর্বদিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'ঐ দ্যাখ ঠাকুর।' চেয়ে দেখি পূর্বদিক লাল হয়ে সূর্য উঠছে আর সেই উদীয়মান সূর্যের মাঝে ধ্যানস্থ অবস্থায় বসে আছে জয়।...

মিনতী ব্যানার্জী
সুলতানপুর, বীরভূম

অমৃত বাণী

১) মানুষের ভেতরে রয়েছে ভগবান আর মানুষ সেকথা ভুলে ঘুরে বেড়াচ্ছে চারিদিকে- –পুরী, রামেশ্বর, কেদার, বদরিকা! কোথা ভগবান! কোথা ভগবান!
ভগবান নদীতীরে নেই. হিমালয়ের চূড়ায় নেই, কন্যাকুমারিকায় নেই, আছে তোর ভেতরে। তাই কাতর হয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয় – হে ভগবান তুমি ভেতরে রয়েছো, দয়া করে দেখা দাও।

২) এ যুগে স্বপ্ন সিদ্ধ। সারাদিন কাজ করলি, তারপর খেয়ে দেয়ে দিব্বি শুলি। তিনি তো ভেতরেই আছেন, স্বপ্নে তোকে দেখা দিয়ে শিক্ষা দেবেন, সাধন করাবেন।

৩) ঋষি বললেন, 'অহং ব্রহ্মাস্মি'। ঋষি বললেন বটে 'আমি ব্রহ্ম', কিন্তু তিনি প্রমাণ রেখে যেতে পারেন নি বলেই ব্রহ্মসূত্রের প্রথম কথাই হ'ল 'অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা'- অনন্তর ব্রহ্ম যে কী তা জিজ্ঞাস্য-ই রইল। ...ভগবান হওয়ার প্রমাণ কি ? ভগবান থাকেন কোথায় ? বেদের কোন কথা ? সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। মানুষের দেহেতে তিনি। তাই যদি কেউ ভগবান হন অপর মানুষের দেহে তাঁর রূপ ফুটে উঠবে। জাগ্রতে, স্বপ্নে, ধ্যানে ও ট্রান্সে সকল অবস্থাতেই তাঁর রূপ ফুটে উঠে সকলকে জানিয়ে দেবেন। হ্যাঁ, বাবা, মানুষই ভগবানে পরিবর্তিত হয় আর তার প্রমাণও দেয় মানুষ তথা জগৎ। ভগবান বলে আর কোনখানে কিছু নেই। সে এই জ্যান্ত মানুষ।

৪) বিষয় কি বাবা ? বিষয় হ'ল তোমার দেহ। এই দেহ কার বিষয় ? না, আত্মার। কি রকম ? না, এই দেহ ছাড়া আত্মার স্ফূরণ হয় না। এই দেহ কি অদ্ভুত জান বাবা! এই দেহের লিঙ্গ গুহ্য নাভিতে যতক্ষণ মন থাকে দেহী ততক্ষণ জন্তু- পশু। আর মন যখন সহস্রারে উঠে যায় তখনই ঈশ্বর।

—শ্রীজীবনকৃষ্ণ

নব পরিচয়

স্বপ্নের সূত্র ধরে যোগাঙ্গের লেন্স মেলে ধরে কিছু কিছু পুরাণ কথার যে সব নতুন পরিচয় আমরা অবহিত হয়ে যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হয়েছি তারই দু'একটি উল্লেখ করা হল এই অধ্যায়ে।

ওঙ্কার

স্বপ্নে দেখছি—আমি আর উমাদি বসে আছি। পাশে একটি কূয়ো। তার মধ্যে দেখলাম এক বৃদ্ধ, মাথা ন্যাড়া, হলুদ কাপড় পরে, মাথার উপর এক হাতে ডুগডুগি বাজাতে বাজাতে সাপের মত এঁকে বেঁকে উপর দিকে উঠে আসছেন। তখন কে যেন বলল, 'ইনি ওঙ্কারনাথ' অথচ উনি দেখতে জীবনকৃষ্ণের মত।

বৈশাখী মণ্ডল
চারুপল্লী

ব্যাখ্যা ঃ ১) কূয়ো–দেহ। সাপের মত এঁকেবেঁকে আসছে–জাগ্রতা কুণ্ডলিনী। ডুগডুগি বাজাচ্ছেন–নাদভেদ করাচ্ছেন। ওঁ–বাক্ ও প্রাণ যাহাতে সম্মিলিত হয় (ছান্দোগ্য উপনিষদ ১।১।৬)। অন্তর্মুখী প্রাণশক্তি (কুণ্ডলিনী) সুরে জেগে ওঠেন–ইহাই নাদ্‌ভেদ। ইহাই সকল আত্মিক দর্শন-অনুভূতির মূল। তাই সব মন্ত্রের আগে ওঁ উদ্গান করার নিয়ম আছে। অতএব ওঁ–নাদ্‌ব্রহ্ম। ওঙ্কারনাথ–মানুষের কুণ্ডলিনী জাগরণ ও নানাবিধ আত্মিক দর্শন-অনুভূতি লাভের কারণ স্বরূপ, পরম ব্রহ্ম। দেখতে ঠিক জীবনকৃষ্ণের মত–এই পরম ব্রহ্ম জীবনকৃষ্ণের রূপে মানুষের অন্তরে উদ্‌ভাসিত হন।

২) ঋষিরা জীবনকে চারভাগে ভাগ করেছেন। জাগ্রত, সুষুপ্তি, স্বপ্ন ও তূরীয়--এই চার অবস্থায় ভগবানের লীলা দর্শন করলে তবে ভগবান সম্বন্ধে সম্যক ধারণা লাভ হয়। এই কথা পরবর্তীকালে প্রতীকে ওঙ্কার হল (সূত্র-মাণ্ডুক্য উপনিষদ্)।

ওঁ—অ + উ + ম + ০ (অমাত্র মাত্রা)

অ–জাগ্রত অবস্থা। এই অবস্থায় ঈশ্বরীয় চিন্তার উন্মেষ বা সূচনা হয়। তাই প্রতীকে আদি অক্ষর 'অ'কার নেওয়া হল। উ- স্বপ্নাবস্থা। উৎকর্ষতা বোঝাতে 'উ'কার নেওয়া হল। স্বপ্নাবস্থায় দেহাভিমান থাকে না। তাই স্বপ্নের অনুভূতি শুদ্ধতর।

ম–সুষুপ্তি (নিদ্রিত অবস্থা)। মিতি বোঝাতে 'ম'। আত্মার পরিমাপক বা বিলয়স্থান। যব মাপার সময় প্রবেশন ও নির্গমনের মধ্যবর্তী দশায় পাত্রের মধ্যে যব স্থির থাকে ফলে মাপা হয়। দেহপাত্রে সুষুপ্তি অবস্থায় যেন আত্মাকে মাপা হচ্ছে এরূপ কল্পনা করেছেন ঋষিরা।

০ (অমাত্র মাত্রা)—তূরীয় অবস্থা। আমরা যখন স্বপ্নের ভিতর স্বপ্ন দেখি সেই অবস্থাকে তূরীয় অবস্থা বলে। ইহা স্বপ্ন অবস্থার চেয়েও উচ্চতর আত্মিক অবস্থা। এই অবস্থায় দেহজ্ঞান সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়, ব্রহ্মের সঙ্গে অভেদ জ্ঞান হয়। তাই এই অবস্থা বোঝাতে কোন অক্ষর নেওয়া হয় নি। অমাত্র বা মাত্রাশূন্য মাত্রা ধরা হয়েছে।

ওঙ্কারনাথ–যিনি জীবনের চারটি দশাতেই ঈশ্বরীয় লীলা দর্শনের কারণ স্বরূপ।

প্রতীকের বিস্তার

ওঁ এই প্রতীকটি পুরাণকার নানাভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। ওঙ্কারের ঔপনিষদিক ব্যাখ্যার আলোকে পুরাণকারের কিছু বক্তব্য নতুন করে দেখা যাক। সন্ধান মিলতে পারে মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের।

১) ওঁ এই নাদব্রহ্মে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় বিধৃত আছে বলা হয়। এখন সৃষ্টি মানে জাগ্রত অবস্থা (অ), যে দশায় ঈশ্বরীয় চিন্তার প্রথম উন্মেষ ঘটে। স্থিতি মানে নিদ্রিত অবস্থা (ম) যে অবস্থায় আত্মা দেহে স্থিতি লাভ করে, বিকশিত হয় না এবং প্রলয় মানে স্বপ্নদশা (উ) যে অবস্থায় দেহীর জীবত্বনাশ (প্রলয়) ঘটে, ব্রহ্মের সঙ্গে একত্ব লাভ করে, অভেদ বোধ হয়।

২) ব্রহ্মা চতুর্মুখ, কেননা জীবনের চারটি অবস্থাতেই তিনি নিজ মহিমা প্রকাশ করেন।

৩) বিষ্ণু বামন অবতারে দৈত্যরাজ বলির কাছে ত্রিপাদভূমি প্রার্থনা করেন। দান প্রাপ্ত হয়ে বামন দুই পদ দ্বারা স্বর্গ ও মর্ত্য অধিকার করলে নাভি হতে নির্গত তৃতীয় পদ রাখবার স্থান বলিকে নির্দেশ করতে বললেন। বলির অনুরোধে তৃতীয় পদ তার মস্তকে স্থাপন করলেন। বলি–বলবান সাধক যিনি আত্মাকে লাভ (দর্শন) করেন। বেদ বলেছে--'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'। বামন–পাঁচশ কোটি মানুষের মধ্যে একজন মানুষ অতি ক্ষুদ্র। কিন্তু এইরূপ একটি মানুষের দেহে আত্মা পূর্ণরূপে প্রকাশিত হতে পারেন। তখন ঐ মানুষটিই বামন অবতার। 'মহতো মহীয়ান অনরোনীয়ান্।'

ত্রিপাদ ভূমি–আত্মার তিন পাদ–জাগ্রত, সুষুপ্তি ও স্বপ্ন (স্বপ্ন ও তূরীয়কে অভিন্ন ধরে)। এই তৃতীয় পাদ স্বপ্নাবস্থায় দেহী ব্রহ্মের সঙ্গে একত্ব লাভ করেন। কোথায় ? না সহস্রারে (মস্তকে) তাঁকে অবলোকন করে।

৪) রাবণ বধের নিমিত্ত নারায়ণ চার অংশে ভাগ হয়ে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন রূপে জন্মগ্রহণ করলেন। কিন্তু কেন ? রাবণ অর্থাৎ অহং নাশের জন্য জীবনের চারিটি অবস্থাতেই দেবত্বের ক্রিয়া সংঘটিত হওয়া চাই। ওঙ্কারের প্রতীক তত্ত্ব বিস্তৃত রূপ পেয়েছে এখানে। .

রাম–এক, সূচনা–অ–জাগ্রত অবস্থায় ঈশ্বরীয় প্রকাশ। রাম মানে কালো (প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল)। জাগ্রত অবস্থায় জীবত্ব থাকে বলে আত্মিক রহস্যের সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটন হয় না। এই অবস্থায় দেহী কৌশল অবলম্বন করে সত্যকে বিকৃত করতে পারে। তাই কৌশল্যার (দেহ) পুত্র রাম আত্মার প্রথম পাদ।

লক্ষ্মণ–উ–স্বপ্নাবস্থা। জাগ্রত অবস্থায় ঈশ্বরীয় দর্শন ও আলোচনার মাধ্যমে সত্য নির্ণয় সম্ভব হয় না। সত্যের প্রমাণ বা লক্ষণ ফুটে ওঠে স্বপ্নে। তাই সর্বদা রামের সংগে থাকে লক্ষ্মণ।

ভরত–ম–নিদ্রিত অবস্থা। এই অবস্থায় ইন্দ্রিয় সকল স্বকর্মে বিরত। একমাত্র প্রাণবায়ু সকল ক্রিয়াশীল। অগ্নিহোত্র যজ্ঞের সদা প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায়। 'প্রাণাগ্নয় এবৈতস্মিন পুরে জাগ্রতি'–অর্থাৎ এই দেহরূপ পুরে নিদ্রাকালে অগ্নিস্বরূপ প্রাণবৃত্তি সমূহই (প্রাণাদি বায়ু) জাগিয়া থাকে (প্রশ্ন উপনিষদ ৪।৩)। অগ্নির অপর নাম ভরত। যখন আমরা ঘুমিয়ে থাকি তখন আমাদের দেহ হ'ল কৈকেয়ী (কে কার এই ভাব যার)। তাই কৈকেয়ীর পুত্র ভরত নিদ্রিত অবস্থায় প্রাণশক্তির বিকাশকেই বোঝায়।

শত্রুঘ্ন–O–তূরীয় অবস্থা। শত্রুঘ্ন মানে শত্রুকে হনন করে যে। আমাদের একমাত্র শত্রু হল আমাদের অহংকার। তূরীয় অবস্থায় ব্রহ্মের সঙ্গে অভেদ বোধ হলে দেহী বোঝে সে কিছু নয়, ভগবানই সব। তখন অহং সম্পূর্ণভাবে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

স্বপ্ন ও তূরীয় এই দুই অবস্থার মধ্যে পার্থক্য অতি সূক্ষ্ম। তাই লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন যমজ ভাই সুমিত্রার পুত্র। সাধকের দেহটি এখন ভগবানের মিত্রা কারণ দেবস্বপ্নে আত্মার লীলা হ'লে তখন বোঝা যায় আত্মা যথার্থ কৃপা করেছেন দেহীকে।

স্বপ্নে সমর্থন

এবার পুজোর আগে স্নেহময়দের বাড়ী গিয়ে হাতে লেখা পত্রিকায় ওঙ্কারের অভিনব ব্যাখ্যা বিশেষত রামায়ণের সঙ্গে ওঙ্কারের রূপকের যোগ পড়ে মনে হল এসব কী পাগলামী করছে এরা! এতদিনের এত মানুষের বিশ্বাস কি ভুল হতে পারে ? যাইহোক বাড়ী ফিরে এসে কয়েকদিন পর এক রাত্রে স্বপ্নে দেখলাম–এক জায়গায় বিভিন্ন দেশ থেকে জ্ঞানী গুণীরা এসে জমায়েত হয়েছেন। স্নেহময় মঞ্চে দাঁড়িয়ে ওঙ্কার সম্বন্ধে ওদের পত্রিকায় লেখা কথাগুলো বলছে। সকলে খুব উৎফুল্ল হয়ে সমর্থন জানাচ্ছে ওকে। তখন আমার মনে হল আরে তাহলে তো ও ঠিকই বলছে। ...পরদিনই আমার ধারণার পরিবর্তনের কথা ও তার কারণ জানিয়ে এসেছিলাম ওকে।

গোপাল গোস্বামী
আদুরিয়া, বর্ধমান

জীবনমুক্তি

স্বপ্নে দেখছি–মামার বাড়ী গেছি। সেখানে বিপদতারণদার বিয়েতে যেন নেমন্তন্ন আছে। ওদের বাড়ী গেলাম। একটু পর বন্ধু গৌতমের সঙ্গে দেখা। ওর সঙ্গে কথা বলতে বলতে পথ হাঁটছি। এক জায়গায় দেখলাম একটি হাঁস ডিম পেড়ে চলে যাচ্ছে। ডিমটি কুড়োতে গেলাম। হঠাৎ দেখি ডিমটি উড়ে গিয়ে হাঁসটির পিছনে সেঁটে গেল। খুব অবাক হলাম। এবার দেখি কিছুদূর গিয়ে হাঁসটি আবার ডিম পাড়ল। টাট্‌কা ডিমটা নিতে ছুটে গেলাম। তিনটি ডিম পেড়েছে। একজনকে একটি ডিম দিয়ে দিলাম। একটি ডিম আমার হাতে রইল। বাকী ডিমটি আর দেখতে পাচ্ছি না। হাতে রাখা ডিমটিকে

ভাল করে লক্ষ্য করলাম। ডিমটির খোলা খুব পাতলা। ক্রমে আরও পাতলা হতে হতে স্বচ্ছ পলিথিন হয়ে গেল। একজন বলল, ভিতরে ইঁদুর আছে দেখ। কৌতূহল হল। পরক্ষণে পলিথিনের প্যাকেটের ভিতর ডিমের বদলে ধাতুর তৈরী একটি পাখী দেখা গেল। আমাদের কথাবার্তা পাখীটি যেন বুঝতে পারছে, ও সেই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সাড়া দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল। তারপর অদ্ভুত ঐ পাখীটিকে উড়িয়ে দিলাম। পাখীটি প্যাকেটের ভিতরে থেকেই শূণ্যে উড়তে লাগল। ...ঘুম ভাঙল।

ব্যাখ্যা ঃ হাঁস–পরমহংস, ব্রহ্ম। হাঁসের ডিম–ব্রহ্মাণ্ড, দেহ। যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে তাই আছে দেহভাণ্ডে। ডিমটি হাঁসের পিছনে সেঁটে গেল–পিতৃবীজে ফিরে যাওয়া, জড় সমাধি লাভ। আবার ডিম পাড়ল–নিগমে নেমে এল। পাতলা আবরণ–অহং-এর আবরণ সূক্ষ্মতর হয়েছে। তিনটি ডিম–দ্রষ্টার তিনটি জীবন। (১) নতুন ব্যবহারিক জীবন (যে ডিমটি পরে দেখা গেল না) যে জীবন সম্পর্কে এই স্বপ্নে আলোকপাত করা হল না। (২) দ্রষ্টার আত্মিক জীবন (যে ডিমটি দ্রষ্টা লক্ষ্য করছেন)। (৩) সমষ্টিতে পরিব্যাপ্ত আত্মিক জীবন (যে ডিমটি অন্যকে দিলেন)। ধাতব পাখী–দেহের ক্রিয়ামূল (ধাতু) অর্থাৎ প্রাণশক্তি ঘনীভূত হয়ে আত্মায় (আত্মাপাখী) পরিবর্তিত হয়েছে। ইঁদুর নয় পাখী – তুচ্ছ জীব শিবে পরিবর্তিত হয়েছে। আলোচনায় সাড়া দিচ্ছে–ব্রহ্মবিদ পুরুষের দেহস্থ চৈতন্য ব্রহ্ম বিষয়ক আলোচনায় সাড়া দিয়ে সত্য কি তা জানিয়ে দেয়। উড়ে গেল – মুক্তির আনন্দ অনুভব করছে।

'সাধারণ জীবকটি মানুষের জড় সমাধিতে দেহ টুটে যায়। দত্তাত্রেয় এবং জড় ভরতের জড় সমাধি। এরা আর ফিরতে পারেন নি।' (সূত্র- ধর্ম ও অনুভূতি)।

বিপদতারণের বিয়ে – শ্রীভগবান মনুষ্যজাতির অন্তরে স্বামী বা অবলম্বন হিসাবে প্রকাশ পাবেন।

পুরুষোত্তম (গৌতম) সহায় (বন্ধু) হওয়ায়, জড় সমাধি থেকে ফিরে অহংশূন্য হয়ে দেহ নিয়েই যে মুক্তি, দ্রষ্টা সেই জীবন্মুক্তির স্বাদ অনুভব করছেন, আপনা হতে- -শ্রীজীবনকৃষ্ণের কৃপায়।

স্নেহময় গাঙ্গুলী
চারুপল্লী, বোলপুর

দত্তাত্রেয় ও জড় ভরত প্রসঙ্গে পুরাণকথা ও যোগাঙ্গ ঃ-

দত্তাত্রেয়

মহর্ষি অত্রি পুত্র কামনা করে উপাসনা করলে বিষ্ণু তাকে বলেছিলেন, 'আমি পুত্র রূপে তোমাকে দত্ত হলাম।' সেইজন্য তাঁর পুত্র দত্তাত্রেয় নামে পরিচিত। একমতে দত্তাত্রেয়ই ত্রিমূর্তি অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের সম্মিলিত রূপ, অন্যমতে মুনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর – এই তিনজনকেই পুত্ররূপে লাভ করেন। তাঁর স্ত্রী অনসূয়ার গর্ভে ব্রহ্মা সোম (চন্দ্র) রূপে, বিষ্ণু দত্তাত্রেয় রূপে ও মহেশ্বর দুর্ব্বাসা রূপে জন্মগ্রহণ করেন। দত্তাত্রেয় হৈহয়রাজ কার্তবীর্যার্জুনকে বর দেন, 'তোমার বাহুদ্বয় আমার বর প্রভাবে সহস্রবাহু হবে' (মার্কণ্ডেয় পুরাণ)।

বেদান্তের সাধনে ভগবান বা আত্মা সন্তান লাভের তিনটি ক্রম আছে। প্রথম পর্যায়ে আত্মার মধ্যে জগৎ দর্শন বা বিশ্বরূপ দর্শন। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে প্রাপ্তি। দ্বিতীয় পর্যায়ে বিশ্ব বীজবৎ দর্শন ও জড় সমাধি লাভ। বীজের মধ্যে সৃষ্টি স্থিতি লাভ করে। তাই এই অবস্থা হল স্থিতির দেবতা বিষ্ণুকে প্রাপ্তি। দত্তাত্রেয় হল সাধকের এই স্তরের আত্মিক অবস্থার পরিচায়ক অর্থাৎ জড় সমাধি প্রাপ্ত মানুষই দত্তাত্রেয়। তিনি জানেন ছোট্ট বীজ থেকে যেমন সৃষ্টির সহস্রধারা প্রকাশ পায় তেমনি ক্ষুদ্র মানুষের মধ্যে বাহুদ্বয় থেকে সহস্রবাহু হবার সম্ভাবনা অর্থাৎ অনন্ত সৃষ্টিশক্তি বিধৃত। এরপর দুর্বাসার জন্ম। এই ধাপে জড় সমাধিতে বোধের লয় হয় যার পরে তত্ত্বজ্ঞান লাভ। তাই দুর্বাসাকে নিয়ে সমস্ত পৌরাণিক কাহিনীগুলিতে প্রথমে ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞান লোপ, পরে তত্ত্বজ্ঞানী ভক্তের মহিমা প্রকাশ ঘটেছে।

জড় ভরত

বিষ্ণুভক্ত রাজা ভরত বিশ্বরূপের কন্যা পঞ্চজনাকে বিবাহ করেন। এই স্ত্রীর গর্ভে পাঁচ পুত্র হয়। তাদের হাতে রাজ্যভার দিয়ে রাজা তপস্যায় মনোনিবেশ করেন। বনবাসকালে একদিন এক আসন্ন প্রসবা হরিনী জল পান করতে এসে এক সিংহের গর্জনে ভীত হয়ে পদস্খলিত হয়ে ভূপতিত হয় এবং গর্ভপাতের ফলে তার মৃত্যু হয়। ভরত এই মাতৃহীন মৃগের মায়ায় আবদ্ধ হয়ে তপস্যা ত্যাগ করেন এবং মৃগের চিন্তা করতে করতে দেহত্যাগ করেন। পরজন্মে ইনি মৃগ হন এবং জন্মান্তরে ব্রাহ্মণ কুমার রূপে আবির্ভূত হন। তিনি লোকসঙ্গ থেকে বিবর্জিত হয়ে জড়বৎ বাস করতেন বলে নাম হয় জড় ভরত। একদিন রাজা রহূগণ পাল্কী চড়ে যাচ্ছিলেন কপিল মুনির কাছে দীক্ষা নিতে। পথে এক বাহক অসুস্থ হয়ে পড়লে তার বিকল্প হিসাবে অন্য বাহকেরা মৌনী ভরতকে ধরে নিয়ে এল।

তিনি এসে পাল্কী কাঁধে তুললেন কিন্তু পাছে পায়ের চাপে কোন জীব মারা পড়ে তাই লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে লাগলেন। এতে রাজা বিরক্ত হয়ে কটু মন্তব্য করলে ভরত

রাজাকে মার্জিত ভাষায় তিরস্কার করলেন। রাজা বিস্মিত হলেন। বুঝলেন ভরত কোন ছদ্মবেশী মহাতাপস। তখন তিনি ভরতের পায়ে ধরে ক্ষমা চাইলেন। ভরত প্রসন্ন হয়ে রাজাকে ব্রহ্মোপদেশ দান করলেন (বিষ্ণু পুরান) ।

ভরত রাজা–সব মানুষই অন্তরে ঈশ্বর প্রদত্ত রাজ ঐশ্বর্যের মালিক, রাজা। বিশ্বরূপের কন্যা–যে দেহ সর্বোচ্চ বিশ্বরূপ দর্শনের স্তর পর্যন্ত আত্মিক শক্তির বিকাশ ধারণে সক্ষম অর্থাৎ ঐ অবস্থা পর্যন্ত দেহী নিত্যসিদ্ধ (আপনা হতে সাধন হয়)। বিশ্বরূপের কন্যা পঞ্চজনাকে বিবাহ করেন এবং পাঁচপুত্র লাভ করেন—দৈবীদেহ লাভ করেন ও সেই সঙ্গে পঞ্চকোষের সাধনে ফলবতী হন। রাজ্য ছেড়ে তপস্যায় মনোনিবেশ করেন–আত্মার মধ্যে জগৎ দর্শন বা বিশ্বরূপ দর্শনের পরের অবস্থায় পৌঁছালেন; সেটি হল বিশ্ব বীজবৎ অনুভূতি ও জড় সমাধি লাভ। সিংহের গর্জন-প্রচণ্ড আত্মিক তেজ। পিপাসার্ত হরিণের পদস্খলন ও মৃত্যু ঘটল–সাধকের আত্মিক অগ্রগতির সমাপ্তি ঘটল এই জড় সমাধিতেই কারণ তিনি নিত্যসিদ্ধ অবতান নন, তিনি ছিলেন ঈশ্বরকটি মানুষ (হরিণ) তাই হরিণ প্রসব করলেন অর্থাৎ আর দেবত্ব শক্তি জাগল না; তিনি যে ঈশ্বরকটি নিত্যসিদ্ধ মানুষ তারই পরিচয় মিলল। ভরত রাজার হরিণ জন্ম হল–ঐ হরিণের রূপক যে সাধকের অবস্থা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে সেকথা আরও স্পষ্ট করে বোঝানোর জন্য বলা হল মুনি হরিণ হলেন। তিনি ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মালেন কিন্তু মৌনী থাকলেন--তিনি ব্রহ্মবিদ পুরুষ হলেন কিন্তু জড় সমাধিতে লয় হয়ে গেলেন আর নিগমে এসে মানুষকে তার দর্শন অনুভূতির কথা ঠিকমতো বোঝাতে পারলেন না বলে গল্পে তাঁকে মৌনী দেখানো হল। রাজার পাল্কী বইলেন–রাজাকে কৃপা করলেন। পরে তাকে ব্রহ্মোপদেশ দান করলেন–পরবর্তী প্রজন্মের কোন একজনের মধ্যে সাধকের সাধনার ফল বর্তায় তাই ভরত রাজার সাধনের ফল অন্য এক রাজা পেল।

শ্রীরামকৃষ্ণ জড় সমাধি লাভ করেছিলেন। পরে নিগমের অবতারতত্ত্বের সাধনও হয়েছিল। কিন্তু স্থিত সমাধি হয়নি বলে অপরকে অনুভূতি দান করে ব্রহ্মজ্ঞান দান করতে পারেন নি। তাই তিনি বলতেন, জানি কিনা আবার আসতে হবে, তাই সব খুলে বলে গেলাম না। পরবর্তীকালে জীবনকৃষ্ণ তাঁকে স্বপ্নে সচ্চিদানন্দগুরু রূপে দর্শন করেন ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। শ্রীজীবনকৃষ্ণের স্থিতসমাধি হওয়ায় বহুজনের ভিতর স্বপ্নে ফুটে উঠে রামকৃষ্ণ কথিত ঈশ্বরতত্ত্ব ধারণা করিয়ে দিচ্ছেন।

উপরের স্নেহময় গাঙ্গুলীর স্বপ্নটি ও তার ব্যাখ্যা আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিক পুরাণ কথার যৌগিক ব্যাখ্যার সমর্থনে জয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের একটি দর্শন হয়েছিল। দর্শনটি নিম্নরূপ।

“আজ (৬/৯/১৯৯১) পাঠে খালি চোখেই দেখলাম ছোট মামার পাশে বসে রয়েছেন জীবনকৃষ্ণ। ছোট মামা পাঠ প্রসঙ্গে জড়ভরতের কথা ব্যাখ্যা করছে, তখন উনি

ঘাড় নাড়িয়ে সায় দিচ্ছেন।..."

শ্রীকৃষ্ণের জন্মরহস্য

দেখছি— আমার একটি সন্তান হয়েছে। কোলে নিয়ে অবাক হয়ে দেখছি, এ যে শ্রীকৃষ্ণ। এ কী করে সম্ভব! ভাবতে পারছি না। প্রচণ্ড আনন্দে ওকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে লাগলাম। ঘুম ভাঙল।

সবিতা ঘোষ
চারুপল্লী

ব্যাখ্যা ঃ সন্তান শ্রীকৃষ্ণ–আত্মা সন্তান। ঈশ্বর কৃপা করে দেহ থেকে মুক্ত হলে তবে মুক্তি–এই সত্য দ্রষ্টাকে ধারণা করিয়ে দিচ্ছেন।

এই প্রসঙ্গে কীর্তনের আঙ্গিকে রচিত কৃষ্ণজন্ম রহস্যের যোগাঙ্গটি এখানে উল্লেখ করা হল।

পুরাণকার গূঢ় সাধন রহস্য খুব সহজে এক কথায় মানুষকে বুঝিয়ে দেবার মানসে অনেক অপূর্ব কাহিনী সৃষ্টি করলেন কিন্তু সাধারণ মানুষ কাহিনীর রূপকের মোহজালেই আটকা পড়ে রইলেন; সত্যের ঝর্ণা ধারায় অবগাহনের সাধ তাদের অপূর্ণ-ই রয়ে গেছে। তাই তো বলি–

যোগাঙ্গ দেখ বিচার কর শুনছ যত ভাগবত পুরাণ
মানুষ তুমি দেখবে আলো, ঘুচবে তোমার মনের কালো
জানবে মানুষ-ই হয় ভগবান।

এখন আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মরহস্য আলোচনা করব। শ্রীকৃষ্ণ অবতার নন, কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং।

ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, সর্ব অবতারী সর্ব কারণ প্রধান–
সচ্চিদানন্দ-তনু শ্রীব্রজেন্দ্র নন্দন, সর্ব ঐশ্বর্য সর্বশক্তি সর্ব রসপূর্ণ পুরুষ যোষিৎ কিম্বা স্থাবর জঙ্গম, সর্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মথন আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন, আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন—

হেন কৃষ্ণ জনমিল কংস কারাগারে।
কংস কারাগার দেখ দেহের মাঝারে॥
দেহ কংস-কারাগারে
কৃষ্ণ জনম লভে ও মন
মথুরায় নয় হৃদ মাঝারে।
হরি কে তোমারে চিনতে পারে
তুমি চেনাও যারে কৃপা করে
সেই তো তোমায় চিনতে পারে।

দেহ ধারণের সাথে সাথে জাগে দেহাত্ম বোধ (আমি এই দেহ—এই জ্ঞান), কংস। তিনি মামা অর্থাৎ সর্বজনীন, সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই কংসের দুই স্ত্রী। অস্তি আর প্রাপ্তি। অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এই অর্থে স্ত্রী। দেহাত্ম বোধের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে দুই মনোভাব। অস্তি আর প্রাপ্তি। অস্তি অর্থাৎ আমার এত ঐশ্বর্য আছে, আমি এত সম্পদের মালিক এই বোধ। প্রাপ্তি অর্থাৎ আয় বা উপার্জন। আমি নিজ যোগ্যতায়, পৌরুষ বলে এই সব ঐশ্বর্য অর্জন করেছি—এইরূপ মনোভাব। কংস কারাগার মানে দেহ কারাগার। ঐ কারাগারে—

দেবকী গর্ভে কৃষ্ণ লভিল জনম
বসুদেব পিতা যার জানে ত্রিভুবন।

দেবকী গর্ভে বসুদেব পিতার মিলনে কৃষ্ণ জন্মাল। এই দেহ ধামে অর্থাৎ মনুষ্য শরীরে জন্মগ্রহণ করে। কারণ এই দেহ ভগবানের লীলার আধার। তাই ভক্তকে ভগবান বলেন তোমার দেহখানি আমাকে দাও। জগৎগুরুকে দেহদান করতে হয়। এর কারণ হচ্ছে—ভক্ত জানে–কি জানে গো ? জানে,

আমার মাঝে তোমার লীলা হবে।
তাইতো আমি এসেছি এই ভবে॥

পিতা কে ? না, বসুদেব। বসু শব্দের অর্থ পৃথিবী। কথায় বলে না, যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে তাই আছে এই দেহ ভাণ্ডে। তাই এক অর্থে পৃথিবী মানে এই দেহ। তাহলে বসুদেব মানে দেহের দেব শক্তি। দেবকী এখানে দৈবী দেহকে অর্থাৎ আত্মিক স্ফূরণের উপযুক্ত দেহকে নির্দেশ করছে। প্রাণশক্তির ঊর্ধ্বমুখী যাত্রাকালে দেহ ও প্রাণশক্তির সংঘর্ষণ ও রূপান্তরে কালক্রমে দেহ হতে আত্মা নিঃসৃত হয়। এই আত্মা সন্তানই কৃষ্ণ।

দেবকী বসুদেব মিলনে কৃষ্ণ জনমিল, দেবশক্তি দৈবীদেহে ক্রিয়াশীল হল।
দৈবী মানুষের দেহ দেবকী রূপ ধরে, তাই কৃষ্ণ জনমিল দেবকী উদরে।
দেহের দেবত্বশক্তি বসুদেব হয়, বসুদেব কৃষ্ণ পিতা সর্বজনে কয়।

কৃষ্ণধনের এই পরিচয়
বোঝালে জীবনকৃষ্ণ দয়াময়।
কে এই লীলা বুঝতে পারে–
তুমি বোঝাও যারে কৃপা করে, সেই তো লীলা বুঝতে পারে॥

যারা দেহেতে জীবনকৃষ্ণের লীলা প্রত্যক্ষ করেছেন তারা নিজের জীবনে কৃষ্ণলীলার সত্য পরিচয় সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন। সপ্তম গর্ভে বলরাম ও অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করলেন। আসুন এর যোগাঙ্গটি বোঝার চেষ্টা করি।

তব কৃপায় বুঝিনু হে এই সমাচার।
বেদমতে দেহমাঝে সপ্তভূমি রয়
(যখন) কুণ্ডলিনী মহাবায়ু ঊর্দ্ধগামী হয়।
(তখন) এক এক ভূমি মাঝে এক এক দর্শন
করিয়া ভক্তের হয় সার্থক জীবন।
অন্তর্মুখী প্রাণশক্তির প্রতি ভূমি মাঝে
নব নব জন্ম সাধক প্রত্যক্ষ করিবে।

দেবকীর পরপর ছয়টি গর্ভজাত সন্তানকে কংস নিজ গৃহে বাহুবলে হত্যা করল অর্থাৎ ব্যষ্টির ষষ্ঠভূমি পর্যন্ত সাধন ও দর্শন অনুভূতি সাধক নেতি নেতি করে অগ্রাহ্য করল। জন্ম হল সপ্তম গর্ভে বলরামের বা বলভদ্রের। বলভদ্র মানে শ্রেষ্ঠ বলশালী ব্যক্তি। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।' আত্মাকে যিনি দর্শন করেছেন তিনিই যথার্থ বলশালী ব্যক্তি। বলভদ্র জন্মাল অর্থাৎ সপ্তমভূমিতে ব্যষ্টির শ্রেষ্ঠ দর্শন আত্মা-সাক্ষাৎকার বা ভগবান দর্শন হল। সাতটি ভূমিতে দেবশক্তির ক্রিয়া বোঝাতে বসুদেবের সাত স্ত্রীর কথা বলা হয়েছে। যেহেতু সপ্তভূমি একটি দেহেই অবস্থিত তাই একটি মাত্র স্ত্রী দেবকীর গর্ভে সাত বার পুত্র জন্মানোর কথা বলা হল।

সপ্তম গর্ভেতে বলরামের উদয়
রোহিনীর গর্ভে পাঠান বিষ্ণু দয়াময়।

দেবকীর সপ্তম গর্ভে বলরাম জন্মগ্রহণ করলেন। এই বলরামকে বিষ্ণু রোহিনীর গর্ভে স্থানান্তরিত করলেন। রোহিনী শব্দটি আরোহীর স্ত্রী লিঙ্গ। আরোহ মানে কটিদেশ। রোহিনী মানে দাঁড়াল বিশেষ কটিদেশ সম্বলিত দেহ। ঈশ্বরকটি জীবের সপ্তমভূমিতে ভগবান দর্শনের পর চৈতন্যের অবতরণ ঘটে সহস্রার থেকে কটিদেশ পর্যন্ত।

তারপর ? —

এই মানুষে আছে রে মন
যারে কয় মানুষ রতন।

এরপর সাধকের মানুষ-রতন দর্শন হয় দেহের মধ্যে। তিনি পরম ভক্ত। সারা কপাল জুড়ে চন্দনের ফোঁটা, ঠিক বরের মতো। তিনি হাততালি দিয়ে হরিনাম করেন আর দ্রষ্টার হাতের তালু কির্‌কির্‌ করে ওঠে। তাই বলছে,

বলরাম, বল–রাম, ভজনাম অবিরাম
শুদ্ধ হবে দেহধাম, তোমার পূর্ণ হবে মনস্কাম॥

বলরাম নামের মধ্যে মানুষ-রতনের হরিনাম করার ইঙ্গিতটিও সুস্পষ্ট। বলরাম শেষ নাগের অবতার অর্থাৎ মানুষ-রতন দর্শন সাধকের সগুণ সাধনার পরিসমাপ্তির

পরিচায়ক। এক কথায় বলরাম বলতে সাধকের সপ্তমভূমিতে ভগবান দর্শন, চৈতন্যের সহস্রার হতে কটিদেশে অবতরণ ও মানুষ-রতন দর্শন হয়ে প্রাপ্ত অবতারত্বকে বোঝায়।

পরবর্তী অধ্যায়ে নির্গুণের ক্রিয়ায় সাধকের বিশ্বব্যাপিত্ব শুরু হয়। তাই বলরামের দেহ যাবার সময় তাঁর মুখ থেকে বৃহদাকার এক সর্প অর্থাৎ কুণ্ডলিনী শক্তি (চৈতন্যশক্তি) বের হয়ে সমুদ্রে মানে জন-সমুদ্রে মিশে গেল। বিশ্বব্যাপিত্বের সাধনে সাধকের দেবশক্তি নিজ দেহসীমা ছাড়িয়ে অন্যের অন্তরে দেবত্ব জাগিয়ে তোলে, সাধকের চিন্ময় রূপ ফুটে ওঠে তার অজ্ঞাতসারে অসংখ্য মানুষের অন্তরে। সেই কথা ছান্দোগ্য উপনিষদ বলছেন--'অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায়, পরং জ্যোতি উপসম্পদ্য, স্বেন রূপেন অভিনিষ্পদ্যতে॥"

সপ্ত গর্ভ হয় দেখ এই দেহ মাঝে
অষ্টম গর্ভ হয় অপরের দেহেতে।
সাধকের দেবশক্তি দেহসীমা ছেড়ে
অপরের দেহে যখন বিকাশ লাভ করে।
দেবত্ব জাগিয়ে তোলে অপরের দেহেতে
তখনই তো অষ্টম গর্ভে কৃষ্ণ জনমিছে॥

ভাদ্র মাসের অষ্টমী তিথি। দুর্যোগের রাত্রি। অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। সকলে ঘুমে অচেতন। অস্বাভাবিক কৃপাবৃষ্টির মধ্য দিয়ে সাধকের বিশ্বব্যাপী সত্তার উন্মেষ ঘটে, কৃষ্ণের জন্ম হয় সকলের অজ্ঞাতসারে। বসুদেব কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে মথুরায় নন্দরাজের গৃহে নিদ্রিতা যশোদার পাশে রেখে এলেন।

বসুদেব রেখে এলেন নন্দের নন্দনে
নন্দালয়ে কৃষ্ণধন বাড়ে দিনে দিনে।

কৃষ্ণধন আমার পালিত হল গোকূলে অর্থাৎ জগতের মানুষের মধ্যে। যমুনার ওপারে মানে জীবন নদীর ওপারে, অন্য জীবনে। আমরা জানি দেবত্বের বিকাশ লাভের মাধ্যম হল দেবস্বপ্ন। এই স্থূল দেহ থেকে আর একটি দেহ সৃষ্টি হলে তবে দেবস্বপ্ন দেখা যায়, তাকে বলে ভাগবতীতনু বা কারণশরীর। তাই কৃষ্ণের জন্মের সাথে একই সঙ্গে নন্দরাজের কন্যা জন্মাল অর্থাৎ কারণশরীরের লীলা শুরু হল। নন্দ অর্থাৎ আনন্দ। যে দেহী দেবস্বপ্নের উদ্‌ভাসনে ব্রহ্মানন্দ ভোগ করার সুযোগ পান, তিনিই নন্দ।

তাই একই সময় নন্দরাণীর কন্যা হয়েছিল
কন্যা পরিবর্তে কৃষ্ণে পালন করিল।

নন্দ কন্যা পরিবর্তে কৃষ্ণধনকে পালন করল। অর্থাৎ কারণশরীর আত্মায় পরিবর্তিত হল।

ঐ কন্যা মহামায়া জানে সর্বজনে,

কারণশরীর মহামায়া সাধকের স্থানে।
কারণশরীরে ভগবান শিবদুর্গা বটে
আত্মা সাক্ষাৎকার হলে রহস্যভেদ ঘটে।

কারণশরীরের লীলা দেখে কেউ ভাবছে শিব ভগবান, কেউ ভাবছে কালী ভগবান, আবার কেউ ভাবছে দুর্গা ভগবান ইত্যাদি। এই মায়া (illusion) ভেদ হয়ে ভগবান এক, আমি কারণশরীরের নানা রূপ দর্শন করছি মাত্র—এই সত্য জানা যায় যখন কারণশরীর আত্মায় পরিবর্তিত হয়। তাইতো কন্যার পরিবর্তে নন্দ পুত্র কৃষ্ণকে পেলেন। কৃষ্ণ বড় হলে অর্থাৎ অসংখ্য মানুষ (জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে) ঐ সাধককে অন্তরে দেখলে (স্বপ্নে, ধ্যানে, তন্দ্রায় আবার জাগ্রতে) সাধকের–'আমি দেহ নই, আমি আত্মা' এই জ্ঞান হবে, কংস বা দেহাত্মবোধের অবলুপ্তি ঘটবে।

এই তো কৃষ্ণ জনম লীলা করিনু বর্ণন
কৃপাময়ের কৃপা হলে বুঝিবে তখন।
সচ্চিদানন্দ রূপে দেহে ফুটে উঠি
বুঝাইবে সব লীলা রবে না ভাই ত্রুটি।
ব্রহ্মাণ্ডের সবই লীলা দেহ মাঝে হয়
করুণা করিয়া তাহা বোঝান দয়াময়।
সবে বল প্রেমানন্দে জীবনকৃষ্ণ নাম
ভবের পরম ত্রাতা স্বয়ং ভগবান॥

——— ঃ ———

অমৃতবাণী

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ ?

কেন 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' ? কারণ অমৃত হ'ল পরম এক। অপর সকলে সেই এক থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এই এক হল Protoplast (reproductive unit, সৃষ্টির একক) যা আভ্যন্তরীণ বিশেষ রূপান্তর লাভে নিজেকে বহু সংখ্যায় সৃষ্টি করে। আমি অসংখ্য মানুষের অন্তরে নিজেকে সৃষ্টি করেছি।

আকাশে এক চন্দ্র। সংখ্যাতীত জলাশয় পৃথিবীতে। প্রতি জলাশয়ে প্রতিবিম্ব চন্দ্র। এই প্রতিবিম্ব চন্দ্র আকাশের চন্দ্রের গুণ পায় তথা ব্রহ্মত্ব লাভকারী মানুষটির ঐ যে রূপ সহস্র সহস্র নরনারীর অন্তরে ফুটে উঠছে সেই হ'ল ব্রহ্মত্ব।

আমাদের ঈশ্বর ? এই একত্বই ঈশ্বর। ঈশ্বরের এই হল স্বভাবসিদ্ধ বস্তু। মানুষের মনের অঙ্কট-বঙ্কট পাপ-তাপ তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। সে আপন তেজে আপনি প্রতি মানুষের দেহে প্রতিষ্ঠিত হয়। ...আমার প্রাণশক্তির স্বতঃস্ফূরণ – তাকে কোন বাধাই ঠেকিয়ে রাখতে পারে না।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ

নবীনা

স্বপ্নের মধ্য দিয়ে আত্মিক জগতের সম্পূর্ণ নতুন জ্ঞান অর্জনের কিছু উদাহরণ দিয়ে সাজানো হ'ল এই অধ্যায়।

প্রথম দর্শন

একদিন (১১-৪-১৯৯১) স্বপ্নে দেখছি আমাদের বাড়ী থেকে যেন জীবনকৃষ্ণকে নেমন্তন্ন করা হয়েছে। সকাল সাতটায় আসার কথা, কিন্তু সাতটা পনের হয়ে গেল এখনও উনি এলেন না দেখে সাইকেল নিয়ে বেরোলাম একটু এগিয়ে গিয়ে দেখার জন্য। গ্রামের বাইরে এক ডাঙায় লোকের ভীড় দেখে এগোলাম। ভাবলাম হয়ত জীবনকৃষ্ণ ওখানে আছেন। ওখানে পাঠ হচ্ছে। করালীবাবুকে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখানে কি জীবনকৃষ্ণ এসেছেন ?' উনি বললেন, 'আমি তো ওনাকে চিনি না।' বললাম, 'চেনার দরকার নেই। ওনাকে দেখলেই বোঝা যায় যে উনিই শ্রীজীবনকৃষ্ণ। আমিও তো ওনাকে আগে কখনও দেখিনি (বাস্তবে যদিও বহুবার দেখা দিয়েছেন)।' করালীবাবু বললেন, 'এখানে নতুন একজন পাঠ করছেন, উনি জীবনকৃষ্ণ হলেও হতে পারেন, তুমি দেখ।' আমি পাঠকের দিকে তাকাতেই পাঠকের শরীর থেকে ওনার যেন এক বৈদ্যুতিক শরীর উঠে এসে আছড়ে পড়ল আমার শরীরে, তীব্র আলোড়ন জাগল। বুঝলাম উনিই শ্রীজীবনকৃষ্ণ। তখন মনে হচ্ছে আমি ঠিকই বলেছি যে ওনাকে প্রথম দেখাতেই চেনা যায়। ওনাকে দেখতে ঠিক আমার দুঃখহরণ দাদুর মত, ফটোর সাথে ওনার মুখের কোন মিল নেই। মুখে পাকা ছোট ছোট দাড়ি, গায়ে আকাশী রঙের মোটা কাপড়ের পাঞ্জাবী। আমি তাড়াতাড়ি সাইকেল থেকে নেমে কপালে দুই হাত ঠেকিয়ে প্রণাম জানাতে গেলাম। ডান হাতে একটি 'মাণিক্য' পত্রিকা কোথা থেকে এসে গেল। চোখ বুজে মনে মনে প্রণাম জানালাম আর পত্রিকাটি কপালে ও বুকে ঠেকালাম। অমনি মাণিক্যের প্রতিটি লাইনের প্রতিটি অক্ষর পুলকিত, শিহরিত হ'ল। আনন্দের আতিশয্যে শৃঙ্খলার বাঁধ ভেঙে গেল। একটু পর সম্বিৎ ফিরে পেয়ে আবার পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আগের মত লাইন সৃষ্টি করল। এরপর আমার দেহের প্রতিটি অণু পরমাণু মুহুর্মুহু রোমাঞ্চিত হয়ে পবিত্র হয়ে গেল। মনে হচ্ছে শ্রীজীবনকৃষ্ণকে দেখলে এই রকমভাবে সমস্ত দেহমন পবিত্র হয়ে ওঠে। তীব্র আনন্দে ঘুম ভাঙল। এর আগে কখনও নিজেকে এত পবিত্র বোধ হয় নি।

(বিভিন্ন ভূমিতে নানা প্রকার ঈশ্বরীয় দর্শন হয়ে সপ্তমভূমির দ্বারদেশে সাধক দেখেন রেশমের পাতলা পর্দা ঝুলছে তার ওপারে সূর্য। এই পর্দা অহং-এর সূক্ষ্ম আবরণ। এরপর সপ্তমভূমিতে মন উঠলে পূর্ণ ভগবানের দর্শন হয়। দ্রষ্টার অহং-এর আবরণ সরে গিয়ে ষোল আনা (পূর্ণ), বা ঠিকঠিক জীবনকৃষ্ণ দর্শন হল এই স্বপ্নে। তাই দ্রষ্টার মনে হচ্ছে জীবনকৃষ্ণকে প্রথম দেখছেন।)

১৯৮৬ সালের ৫ই মে রাত্রে বিচিত্র এক স্বপ্ন হয়েছিল। দেখলাম–বাবুর দল পিকনিক করছে। আমাদের মত অনেক সাধারণ মানুষও ঐ দলভুক্ত হয়ে গিয়ে পিকনিকের

আয়োজন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। এক সময় সকলে পরিশ্রান্ত হয়ে শুয়ে পড়লাম। তখন দেখছি সামনে উঁচু বেদীর উপর দর্পনারায়ণদা, জ্যাঠামশাই ও একজন অজানা সংগীত শিল্পী বসে রয়েছেন। সকলের ইচ্ছা তাদের প্রত্যেকের তাৎক্ষণিক পরিবেশের আনন্দ অনুভূতিকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং আরও কিছু বেশী আনন্দের কথা যেন ব্যক্ত হয় ঐ শিল্পীর গানে। কিন্তু উনি বললেন, 'আমি তা পারব না'। তখন দর্পদা বললেন, তাহলে আমার স্বপ্নে পাওয়া গানটি আপনার বীণায় বাজান। শিল্পী বললেন, 'আমি তো তা জানি না।' জ্যাঠামশাই বলে উঠলেন, আমি আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই বলে 'ভোরের সূর্য তুমি'- এই গানটি বাজালেন। শিল্পী এবারও বললেন, 'আমি ঐ গান বাজাতে পারব না।' তখন সকলের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল। চিৎকার করে বলতে লাগল, 'আপনি যা পারেন তাই বাজান।' উনি বললেন, 'আমি একটি মাত্র গান জানি—সেটি মহাজাতীয় সংগীত, যাতে সকলের মধ্যে যে অনুভূতি common তারই প্রকাশ।'

শুরু করলেন তিনি। মুহূর্তে বহির্জগৎ আমার চেতনা থেকে লুপ্ত হ'ল। মন নিবদ্ধ হ'ল দেহে। কোন শব্দ, কোন অনুরণনও হচ্ছে না। দেহের প্রতিটি কোষেই আনন্দের ঢেউ খেলছে। কী তীব্র এক আনন্দ সারা দেহজুড়ে। কিছুতেই স্থির থাকতে পারছি না। আর বোধ হচ্ছে এই আনন্দই জীবনকৃষ্ণ। এই কি 'আনন্দং ব্রহ্ম ?' বেশ কিছুক্ষণ এই আনন্দ উপভোগের পর ঘুম ভাঙল। ঘড়িতে তখন একটা বাজতে দশ। আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। ভোরের দিকে আবার সেই একই অনুভূতি। আনন্দ—আনন্দ—আর আনন্দ। আনন্দই যেন আমার সত্তার স্বরূপ। ঘুম ভাঙার পরও নড়াচড়া করতে পারছি না, ভিতরে সেই অসহ্য আনন্দ কিলবিল করছে, দু'চোখ বেয়ে অঝোরে গড়িয়ে পড়ছে আনন্দাশ্রু। স্বাভাবিক হতে অনেক সময় লেগেছিল। আর এই স্বপ্ন শ্রীজীবনকৃষ্ণ সম্পর্কে আমার সব ধ্যান-ধারণাকে দিল বদলে, খুলে দিল নতুন দৃষ্টি।

স্নেহময় গাঙ্গুলী
চারুপল্লী

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া

আজ ভাই ফোঁটা। স্বপ্নে দেখছি ট্যাক্সি করে এসে আমাদের বাড়ীতে ঢুকলেন চিত্রগুপ্ত। প্রৌঢ় ভদ্রলোক, মাথায় সাদা চুল, মুখে পাকা দাড়ি। বললেন, আমি স্বর্গ থেকে এলাম ফোঁটা নিতে তোমার কাছে। আমি তো অবাক। চিত্রগুপ্ত যে যমপুরীর লোক, এই ভেবে আরও ভয় পাচ্ছি। এদিকে বাড়ীতে জীবনকৃষ্ণ বসে রয়েছেন। উনি হাসছেন। বললেন, 'আমি জানতাম ও আসবে ফোঁটা নিতে।' আমি বললাম, 'সে কী! তাহলে আপনি বলেননি কেন ? এখন আমি কিভাবে সব আয়োজন করব ?' উনি বললেন, 'বাড়ীতে সবই আছে দ্যাখ।' সত্যিই তাই। মিষ্টি ইত্যাদি সবই রয়েছে দেখলাম। এরপর ওনাকে ফোঁটা দিলাম। জীবনকৃষ্ণ বললেন, 'ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ওর আর একটা

নাম হল গৌর।'....ঘুম ভাঙল।

ব্যাখ্যা ঃ চিত্রগুপ্ত– যে গোপনে সমস্ত কাজের ছবি ধরে রাখে, দেহস্থ চৈতন্য (consciousness), তাই গৌর। স্বর্গ থেকে এল– সহস্রার থেকে চৈতন্যের অবতরণ ঘটে। দেহী যদি এই দেহস্থ চৈতন্যের প্রকাশকে বরণ করেন এবং জীবনে মেনে চলেন তাহলে তার মনুষ্যত্ব বা চেতনার আর অপমৃত্যু ঘটবে না, যমদুয়ারে পড়বে কাঁটা। শ্রীজীবনকৃষ্ণ সব জানেন–তিনি এই সমস্ত প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রাতা।

নিগমের সাধনে অর্থাৎ সাধনের দ্বিতীয় পর্যায়ে (প্রথম পর্যায়ে আগমের সাধন) দেহী চেতনা বা বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধকে বরণ করেন, তাই ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া। এই অবস্থায় দেহী ভক্ত, গোপী বা নারী। তাই মেয়েরা ফোঁটা দেয়।

সবিতা ঘোষ
চারুপল্লী

কী শোনাব

সেটা ১৯৮৮ সালের ৮ই পৌষ। শান্তিনিকেতনের মেলা দেখে ফিরছি। মেলা ঘুরে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। ফেরার পথে রিক্সায় চোখ বোজা মাত্র স্বপ্ন শুরু হল। শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, 'স্নেহময় যে তোদের অনেক কিছু খাওয়ালো, কই তুই ওকে যে কিছু খাওয়ালি না!' বললাম, 'আপনি বলে দিন কী খাওয়াব, কী দেব স্নেহময়দাকে। আপনি যা আদেশ করবেন আমি তাই দেব।' 'পারবি দিতে ?'– প্রশ্ন করলেন তিনি। আমি বললাম, 'যদি তা সামর্থ্যের মধ্যে হয়, নিশ্চয় দেব।' এবার তিনি হেসে উঠলেন। বললেন, 'শোন, আমি তোকে এখন যা দেব সেটাই স্নেহময়কে দিবি। ওকে শোনাবি, বুঝলি ?' উনি অদৃশ্য হলেন। তারপর আমাকে একটি স্বপ্ন দিতে লাগলেন। যেন এতক্ষণ এই স্বপ্নের ভূমিকা স্বপ্ন হয়ে গেল। এবার স্বপ্ন দেখছি–একটি ছোট মেয়ে শূণ্য হতে নেমে এল। বলল, 'আমাকে স্নেহময় ও সুকুমারের কাছে নিয়ে যেতে পারবে ?' উত্তর দিলাম, 'কেন পারব না!' ওরা আমাকে খুব ভালবাসে। প্রতিদিনই তো দেখা হয়। আগে বল, তোমার নাম কি ?' ও বলল, 'বৈশাখী মণ্ডল'। আচ্ছা, 'তোমরা কয় বোন ?' বলল 'তিন বোন।' আরে কী মিল। আমার নামও বৈশাখী, আমরাও তিন বোন। ওকে ভীষণ ভাল লাগছিল। জিজ্ঞেস করলাম, 'এবার বল স্নেহময়দা ও সুকুমারদার কাছে কী জন্য যাবে ?' ও বলল, 'আমাকে এক বৃদ্ধ পাঠিয়েছেন। বললেন, তুই ওদের কাছে যা তাহলে তোর কোন দুঃখ থাকবে না। হঠাৎ দেখি জীবনকৃষ্ণ নাচতে নাচতে ওখানে উপস্থিত। বললেন, 'আমিই সেই বৃদ্ধ যে তোমাকে পাঠিয়েছিল।' স্বপ্ন ভেঙে গেল।

কী দেব আমি কী শোনাব–এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় প্রায় সকল মানুষকেই। আমাদের মত সাধারণ মানুষেরও কি জগতকে শোনাবার মত নিজস্ব কিছু থাকে ?

আমরা এখন জোর গলায় বলতে পারি, হ্যাঁ থাকে। আর তা'হল আমাদের মধ্যে ভগবানের যে লীলা হয় সেই ভাগবত কাহিনী।

নিজের অনুভূতি বলবো আর অপরের অনুভূতি শুনবো। এই প্রসঙ্গে একটা স্থূল দর্শনের কথা বলি। সেদিন বিকেলে বাড়ীর সামনের মাঠে খেলছি। কিছুক্ষণ পর স্নেহময়দা এলেন। বললেন, কিছু স্বপ্ন আছে নাকি ? বললাম, 'আছে, তবে একটু পরে যাচ্ছি।' স্নেহময়দা পাশের বাড়ীতে সুকুমারদার সঙ্গে গল্প করতে গেল। বলল, 'বেশী দেরী করিস না।' খেলতে খেলতে ধমকানি খেয়ে চম্‌কে উঠলাম। দেখি হাত তিরিশেক দূরে স্বয়ং জীবনকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে। খালি গায়ে, ধুতি পরে। বললেন, তোকে স্নেহময় অনেকক্ষণ ডেকে গেছে। আর খেলতে হবে না যা! ওর কাছে গিয়ে আমার সম্বন্ধে আলোচনা করগে। ভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে স্নেহময়দার কাছে গিয়ে হাজির হলাম। এই স্থূল দর্শনের গুরুত্ব তখন ঠিক বুঝিনি তবে যত দিন যাচ্ছে তত বেশী করে উপলব্ধি করতে পারছি।

বৈশাখী মণ্ডল
চারুপল্লী

কৃপার স্বরূপ

গত বছর একদিন পাঠ শুনতে শুনতে মায়ের কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম—বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টির প্রতিটি ফোঁটার কোনটিতে রামকৃষ্ণ কোনটিতে জীবনকৃষ্ণ বসে রয়েছেন। জীবনকৃষ্ণ হঠাৎ স্বাভাবিক মাপের হয়ে আমার কাছে এসে বললেন, আমি বৃষ্টির মধ্যে থাকি, বাতাসের মধ্যে থাকি আবার মানুষের ভিতরও থাকি। স্বপ্ন ভেঙে গেল।

(বৃষ্টি—কৃপাবৃষ্টি। এ যুগে কোন মানুষ যদি রামকৃষ্ণ বা জীবনকৃষ্ণকে অন্তরে দর্শন করেন তাহলে বলা যাবে যে তিনি ভগবৎ কৃপা লাভ করেছেন। সবের ভিতর আছি- আত্মিক জগতের সমস্ত কিছু দর্শনের মূলে আছেন এই মানবব্রহ্ম।)

একদিন বিকালে পাঠের সময় মাধাই আর আমি খেলছিলাম। একটি ফড়িং ধরে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি ঐটুকু ছোট্ট জীবনকৃষ্ণের মুখ, ফড়িংয়ের মুখ নয়। ফড়িংটিকে ছেড়ে দিলাম।

(খেলতে খেলতেও স্থূলে দর্শন হচ্ছে, দেহ যোগযুক্ত হচ্ছে। এ হ'ল আত্মিক নিয়ন্ত্রণ।)

আর একদিন (২২-৪-১৯৯২) অদ্ভুত এক স্বপ্ন হ'ল। সেদিন অন্য লোকের বাড়ীতে শুয়েছি। মাথার কাছে তাদেরই একটা বড় টর্চ ছিল। স্বপ্নে দেখছি—একটা বড় পাশ বালিশের ওপর একটা টর্চ রাখা। বালিশটি দু'ফাঁক হয়ে গেল। কে যেন বলল, 'এর মানে হ'ল তোর আধার খুব বড় কিন্তু বিষয়ীর সংস্পর্শে এলে তা কেটে যাবে।' আমি

ঐ কথা শুনে কাঁদতে লাগলাম। তখন একজন অদৃশ্য মানুষ এসে টর্চটা সরিয়ে রেখে বালিশটাকে জোড়া লাগিয়ে দিলেন। ঘুম ভাঙল।

(দ্রষ্টা এত অল্প বয়সে কী জাতীয় নির্দেশ পাচ্ছে এবং কিভাবে দর্শনের বিশ্লেষণ নিজের স্বপ্নের মধ্যেই জেগে উঠেছে তা লক্ষ্য করার মত।)

টেপে ২৬ কার্তিকের অনুষ্ঠান শুনতে শুনতে হঠাৎ দর্শন হ'ল– আমাদের বাড়ীতে প্রচুর ফুল ফুটেছে। জীবনকৃষ্ণ ঐ ফুল তুলে সাজিতে ভরছেন। উনি যত তুলছেন গাছে ফুলের সংখ্যা ততই বেড়ে যাচ্ছে। বললাম, 'আপনি ফুল তুলছেন কেন ?' উনি বললেন, 'তুই কি ঘরের মালিক নাকি ?'...ঘুম ভাঙল।

(ঘর–দেহ। মালিক নাকি ? –দেহেতে ভগবানের উদয় হলে দেহটি তাঁর লীলাভূমি হয়। দেহী বোঝেন এ দেহ ভগবানের, তাঁর নয়। ফুল–ব্যষ্টিতে প্রাণশক্তির শ্রেষ্ঠ বিকাশ, আত্মিক দর্শনসমূহ। ফুল তুললে বেড়ে যাচ্ছে- আত্মিক অনুভূতির নৈবেদ্য তিনি যতই গ্রহণ করেন (তাঁর ইচ্ছায় জগতে প্রকাশিত হয়ে তাঁর মহিমা প্রচার করে) ততই এই অনুভূতি বেড়ে চলে।

সব্যসাচী ঘোষ
পঞ্চম শ্রেণী

জীবনদীপ

স্বপ্নে দেখছি–স্নেহময়দা বলল, 'সম্প্রতি আমার একটা সুন্দর দর্শন হয়েছে। দেখছি, কাঁচা সোনা দিয়ে তৈরী প্রাণবন্ত জীবনকৃষ্ণ।' ঐ দর্শনের কথা শুনতে শুনতে আমিও ঐ রূপ স্পষ্ট দেখতে পেলাম। কি জ্যোর্তিময় রূপ। তার দেহ যেন ঘামছে আর সমস্ত দেহ হতে সোনা গলে গলে পা বেয়ে নীচের দিকে গড়িয়ে পড়ছে। ঐ দৃশ্য দেখতে দেখতে এত আনন্দ হতে লাগল যে ঘুমই ভেঙে গেল।

ব্যাখ্যা ঃ 'দেখেছি রূপ সাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা।' দ্রষ্টার বাউল মন হৃদয়মাঝে মনের মানুষের (বেদোক্ত হিরন্ময় পুরুষের) রূপটি প্রত্যক্ষ করল। উপলব্ধি করল– 'চাঁদামামা সকলকার মামা।' যুগের পরিবর্তনে দেহস্থ চৈতন্য ক্রিয়াশীল হয়ে উঠছেন, 'অবাঙমনসগোচরম্' ধরা দিচ্ছেন মানুষের বোধের সীমায়। দ্রষ্টা আরও বুঝলেন যে অপরের দর্শন অনুভূতি (ভাগবত) শ্রবণে উদ্দীপনা হয়, অনুভূতি হয়।

আর এক স্বপ্নে দেখছি–পাঠ হচ্ছে। বৈদ্যনাথদা স্নেহময়দাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, এই অপূর্ব সুন্দর জীবনকৃষ্ণ-চর্চা থেকে কেউ যদি পরে সরে যায় তার কি হবে ?' স্নেহময়দা বলল, 'ও কথা থাক।' তখন হঠাৎ আমার সামনে যে দুটি হ্যারিকেন জ্বলছিল তা নিভে গেল। মনে হল ভগবান ঐ প্রশ্নের উত্তর দিলেন এইভাবে যে

জীবনকৃষ্ণ-চর্চা থেকে সরে যাওয়া মানুষের জীবন থেকে আলো নিভে যাবে। ঘুম ভাঙল।

(দুটি হ্যারিকেন–আত্মিক ও ব্যবহারিক এই দুই জগতে পথ চলার আলো।)

বরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়
বল্লভপুর, বীরভূম

গত ৯/৮/১৯৮৭ তারিখে অদ্ভুত একটি স্বপ্ন দেখেছিলাম। দেখলাম– আমার বাবা এসে আমাকে বলছেন, 'আমি তোর বাবা, আমাকে প্রণাম কর।' আমি বললাম, 'আমার বাবা 'হরি' বলে।' তুমি যদি আমার বাবা হও তাহলে 'হরি' বল তো! উনি 'হরি, হরি' বলে উঠলেন। তখন আমি বাবাকে প্রণাম করে জড়িয়ে ধরলাম। গভীর আনন্দে ঘুম ভাঙল।

সুকুমার চ্যাটার্জী
রূপপুর, বীরভূম

'পিরীতি দেখিয়া পড়শী করিবে, তা বিনু সকলি পর'—চণ্ডীদাস। 'পিরীতি মানে প্রকৃষ্ট রীতি–ভগবান, ভগবান করা'–শ্রীজীবনকৃষ্ণ। ভগবৎপ্রেমীর কাছে পিতাও যথার্থ পিতার আসন অধিকার করেন যদি তিনি ভগবৎচর্চা করেন।

সাধের লাউ

স্বপ্নে দেখছি—মা উঠোনে লাউ গাছের বীজ পুঁতল। সঙ্গে সঙ্গে গাছ বেরিয়ে দ্রুত বড় হতে লাগল। বেশ কয়েকটি জালি পড়ল, তিনটি লাউ বেশ বড় হ'ল। সবচেয়ে বড় লাউটি মাচার উপর রয়েছে। বিশাল তার আকৃতি। আমি পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি মেয়েকে গাছটি দেখালাম। তারপর কাছে গিয়ে বড় লাউটির উদ্দেশ্যে হাত জোড় করে বললাম, 'মাসী, তুমি উঠে এসো, ঘরের ভিতর খাটের উপর বিছানায় শোও, তা না হলে মাচাটা ভেঙে যাবে। তাছাড়া আরও তো জালি ধরেছে, সেগুলোর মাচাতে জায়গা হবে না তুমি থাকলে।' অমনি লাউটি উঠে পড়ল। ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। তখন দেখি লাউ নয়, ওতো একজন মহিলা। সাদা কাপড় পরে আছেন। সরু লাল কালো ডুরে কাটা পাড়। পিঠে এলো চুল। উনি খাটে শুয়ে পড়লেন।

বিশাখা চ্যাটার্জী
জামবুনি, বোলপুর

ব্যাখ্যা ঃ মা–আদ্যাশক্তি, দেহ। লাউগাছ–নির্গুণ ব্রহ্ম, যিনি অলক্ষ্যে লতার ন্যায়

দেহকে জড়িয়ে আছেন। অনেক লাউ ফল- নির্গুণের ক্রিয়ার বিভিন্ন পরিণতি-। যেমন আত্মজ্ঞান লাভ, রিপুর প্রশমন, দেহীর যে সব কার্যে প্রবণতা বা ঝোঁক থাকে তাতে অধিকতর দক্ষতা লাভ, ধীর ও নম্র স্বভাব লাভ যা দেহীকে অন্যের নিকট প্রিয় করে তোলে, ইত্যাদি। সবচেয়ে বড় ফলটি হল পরাবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা। মাসী–পরাবিদ্যা–শ্বেতাম্বরা সরস্বতী। হাত জোড় করে বললাম– দেহে ব্রহ্মবিদ্যার প্রকাশকে দ্রষ্টা উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করলেন। মাচা থেকে খাটে এসে শুয়ে পড়লেন–দেহে পরাবিদ্যা নিরাপত্তা লাভ করল, স্থায়ী হ'ল।

দশাঙ্গুলম্

প্রায় বছর চারেক আগে স্বপ্নে দেখছি–হোস্টেলের একটি ছেলে আমাকে বলল, 'আমি তোকে স্বপ্নে দেখেছি।' বললাম, 'কী দেখেছিস বল না!' ও বলল, 'দেখলাম, তুই জীবনকৃষ্ণ হয়ে গেছিস। আর তোর দুই দাতের দশটি আঙুল ছোট ছোট দশজন জীবনকৃষ্ণ হয়ে গেছে।' শুনে চমকে উঠলাম। ঘুম ভাঙল।

সুকুমার চ্যাটার্জী
রূপপুর, বীরভূম

ব্যাখ্যা ঃ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৩।১৪) বলা হয়েছে–সেই পুরুষের (পূর্ণ স্বরূপের) অসংখ্য মস্তক, চক্ষু ও পদ। তিনি সর্বতোভাবে সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত থাকিয়া বিশ্বভুবন অতিক্রম করিয়া 'দশাঙ্গুলি' অর্থাৎ অনন্ত অসীমে অবস্থিত। শ্রীজীবনকৃষ্ণ অন্যের অন্তরে ফুটে উঠে ও তাকে জীবনকৃষ্ণে পরিবর্তিত করে নিয়ে উপনিষদ্ কথিত ব্রহ্মের গুণাবলী অর্জন করেছেন।

বুদ্‌বুদ্

আমি জীবনকৃষ্ণকে স্বপ্নে বহুবার দেখেছি। বিশেষ করে তাঁকে দেখার পর থেকেই নানারকম সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছি। জীবনকৃষ্ণকে প্রথমে যে স্বপ্নে দেখেছিলাম সেটি এখানে লিখে জানালাম। দেখছি–আমার সামনে একটা সমুদ্র। সমুদ্রের জল শান্ত। হঠাৎ ঐ জলে মার্বেলের মত ছোট্ট কি একটা পড়ল। নীচ থেকে একটা বুদ্‌বুদ্ উঠল। পরে ঐ জায়গায় দেখছি একটা পদ্মফুল আর সেই পদ্মের উপর ভুবন ভোলানো রূপ নিয়ে শ্রীজীবনকৃষ্ণ বসে রয়েছেন। ঘুম ভাঙল।

উজ্জ্বল মাহারা
সুরুল, শ্রীনিকেতন

ব্যাখ্যা ঃ সমুদ্র–সহস্রার, ব্রহ্মের প্রকাশস্থল–নারায়ণের শয্যা ক্ষিরোদ সাগর। ছোট্ট কি একটা পড়ল সমুদ্রে–সহস্রারে মন যাওয়ায় ক্ষুদ্র-আমির নাশ হ'ল, দেহবুদ্ধি ঘুচল।

বুদ্‌বুদ্–ভগবৎ কৃপা স্পর্শে মহাবায়ু জাগরণে সহস্রারে বুদ্‌বুদের ন্যায় আত্মিক অবস্থার সৃষ্টি হয় যাতে ঈশ্বরবস্তু সহজেই প্রতিফলিত হতে পারে। It is but a bubble of getting God within one's own body (Religion and Realisation)। পদ্মের উপর জীবনকৃষ্ণ — বিকশিত ব্রহ্ম, সগুণ ব্রহ্ম। প্রশ্ন উপনিষদ বলেছেন–'যে পুরুষকে আশ্রয় করিয়া ষোড়শ কলা (অবয়ব) উৎপন্ন হয় (অর্থাৎ যোগৈশ্বর্য প্রকাশ পায়) তিনি শরীরের অভ্যন্তরেই হৃৎপদ্মে আছেন।' সম্ভবত এই তত্ত্ব থেকেই শ্রীকৃষ্ণের ষোলশ সখী নিয়ে লীলা করার রূপক সৃষ্টি হয়েছে।

রাধাযন্ত্র

স্বপ্নে দেখছি–একটি পুকুরে একটি স্বচ্ছ পলিথিনের নল জাতীয় পদার্থ ভাসছিল। সেটি তুলে পাড়ে ছুঁড়ে দিলাম। সেটির ভাঁজ খুলে গিয়ে একটি মাছ হয়ে গেল, মনে হচ্ছে শোল মাছ তবে তার মুখ ও লেজ বোঝা যাচ্ছে না, দেখতে একটা নলের মতই। এক প্রান্তে তিনটি আঙুলের ডগার মত দেখতে মাংসপিণ্ড গজিয়েছে। তার দুটি একেবারে গায়ে গায়ে, তৃতীয়টি একটু পাশে। এদের প্রত্যেকের অগ্রভাগ থেকে আবার লকলকে সাপের জীভ বেরোচ্ছে। আমি অবাক হয়ে ওগুলো দেখছি। পাশে এক ভদ্রলোক বসে আছেন দেখতে ঠিক জীবনকৃষ্ণের মত। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এগুলো কি ?' উনি বললেন, 'রাধাযন্ত্র'। ঘুম ভাঙল।

সবিতা ঘোষ
চারুপল্লী

বিশ্লেষণ ঃ স্বচ্ছ– রঙ-হীন অর্থাৎ গুণাতীত। স্বচ্ছ পলিথিন—ত্রিগুণাতীত ঈশ্বর। শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরকে বস্তু বলেছেন, কেন না তাঁকে চোখে দেখা যায়। ভাঁজ খুলে গেল--প্রকাশ হল, unfoldment। সংস্কৃত শব্দ শকুল (মানে শোল মাছ) থেকে বাংলায় শোল কথাটির উদ্ভব। শকুল মানে শকল বা আঁশযুক্ত মাছ। আঁশের যোগাঙ্গ হল দেহজ্ঞান। শোল মাছ হয়ে গেল—দেহজ্ঞান বা অহং যুক্ত হয়ে দেহে আত্মার আবদ্ধীকরণ ঘটে। দেখতে একটা নলের মত–মানবদেহের আত্মিক বৈশিষ্ট্য বোঝাতে নলাকৃতি মাছ। পাইপ ফিস্ বা নল মাছের বৈশিষ্ট্য হ'ল স্ত্রী মাছ গর্ভের ডিম সঞ্চারিত করে দেয় পুরুষ মাছের তলপেটের চামড়ার থলিতে। পুরুষ মাছ গর্ভ ধারণ করে যতদিন না ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। তেমনি বলা হয় মানুষের মধ্যে নারীদের আত্মিক উন্নতি ষষ্ঠভূমির উপরে ওঠে না। ষষ্ঠভূমি মায়ার এলাকার মধ্যে, তাই গর্ভবাসের সঙ্গে তুলনীয়। 'সপ্তম দ্বার পারে বৈঠত রাজা তাহা কাঁহা যাওবি নারী।' তাই আত্মা-সাক্ষাৎকারের পর বেদান্তের সাধনে বিশ্ব বীজবৎ দর্শনের প্রতীক শালগ্রাম শিলা পূজায় নারীদের অধিকার নেই বলা হয়। কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে সপ্তমভূমিতে আত্মা-সাক্ষাৎকার (আত্মাসন্তান

লাভ) সম্ভব। তিনটি মাংস পিণ্ডই যেন সাপের ফণা– সাপ কুণ্ডলিনী বা অন্তর্মুখী প্রাণশক্তির প্রতীক। এই প্রাণশক্তি ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার পথ ধরে ক্রিয়াশীল হয়। এই হ'ল ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধির দ্বার (প্রকাশের পথ) বা রাধাযন্ত্র।

ব্যষ্টির সাধনে, প্রাণশক্তির ষষ্ঠভূমি থেকে সপ্তমভূমি যাবার পথকে বলে রাধাযন্ত্র। সপ্তমভূমিতে আত্মা-সাক্ষাৎকার হয় (আত্মাসন্তান জাত হয়), যার প্রমাণ ফুটে ওঠে জগতের বহু মানুষের অন্তরে। এ যেন ঠিক মাতৃগর্ভ থেকে সন্তানের ভূমিষ্ঠ হওয়া। তাই ষষ্ঠভূমিতে রাধাযন্ত্র দর্শন হয়।

কথামৃতে উল্লেখ আছে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, শ্রীকৃষ্ণ রাধাযন্ত্র কুড়িয়ে পেয়ে সাধন করেছিল–অর্থাৎ এই পথ আপনা হতে উন্মুক্ত না হলে সাধন ভজন হয় না, এমন কি সাধক শ্রেষ্ঠের পক্ষেও এই কথা সত্য।

ভক্তি-বিবেক

এখানে একটি বিশেষ স্বপ্নের কথা উল্লেখ করি। এই স্বপ্ন থেকে আমি বুঝেছিলাম যে স্বপ্নে আমরা যে সব মানুষকে দেখি অনেক ক্ষেত্রে তা স্বপ্নের মাধ্যমে আত্মজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনে প্রতীকি উপস্থাপন মাত্র।

দেখছি–একটি ফটো বাঁধানোর দোকানে গিয়ে বললাম, 'আমার দুটি ফটো বাঁধিয়ে দিতে পারবে ?' লোকটি বলল, 'কী ফটো ?' বললাম, 'ভক্তি আর বিবেক।' তখন ও কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'পারব। পরশু আসুন।' নির্দিষ্ট দিনে ঐ দোকানে যাচ্ছি, এমন সময় পথে অনেক লোক আমাকে ঘিরে ধরল। বলল, 'আপনি আমাদের একটু জলের ব্যবস্থা করে দিন।' আমি বললাম, 'আমি কি করে ব্যবস্থা করব।' ওরা বলল, 'না, আপনিই পারবেন।' তখন হঠাৎ দূরে একটা ট্যাপ কল চোখে পড়ল। বললাম, 'ঐ দেখুন কল। ওখানে এক্ষুণি জল পড়বে।' বলামাত্র কল থেকে জল পড়তে লাগল। ওরা জল নিতে ছুটল। এরপর দোকানে ঢুকলাম। ভদ্রলোক দুটি বাঁধানো ফটো আমার হাতে দিল। একটি রামকৃষ্ণের, অপরটি বিবেকানন্দের। ভাবছি এই-ই কি ভক্তি আর বিবেকের ফটো! একরাশ বিস্ময় নিয়ে ঘুম ভাঙল।

রামকৃষ্ণ ভদ্র
সুপুর, বীরভূম

(রামকৃষ্ণ ভক্তির প্রতীক এবং বিবেকানন্দ বিবেকের প্রতীক। ভক্তি স্থায়ী হয় (বাঁধানো) যখন সাধক অনেক মানুষকে ভগবানের কথা বলেন, ভগবৎপ্রেমের শাশ্বত তৃষ্ণা মেটানোর হদিস দেখান।)

পূর্ণাৎ পূর্ণম্

উপনিষদ বলেছেন–পূর্ণ থেকে যা আসে তা পূর্ণ আর যা অবশিষ্ট থাকে তাও পূর্ণ। পূর্ণ বা ব্রহ্ম থেকেই তো সকলের জন্ম। তাহলে সব মানুষের মধ্যে ব্রহ্মত্বের প্রকাশ আমরা প্রত্যক্ষ করি না কেন ? স্বপ্ন দর্শনকে ভিত্তি করে এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করা যাক্। প্রথমে শ্রীমতী গায়ত্রী ঘোষের (চারুপল্লী) একটি স্বপ্ন উল্লেখ করি।

'দেখছি–আমার দেওর পূর্ণর একটি সন্তান হ'ল। ছেলেটি জন্মেই উঠে বসল। মাথায় কোন চুল নেই, বড় বড় চোখ। তখন মনে হ'ল এ নিশ্চয়ই কোন দেবতা, সাধারণ মানুষ নয়। ঘুম ভাঙলে বুঝতে পারলাম স্বপ্নে দেখা শিশুটি স্বয়ং শ্রীজীবনকৃষ্ণ।

এই স্বপ্ন থেকে জানা গেল যে পূর্ণ থেকে আসা ব্যাপারটি শ্রীভগবানের ষোল আনা প্রসন্নতা লাভে দেহাভ্যন্তরে বিশেষ রূপান্তর ও দেহাতীতে তার প্রকাশ। আগমের সাধনের চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে স্থিত সমাধিতে নির্গুণে (নির্গুণ ব্রহ্মে) লয় হয়ে যাবার পর দেহে পুনরায় যদি দেহীর বোধ ফিরে আসে (নিত্যসিদ্ধের হয়)–সেই হ'ল পূর্ণ থেকে আসা। তখনই সেই মানুষের মন ও অহংতত্ত্বের ষোল আনা লয় হয়ে যায়, তার মানুষীতনুর মধ্যে জন্ম নেয় নতুন এক মানুষ–মানুষ-রতন–শ্রীভগবান। তিনি আর বেশীদিন গোপন (গর্ভবাসে) থাকতে পারেন না–জন্মলাভ করেন জগতের অসংখ্য মানুষের অন্তরে। তাঁর রূপ অন্তরে দেখে সর্বধর্মের সর্বশ্রেণীর মানুষ তাঁর ব্রহ্মত্বের প্রমাণ দেয়। 'পূর্ণ তিনিই যিনি নিজের জীবন্তরূপের চিন্ময় মূর্তিতে মনুষ্যজাতির অন্তর পূর্ণ করেন।' শ্রীজীবনকৃষ্ণ এই রকম একজন মানুষ। স্বপ্নদ্রষ্টার মত অনেকের অনুভূতিতে এই সত্য প্রকাশিত হচ্ছে।

এই মানব-ব্রহ্মকে যারা দর্শন করেন, তদ্গতচিত্ত হ'ন, মনের নাশ হয়ে তাদের দ্বিতীয় স্তরের পূর্ণত্ব বা ব্রহ্মত্ব লাভ হয়। দেহেতে ভাগবতের ধারণা হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীমতী ছায়ারাণী পালের (চারুপল্লী) একটি স্বপ্ন উল্লেখ করা যেতে পারে।

দেখছি–একটী পুকুরে অনেক রাজহাঁস খেলা করছে। দেখতে খুব সুন্দর লাগছে। কাছে গেলাম। তখন দেখি রাজহাঁস নেই। পুকুরে প্রচুর পদ্ম ফুটে রয়েছে। নেমে তুলতে গেলাম কিন্তু ফুলগুলো সরে সরে গেল। তুলতে পারলাম না। তখন আমার মেয়ে সুতপা এল। ও বলল, 'দাঁড়াও ফুল এনে দিচ্ছি।' এবার দেখছি পুকুরে একটি মাত্র পদ্মফুল রয়েছে। সেটি তুলতে গিয়ে সুতপা ডুবে গেল। অনেকে পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। কেউ কিছু করল না। আমি কাঁদতে লাগলাম। তখন জীবনকৃষ্ণ কোলে করে সুতপাকে নিয়ে এসে বললেন, 'তোর মেয়েকে নে।' এই বলে আমার কোলে ফেলে দিলেন। কিন্তু পিছলে পড়ে গেল। অমনি উনি ওকে ধরে নিলেন। দ্বিতীয়বারও তাই হ'ল। ভয়ে আর

নিতে চাইলাম না। বললাম, ঠাকুর তুমি ওকে বাড়ী পৌঁছে দাও। তখন সেখানে হঠাৎ ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দেখা গেল। তিনি কাছে এসে বললেন, 'মেয়েকে নিবি না ? বলিস কি রে ?' এই বলে জীবনকৃষ্ণের কোল থেকে সুতপাকে তুলে আমার কোলে দিলেন। এবার আর পড়ে গেল না। কিন্তু মেয়ের দিকে তাকিয়ে দেখি, ও তো সুতপা নয়, ও যে জীবনকৃষ্ণ!

রাজহাঁস–পরমহংস, ব্রহ্মবিদ। দ্রষ্টার অন্তরে ব্রহ্মবিদ হওয়ার কামনা ফুটে উঠল। কাছে গেলে দেখেন পদ্ম– এ বিষয়ে কিছু জানার পর বুঝলেন যে ব্রহ্মবিদ হতে গেলে সহস্রার পদ্ম বিকশিত হওয়া চাই, দর্শন-অনুভূতি চাই, শাস্ত্র পড়ে বা লোকমুখে শুনে হয় না। সুতপা–ভাগবতীতনু বা কারণশরীর। এই কারণশরীর না জাগলে সাধন ভজন হয় না, দর্শন-অনুভূতি হয় না (ফুল তোলা যায় না)। একটি পদ্ম- ব্রহ্ম, পরম ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মবিদ) He is brahaman because He exists alone-Swami Vivekananda। ডুবে গেলে জীবনকৃষ্ণ কোলে করে তুলে নিয়ে এলেন - নির্গুণে লয় হতে যাচ্ছিল কিন্তু তা হলে দেহ টুটে যেত (জীবকটি মানুষ বলে)। মানব-ব্রহ্ম জীবনকৃষ্ণের আশ্রয় লাভে দেহ রক্ষা পেল। পিছলে পড়ে গেল–ব্রহ্মলীন অবস্থা থেকে মনের অবতরণের পর প্রাপ্ত উচ্চ আত্মিক অবস্থা দেহ ধারণ করতে পারছে না। পরে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ এলে অর্থাৎ অবতারত্ব লাভ হলে (আধার বড় হলে) তা ধারণে সক্ষম হলেন। সুতপা নয় জীবনকৃষ্ণ–পূর্ণ থেকে যা আসে তাও পূর্ণ, ব্রহ্ম। তবে এই ব্রহ্মত্ব দ্রষ্টার কারণ শরীরে বর্তাল—এ হ'ল দ্বিতীয় স্তরের ব্রহ্মত্ব লাভ। এই অবস্থা দেহে স্থিতি লাভ করলে দেহী দেখেন তাঁকে ঘিরে যে ছোট্ট জগত সেটি ব্রহ্মের একটি পরিবার। তাঁর অন্তর বলে— আমি কিছু চাই না, জীবনে যা পেয়েছি জীবন তাতে পরিপূর্ণ।

——— ঃ ———

- ওরে জীবনে বেঁচে থাকতে হলে খেতে হবে আর খেতে হলেই টাকা চাই। ভিক্ষাতেও আসক্তি আছে। সৎভাবে খেটে খেয়ে জীবনযাপনই সবচেয়ে ভাল। আমার জীবনটার দিকে চেয়ে দ্যাখ না।
- দেখ বাবা, ভাল স্বপ্ন দেখা মানে এই নয় যে তোমার মন খুব উঁচু অবস্থায় আছে। বরং ঠাকুর আমার এমনি কৃপাময় যে মন নিম্নভূমিতে থাকলে ভাল স্বপ্ন দিয়ে মনটিকে উপরে তুলে দেন। (জনৈকের স্বপ্নে পাওয়া বাণী)
- চেষ্টা করে ইন্দ্রিয় সংযম হয় না। চেষ্টার দ্বারা কাম ক্রোধাদি সাময়িক প্রশমিত হলেও পরে তা আবার জাগে। এই দেহে তো ভগবান। যতই তার প্রকাশ হবে ততই জীবত্ব কমে যাবে। জীবই শিবে পরিবর্তিত হয়। .....আপনা আপনি যদি হলো তো হোল, নতুবা, হাজার চেষ্টা করেও হবে না। তবে সময় নেবে। এক্ষুণি চাই বললে হবে না।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ

শ্রদ্ধাঞ্জলি

এই অধ্যায়ে প্রয়াত শ্রীজীতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুধাংশুভূষণ দাস ও শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত হল শ্রদ্ধার্ঘ।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় স্মরণে

(১)

লহ প্রণাম

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আত্মিক জগতের অবিস্মরণীয় এক পুরুষ। দীর্ঘ বারো বছর তিনি ভগবান শ্রীজীবনকৃষ্ণের পদতলে বসে আত্মবিদ্যার গূঢ় রহস্য সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করার সুযোগ পেয়েছেন। সেই শিক্ষা তার পরবর্তী জীবনে মূর্ত হয়ে উঠেছে। 'আমার এই ব্রহ্মত্ব জগতের শিশু-বৃদ্ধ নরনারী সকলে লাভ করুক'—শ্রীজীবনকৃষ্ণের এই একমাত্র কামনার বাস্তবায়িত রূপটির অনুধ্যান করতে করতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সর্বশক্তি দিয়ে শ্রীজীবনকৃষ্ণের মহিমার কথা তিনি বলে গেছেন। শ্রীজীবনকৃষ্ণ বিরচিত 'ধর্ম ও অনুভূতি' গ্রন্থ প্রকাশিত হবার পর তাঁর ইচ্ছায় বিভিন্ন জায়গায় এই বই পাঠ ও পাঠচক্র সৃষ্টি এক আন্দোলনের রূপ নিয়েছিল আর শ্রীজীবনকৃষ্ণ এই আন্দোলনের পুরোধা পুরুষ হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন তার আদরের জিতুকে। তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যেখানেই পাঠ হবে সূচনাকালে প্রথম তিনদিন পাঠ করবে জিতু।

চাকরী জীবন থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি কলকাতা ছেড়ে শ্রীনিকেতনে বাড়ী কিনে বসবাস করতে শুরু করলেন। শুরু হল নতুন এক জীবন। ১৯৮৩-তে দু'জন যুবককে নিয়ে সূচনা করলেন শ্রীনিকেতন পাঠচক্রের। মাত্র এক বছরের মধ্যে এই পাঠচক্রে আশ্রয় নিল বহু মুমুক্ষু মানুষ। স্বপ্ন নির্দেশ পেয়ে ঐ বছরেই প্রকাশ করলেন হাতে লেখা 'মানিক' পত্রিকা। তাঁর যে দু'টি অক্ষয় কীর্তির জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন তার মধ্যে 'মানিক' পত্রিকার প্রকাশ একটি। অপরটি হল শ্রীজীবনকৃষ্ণের মুখ নিঃসৃত অমৃত বাণী চয়ন করে লেখা 'জীবনসৈকতে'। একটিতে শ্রীজীবনকৃষ্ণের স্থূলদেহ থাকাকালীন উদ্ঘাটিত সত্য বিধৃত, অপরটিতে অতনু শ্রীজীবনকৃষ্ণের অগ্রগতির বহু সাক্ষ্য পরিচয় সংকলিত। ধরার মানুষ ভগবান হয়–একথা বলার আধিকারিক পুরুষ ছিলেন তিনি। একবার শ্রীদর্পনারায়ণ পাল স্বপ্নে দেখলেন তিনি শ্রীজীবনকৃষ্ণকে প্রশ্ন করছেন–আপনি যে ভগবান তা আমি বুঝেছি কিন্তু অন্য মানুষকে সেকথা কি করে বোঝাই ? উনি বললেন, 'তোকে দেখে মানুষ বুঝবে যে আমি ভগবান।' দ্রষ্টা ভাবছেন তা কেমন করে সম্ভব। তখন তার সামনে শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের জ্যোতির্ময় রূপ ফুটে উঠল। তিনি হাসছেন আর মুখমণ্ডল থেকে স্নিগ্ধ জ্যোতি বের হচ্ছে। দ্রষ্টার অন্তর তীব্র আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠল; তিনি উপলব্ধি করলেন, সত্যিই তো জিতেনবাবুকে দেখে মানুষ খুব সহজেই বুঝতে পারবে যে শ্রীজীবনকৃষ্ণ ভগবান।

এই অঞ্চলের অসংখ্য মানুষের হৃদয়ে চির শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর স্ত্রী। এ যুগে এমন দম্পতি অতি বিরল। জিতেন্দ্রনাথ

চট্টোপাধ্যায়ের স্থূল দেহাবসানের একদিন পর যখন ওনার ধৈর্য্যময়ী মহিয়সী স্ত্রী বললেন, 'সবই শ্রীজীবনকৃষ্ণের ইচ্ছা বলেই জানি, আর এও জানি তিনি শুধুই মঙ্গলময়', শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে যে কোন মানুষের অন্তর আপনা হতে প্রণত হয় ঐ অসাধারণ নারীর শ্রীচরণে।

গত ২৭শে বৈশাখ, ১৩৯৬, বুধবার এই অঞ্চলের জীবনকৃষ্ণ-চর্চার উৎস পুরুষ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মরদেহ ত্যাগ করেন। আমরা সকলে গভীর শোকে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু শ্রীজীবনকৃষ্ণের কৃপায় বিভিন্ন স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে আমরা উপলব্ধি করতে পারলাম যে তাঁর মৃত্যুহীন প্রাণ আমাদের ত্যাগ করেনি। তিনি আমাদের সঙ্গেই আছেন। তাই শ্রীধর ঘোষ দেখলেন–জ্যাঠামশাই বলছেন, '৭ই জ্যৈষ্ঠের অনুষ্ঠান দেখতে এলাম। এবার আমি বেশীক্ষণ তোমাদের কাছে থাকতে পাব বলে কাছাকাছি যে নতুন ট্যুরিস্ট লজ হয়েছে সেখানে উঠেছি।' দ্রষ্টা বললেন, 'আপনি যে মারা গেছেন শুনলাম।' উনি খুব এক চোট হেসে বললেন, 'এই তো বেঁচে রয়েছি; দেখতেই পাচ্ছ। বল, তোমাদের সব স্বপ্ন শুনি।' দ্রষ্টা স্বপ্ন বলছেন আর উনি আনন্দে 'আহা! আহা!' বলতে লাগলেন। আবার সন্ধ্যা বাগ্দী স্বপ্নে দেখলেন–"জামবুনি যাওয়ার পথে জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে দেখা। আমি ওনাকে দেখে দাঁড়িয়ে গেলাম। উনি বললেন, 'কিছু বলবে মা ?' বললাম, 'আপনি জ্যাঠামশায় না ?' উনি হেসে বললেন, 'হ্যাঁ'। আমি বললাম, 'আপনি মারা গেছেন শুনেছি যে।' উনি হাসতে লাগলেন। বললেন, 'এই তো বেঁচে রয়েছি দেখছো। আচ্ছা মা, তুমি এর মধ্যে কিছু স্বপ্ন দেখেছো ? 'পাঠে ঠিকমত যাও তো ?' আমি বললাম, 'পাড়ার লোকেরা নানারকম ঠাট্টা করে, তাই পাঠে যাই না। স্বপ্নও এখন কম হয়।' উনি বললেন, 'লোকের কথা কানে নিও না মা, যে জিনিষ পেয়েছ তা হেলায় হারিও না। যাকে তাকে স্বপ্নের কথা বলতে যেও না, তুমি স্বপ্ন দেখলে স্নেহময়কে গিয়ে বোলো। মাঝে মাঝে পাঠে যেও।' আমি ওনাকে প্রণাম করলাম, উনিও আমায় আশীর্বাদ করলেন। ঘুম ভাঙল।"

হে প্রিয় শুধু স্মৃতির মণিকোঠায় নয়, এমনিভাবে অন্তরে রূপ ধারণ করে জেগে উঠে আমাদেরকে জীবনকৃষ্ণ-চর্চায় উজ্জীবিত কর। তুমি আমাদের জীবনের ধ্রুবতারা চিনিয়ে দিয়েছ, তাই আমাদের অন্তরের ধ্রুবলোকে তোমার স্থান। একবার বিশাখা চট্টোপাধ্যায় স্বপ্নে দেখেছিলেন, জিতেনবাবুর প্রতিটি পেশী 'জয় জীবনকৃষ্ণ' বলে স্পন্দিত হচ্ছে, প্রতিটি রক্ত কণা জীবনকৃষ্ণ নাম জপতে জপতে দেহের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে। আবার অস্থির অভ্যন্তর ভাগ থেকেও অনুরণিত হতে শোনা যাচ্ছে জীবনকৃষ্ণ নাম। হে মহাপ্রেমিক, তোমার জীবনকৃষ্ণ প্রেম আদর্শ হিসাবে হৃদয়ে চির সমুজ্জ্বল থেকে আমাদের পথ দেখাক, তুমি কৃপা করে আমাদের প্রণাম গ্রহণ কর।

(২)

শ্রীজীতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা ঃ—

১৯৫৫ সালের ১২ই এপ্রিল, মঙ্গলবার, শ্রীজীবনকৃষ্ণের ঘরে তাঁর প্রথম আগমন ঘটে। ১৬ই এপ্রিল শ্রীজীবনকৃষ্ণকে প্রণাম করার সময় স্থূলে হিরন্ময় মূর্তি দর্শন করেন। এর ঠিক বারো বছর আগে উনি স্বপ্নে শ্রীজীবনকৃষ্ণকে দেখেছিলেন। স্বপ্নটি ছিল এই রকম, যে উনি বিছানায় শুয়ে ঘুমোচ্ছেন। শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুস্কিল আসান বেশে (কালো আলখাল্লা পরিহিত মুসলিম ফকিরের বেশ) রাস্তা থেকে জানলা দিয়ে কাঁকড় ছুঁড়ে মারছেন, ওনার ঘুম ভাঙাবার উদ্দেশ্যে। ওনার ঘুম ভাঙল। দেখলেন, মুস্কিল আসান প্রসন্ন মুখে ওনার দিকে তাকিয়ে আছেন। ঘুম ভেঙে গেল।

জিতেনবাবুর পরবর্তী সমগ্র জীবনে জাগ্রত চৈতন্যের উজ্জ্বল প্রকাশ প্রত্যক্ষ করেছেন প্রায় সকলেই যারা তার সংস্পর্শে আসার সুযোগ লাভ করেছেন। প্রথম কয়েকদিন জীবনকৃষ্ণের কাছে আসার পর একদিন জিতেনবাবু হাত জোড় করে জীবনকৃষ্ণকে বললেন, 'বাবা, আমি অফিসে গিয়ে ঠিকমত কাজ করতে পারছি না। সব ভুল হয়ে যাচ্ছে। চোখের সামনে শুধু আপনার রূপ ভেসে উঠছে। ঠাকুর ধমকে বললেন, 'না, না, ওসব হলে চলবে না। নিজেকে ঠিক রাখতে হবে। অফিসের চেয়ারে বসলে বাকী সব ভুলে মন দিয়ে কাজ করবি।' এরপর থেকে উনি স্বাভাবিক হয়ে গেলেন। মিষ্টভাষী মুরারীবাবু (মুরারী মোহন দে) জানালেন—শ্রীজীবনকৃষ্ণের চোখে চোখ রাখতে পারা যেত না এত তেজ বেরোত ওনার চোখ থেকে। কিন্তু জিতেনবাবু ঘরে ঢুকে চুপ করে বসে থাকতেন আর ঠাকুরের চোখের দিকেই সব সময় তাকিয়ে থাকতেন। একদিন জীবনকৃষ্ণ ওনাকে ধমক দিয়ে বললেন, 'তুই কি আমাকে খাবি নাকি ?'

কাশীতে থাকার সময় একদিন জীবনকৃষ্ণ বললেন, 'জিতু পূর্বজন্মে বলরাম বোস ছিল। আমাকে দেখিয়েছে।' তখন জীতেনবাবু ঘরে উপস্থিত ছিলেন না। আশ্চর্য, সেদিন রাত্রেই উনি পূর্বজন্ম সম্বন্ধে একটি স্বপ্ন দেখে পরদিন তা জানালেন। জীবনকৃষ্ণ বললেন, 'কাল সকালে তোর পূর্বজন্মের কথা ওদেরকে বলেছি। আজ রাত্রেই ঠাকুর সেকথা তোকে জানিয়ে দিলেন। কী আশ্চর্য্য! তুই বলরাম বোস।' হোম্‌কো ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কসের গণেশবাবুও জিতেনবাবুর পূর্বজন্ম দেখেছিলেন। যদিও পরবর্তীকালে এ বিষয়টি উনি জন্মান্তর না বলে জন্মলব্ধ ভক্তির সংস্কার রূপে ব্যাখ্যা করেছিলেন।

জিতেনবাবুর ডায়েরী থেকে জানা গেল—২৩শে জানুয়ারী ১৯৫৭, রাত্রে উনি একটি বিশেষ স্বপ্ন দেখেছিলেন। স্বপ্নটি নিম্নরূপ।

"হাউস বোটের মত একটি বোটে আছি। সঙ্গী হিসাবে একজন অপরিচিত লোক। এমন সময় সিনেমায় যেমন হয় তেমনি একটি লেখা ফুটে উঠল—Deluge (প্রলয়)

অর্থাৎ যেন প্রলয় আসছে তারই সংকেত আর তার পরেই শুরু হল ভীষণ ঝড় জল বিদ্যুৎ বজ্রাঘাত। প্রলয়ই বটে। দুনিয়ায় যেন আর কোথাও কিছু নেই—কেবল আমরা দু'জন। আর আছে ঝড় জলের মাতন। ভোরে যখন ঘুম ভেঙে গেল তখন আমার ঘাড় থেকে মাথা ঝন্‌ঝন্‌ করছিল।"

এই ঘটনার সাথে বাইবেলের নোয়ার গল্পের মিল আছে। Deluge কথাটি কেন দেখালেন ? একথা চরম সত্য যে তিনি এই অঞ্চলের ভগবৎ প্রেমী মানুষদের কাছে এ যুগের নোয়া হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাই স্নেহময় গাঙ্গুলী একবার স্বপ্নে দেখেছিলেন একজন অজানা লোক জিতেন বাবুকে নির্দেশ করে বলছেন–'ইনি এ যুগের নোয়া।'

জিতেনবাবুর পরিবারের লোকজনের কাছে শোনা গেল–সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাথে জিতেনবাবুর বাবার ঘনিষ্ঠতা ছিল। মাঝে মাঝে শরৎবাবু আসতেন ওনাদের বাড়ীতে। উনি তখন খুব ছোট। ওনার স্বভাব ছিল বই-এর যে পাতাটি পড়া হয়ে যেত সেই পাতাটি বই থেকে ছিঁড়ে ফেলে দিতেন। এই অদ্ভুত আচরণ দেখে শরৎবাবু ওনার বাবাকে বলেছিলেন—এই ছেলেই তোমার সত্যিকারের পণ্ডিত হবে। জিতেনবাবুর লেখা বই 'অবিস্মরণীয় কাহিনী' পড়ে জীবনকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'জানিস জিতু, আমি বইটা পড়তে শুরু করে শেষ না করে উঠতে পারি নি; এত ভাল লেগেছে।'

শ্রীভগবানের স্বহস্ত লিখিত মহাবেদ 'ধর্ম ও অনুভূতি'র নিবেদন লিখে দিয়েছিলেন জিতেনবাবু, কিন্তু লেখাটির নীচে নিজের নাম লেখেন নি। শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, 'তুই নাম লিখবি না মানে ? আমি বলছি তুই লেখ।' তারপর নিজে ওনার নামটা লিখে দেন। আবার নামের নীচে লিখে দিলেন, 'এম.এ', ওনার কোয়ালিফিকেশনও (ডিগ্রি)।

জিতেনবাবু ছিলেন হাওড়া মোটর কোম্পানীর ডিরেক্টরের পি.এ। একবার জীবনকৃষ্ণ জিতেনবাবুকে বললেন, 'জিতু, তুই একবার বলে দ্যাখ না, ওরা তোকে Board of Directors-এ নিয়ে নেবে (তখন একটি আসন খালি হয়েছিল)। জিতেনবাবু হাত জোড় করে বলেছিলেন, 'বাবা, এমন কথা বলবেন না। আমি উচ্চ পদ চাই না।' মনে মনে ভাবলেন ঐ চাকরীতে গেলে ঠাকুরের সঙ্গ করার সুযোগ কমে যাবে। ওনার মতে এটা ছিল ওনার জীবনে একটা পরীক্ষা।

শ্রদ্ধেয় অরুণবাবু জানালেন—শ্রীজীবনকৃষ্ণ তার ঘরে যে সব বেকার তরুণ যুবক ভক্ত যাতায়াত করত তাদের জন্য খুব চিন্তা করতেন। বলতেন, 'অমুক আমার গলার কাঁটা হয়ে আছে। জিতু, দেখিস্‌ তো বাবা, তোর কোম্পানীতে ওর যা হোক একটা ব্যবস্থা করা যায় কি'না।' জিতেনবাবু ডিরেক্টরকে বলে তাকে ঠিক ঢুকিয়ে দিতেন। আর চাকরী হওয়ার সংবাদ পেলে জীবনকৃষ্ণ বলতেন, 'যাক্‌ আমার মাথা থেকে বিশ মন ভার নেমে গেল।'

জিতেনবাবু যে জীবনকৃষ্ণের বিশেষ কৃপার পাত্র ছিলেন তার বাহ্যিক প্রকাশ ঘটেছে বহুবার। শ্রীজীবনকৃষ্ণ লীলায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনার কথা জিতেনবাবুর ব্যক্তিগত ডায়েরী থেকে সংগ্রহ করে নীচে উল্লেখ করা হল।

'ঠাকুরের জরুরী আহ্বানে ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮, অফিস থেকে ফিরে সন্ধ্যা ৭টার পর ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে যাই। আজ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মতিথি। আজ ঠাকুরকে দর্শন করার বড় ইচ্ছা ছিল। অন্তর্যামী ভগবান নিজেই সে ব্যবস্থা করে দিলেন। ঠাকুরের ধ্যানও ভাঙছে আর আমিও ঘরে ঢুকছি। ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। রঞ্জিতবাবুও ছিলেন। তাঁকে চলে যেতে বললেন, রইলাম আমি আর ঠাকুর। ঘরের মধ্যে স্বর্গীয় ভাব। ঠাকুরকে ঠিক এইরকম একান্ত আপনভাবে আর কখনও পাই নি। ঠাকুর এক মাসের জন্য আলপুকুর যাত্রার কথা বললেন। ঘর মাত্র দু'খানি। থাকার অসুবিধা, সেকথা জানালেন। তাই আমাদের যেতে বলছেন না। তবে অনুমতি দিলেন আমাকে যাবার জন্য। 'তুই কাকেও কিছু না বলে একদিন যাস্।' হঠাৎ কেমন মনে হল ঠাকুরকে এই সময় আমার মনোবাসনার কথা জানালে তো হয়। ধরে বসলাম–একটা কথা বলব, কিছু মনে করবেন না তো ? ঠাকুর অভয় দিলে বললাম–আমার বড় ইচ্ছা সেদিন পাঁঠার মাংস কিনে নিয়ে যাব আর আপনার দুটি প্রসাদ পাব। করজোড়ে বললাম, 'লক্ষ্মী বাবা—আমার বড় ইচ্ছা—আমার কোন কষ্ট হবে না–আপনি কৃপা করে সম্মতি দিন।'

ঠাকুর রাজী হলেন। আমার মনের অবস্থা তখন বোঝাবার নয়। ঠাকুরের পদতলে পড়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লাম। কখনও হাত দুটি তুলেই নাচছি—আজ আমার জন্ম সার্থক। সঙ্গে সঙ্গে দিন স্থির হয়ে গেলো। ৯ই মার্চ রবিবার যাব। ঠাকুর জানালেন তিনি সাত বছর মাংস গ্রহণ করেন নি। সেই দিন তিনি লুচি দিয়ে মাংস খাবেন। আমার আনন্দ দেখে কে ? এ যে মনুষ্য জীবনের অতি দুর্লভ সৌভাগ্য। ২৪শে ফেব্রুয়ারী ঠাকুর নাগপুর প্যাসেঞ্জারে রওনা হলেন। অফিসের পথে ঠাকুরকে ট্রেনে দর্শন করতে গেলাম। ঠাকুরের কামরায় বসে আছি। গাড়ীতে ইঞ্জিন লাগল। গাড়ী খানিকটা পিছু হট্‌তে লাগল। আনন্দে বলে উঠলাম- 'আপনার সঙ্গে গাড়ী চাপাও হল।' ঠাকুর বললেন, 'গাড়ী চাপা নয় বাবা, তোমরা destination-এ পৌঁছেছ।'

৯ই মার্চ ভোরে উঠে তৈরী হয়ে মাংস কিনে উলুবেড়িয়া পৌঁছলাম ৮-৪০ মিনিটে। রামবাবু ও রাণাঘাটের অমরবাবু উলুবেড়িয়ার গেটের কাছে অপেক্ষা করছিলেন। দেখা হতেই পরস্পর আনন্দে নেচে উঠলাম। মদন ভায়া সঙ্গে ছিল। উলুবেড়িয়া পৌঁছে তার ফেরার কথা। কিন্তু রামবাবুর কথায় তার আর ফেরা হল না। দোকান থেকে কিছু জিনিসপত্র কিনে আলপুকুরের পথে রওনা হলুম। পথে চলেছি গল্প করতে করতে আর

দেখছি এ তো আলপুকুর নয়—এতো সেই কামারপুকুর। পথ-ঘাট গাছপালা ঘরবাড়ী সব যেন সেই কামার পুকুরের মতন। ক্রমশই এগিয়ে চলেছি নীরব শান্ত পল্লীর ভিতর। ভগবানের লীলার উপযুক্ত স্থানই বটে। এসে পড়েছি মানিকবাবুর বাগানের এলাকার মধ্যে। ওই যে শ্রীমন্দির দেখা যায়—টিনের বাড়ি মাটির পাঁচিলে ঘেরা। কে বুঝবে ওইখানে লীলা করছেন নরদেহে স্বয়ং শ্রীভগবান। বাড়ীতে ঢোকার মুখে নারকেল গাছের খাদি কাঠের সিঁড়ির উপর গড়াগড়ি খেয়েও আশ মেটে না। জয় ঠাকুর! জয় ঠাকুর!!

'জনম অবধি হাম রূপ নেহারণু
নয়ন না তিরপিত ভেল
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল॥'

আওয়াজ পেয়ে ঠাকুর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। কি নয়ন রঞ্জন ভুবন ভোলানো রূপ। হাত দুটি জোড় করে ঠাকুর প্রণাম গ্রহণ করলেন। কাছে যেতে গায়ে হাত দিয়ে কত আদর করতে লাগলেন। সমস্ত শ্রান্তি ক্লান্তি দূরে গেল—অপার শান্তিতে ভরে গেল দেহমন।

জলযোগের পর রান্নার পালা। ঠাকুর আমাকে মাংস রাঁধতে অনুমতি দিলেন। জন্ম সার্থক, জীবন ধন্য হল। এ যে ঠাকুরের অপার করুণা। ভাবলেও বুক আনন্দে ফুলে ওঠে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে রান্না চুকে গেল। ঠাকুর খুব আনন্দ করতে লাগলেন। বড় ছেলে বলদেবকে সঙ্গে না নিয়ে যাওয়ার জন্য ঠাকুর ক্ষুন্ন হয়েছিলেন। ঠাকুরের আদেশ হল—আগামী সপ্তাহে বলদেবকে সঙ্গে নিয়ে এসে দিন তিনেক থাকার জন্য। বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এল, মন চায় না, তবু আসতে হবে।'...

শ্রীজীবনকৃষ্ণ মানব জাতিকে এক অভাবনীয় আশীর্বাদে অভিষিক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'যে একদিনের জন্যও আমাকে দেখেছে সে মৃত্যুকালে আমাকে দেখতে পাবে, মৃত্যু-যন্ত্রণা আনন্দে রূপান্তরিত হবে।' তাঁর কথার সত্যতার প্রমাণও মিলেছে কয়েকজন ভক্তের জীবনে। জিতেনবাবুর ক্ষেত্রেও এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছিল। ওনার স্ত্রী শোভনা দেবীর কাছ থেকে জানা গেল সে কথা—

'মৃত্যু যে এত সহজ তা আমার ধারণার বাইরে ছিল। উনি আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, আর আমি ওনার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলাম। হঠাৎ ওনার শরীর একটু কেঁপে উঠল। মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি ওনার মুখের বদলে শ্রীজীবনকৃষ্ণের মুখ। দেহটি কিন্তু ওনার। আমি বৌমার নাম ধরে চিৎকার করে উঠলাম। বৌমা যখন ঘরে ঢুকল তখন আবার জীবনকৃষ্ণের মুখ বদ্‌লে গিয়ে ওনার নিজের মুখ হয়ে গেল। বেশ

বুঝতে পারলাম সব শেষ হয়ে গেল।'

'মরণক্ষণে তোমায় দেব তোমারই নাম বঁধু'—কবিগুরুর এই কথা সার্থকতা পেয়েছিল জিতেনবাবুর জীবনে।

গত ৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৬, চারুপল্লীতে জীবনকৃষ্ণের জন্মদিনের অনুষ্ঠান চলছে, এক সময় শ্রীমতী সন্ধ্যা রুদ্রের জাগ্রতে দর্শন হল- শ্রীজীবনকৃষ্ণের বিশাল মুখমণ্ডল, আর তার ডান চোখের ভিতর বসে আছেন ধ্যানমগ্ন জিতেনদা। মনে হল তুমিই ধন্য ধন্য হে। কবিগুরুর ভাষায় বলতে ইচ্ছা করে—

'সত্যের মন্দিরে তুমি যে দীপ জ্বালিলে অনির্বাণ
তোমার দেবতা সাথে তোমারে করিল দীপ্যমান।'

ব্রহ্মবিদ্ পুরুষ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের দেহাবসানের পর শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁর আত্মার মুক্তি ঘটানোর চেষ্টা না করে সেই মুক্ত-আত্মা মহাপুরুষকে চরম অবমাননা থেকে যারা রক্ষা করেছেন সেই আদর্শ পরিবারের প্রত্যেকের প্রতি জানাই আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধার অঞ্জলি॥

মধুকর

শ্রীসুধাংশুভূষণ দাস স্মরণে

শ্রীজীবনকৃষ্ণগত প্রাণ শ্রীসুধাংশুভূষণ দাসের সঙ্গে এই পাঠচক্রের যোগসূত্র স্থাপিত হয় 'মানিক' পত্রিকার মাধ্যমে। গত ২৬-০১-১৯৮৯ ওনার অনুজ শ্রীহিমাংশুভূষণ দাসের বাড়ীতে জীবনকৃষ্ণ অনুরাগীদের এক সমাবেশে আমাদের অনেকের সাথে চাক্ষুস পরিচয় ও আত্মিক ঘনিষ্ঠতার সুযোগ ঘটেছিল। মাত্র দু'দিনের নিবিড় সঙ্গলাভে তাঁর আত্মিক জীবনের যে পরিচয় আমরা লাভ করেছি তাতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায়, বিস্ময়ে অভিভূত না হয়ে পারি না। সেই মহাপ্রেমিকের আকস্মিক ইহলীলা সংবরণের সংবাদে আমরা মর্মাহত।

প্রয়াত মহান জীবনকৃষ্ণ প্রেমিকের মুখ থেকে শোনা তার নিজস্ব কিছু দর্শন ও অনুভূতির কথা স্মরণ করে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

'জীবনকৃষ্ণের কথা শোনার বহু আগে স্থূলে তাঁর দর্শন পেয়েছিলাম। তখন আমার বয়স চোদ্দ। গড়ের মাঠে ফুটবল খেলা দেখতে গিয়েছি। খেলা শেষে পিছন থেকে হঠাৎ কে যেন আমার কোমড় জড়িয়ে ধরল।বয়স্ক লোক, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, ফর্সা রঙ, দেহ থেকে জ্যোতি ঠিকরাচ্ছে। কয়েক মুহুর্ত পর তিনি অদৃশ্য হলেন। কিন্তু ঐ মুখ আমার স্পষ্টভাবে মনে ছিল। তাই জীবনকৃষ্ণকে প্রথম দেখেই চিনতে পেরেছিলাম।

আমার বাবা মারা যাবার বেশ কিছুদিন আগেই বলেছিলেন অমুক দিনে মরব। ঐ

নির্দিষ্ট দিনে তিনি নীরোগ দেহে ভাগবত শুনতে শুনতে মারা যান। তখন থেকেই মনে হত ভগবান বলে কিছু আছে, জানতে হবে। জীবনকৃষ্ণের কাছে যাওয়ার পর প্রথম স্বপ্নে দেখলাম–মায়াপুরে মঠের সামনে আছি। একজন রাজা ঢুকল বাড়ীতে। জিজ্ঞেস করলাম, কে আপনি ? বলল, আমি দশরথ। বাবাকে ডাকতে গেলাম। বাবা এসে দশরথকে তরবারী দিয়ে কেটে ফেললেন। জীবনকৃষ্ণ এই স্বপ্ন শুনে বললেন, 'দশরথ মানে দশ ইন্দ্রিয়। বাকী রইল রাম অর্থাৎ একের বীজ পড়ল।' এরপর একদিন স্বপ্নে দেখছি–কদমতলায় গেছি বাসে চড়ে। জীবনকৃষ্ণকে বললাম, 'তুমি কে ?' উনি বললেন, 'আমি ব্রহ্মর্ষি'। আবার জিজ্ঞাসা করলাম– 'আমাকে কেন ডেকেছেন ?' বললেন, 'তোকে ব্রহ্মবিদ করব।' দেখি ঘরে সত্যেন বোস বসে রয়েছেন। ঘুম ভাঙল।

ঐ সময়ের একটা স্থূল দর্শনের কথা বলি – একদিন দেখলাম, সামনে জীবনকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে, বললেন, 'আমি তোর দেহ থেকে বেরিয়েছি।' এরপর আমার দেহে মিলিয়ে গেলেন। এরপর একদিন দেখলাম, একটা বাচ্চা ছেলের দুটি পা চলে চলে বেড়াচ্ছে। স্বপ্ন শুনে উনি বললেন, ওটা হল বিষ্ণুপদ দর্শন। কিছুদিন ধরে প্রায় রাত্রেই স্বপ্নে দেখতাম রামের মত এক পুরুষ রোজ এসে মাথার কাছে দাঁড়িয়ে থাকত। ভোর চারটের সময় জোর করে উঠিয়ে ধ্যান করাতো। শ্রীজীবনকৃষ্ণ শুনে বলেছিলেন, 'ও সাধন পুরুষ রে, তোর দেহে সাধন করিয়ে নেবে।' একদিন ঐ সাধন পুরুষ জ্যোতি দেখিয়ে বলল, 'এই ভগবান, এই ভগবান দর্শন।' তারপর থেকে আর সাধন পুরুষকে দেখিনি।

অফিস থেকে সরাসরি কদমতলায় চলে যেতাম। বাড়ী ফিরতে দেরী হত। আমার স্ত্রী বিরক্ত হত। একদিন দুপুর বেলা অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ে কদমতলায় চলে এলাম। ঘরে ঢুকতেই জীবনকৃষ্ণ বললেন, 'যা বাড়ী চলে যা।' আমি ঘাবড়ে গেলাম। কিন্তু এ যে তাঁর আদেশ। তাই কোন কথা না বলে বিষন্ন মনে তক্ষুনি বাড়ী ফিরে এলাম। বাড়ীতে ঢুকে অবাক হলাম। শুনলাম আমার স্ত্রী আমার আসার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। দুপুর বেলা খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়েছিল, স্বপ্নে দেখেছে--রামকৃষ্ণ এসে বললেন, 'তোর স্বামী যেখানে যায় সেখানে কি রকম আলোচনা হয় শুনবি ? গতকাল গিয়ে ও যা শুনে এসেছে সেগুলো তোকে বলি শোন।' আমার স্ত্রী হুবহু সেই সব কথা বলে গেল যা আমি গতকাল কদমতলায় শুনে এসেছি। তখন বুঝলাম কেন জীবনকৃষ্ণ আজ যাওয়া মাত্র বাড়ি আসার নির্দেশ দিলেন।

আমার স্ত্রীর প্রথম দর্শনটাও ভারী সুন্দর। একরাত্রে ও দেখছে সরু সূক্ষ্ম তার দিয়ে গঠিত দেহসম্পন্ন একজন ওর গলা চেপে ধরেছে। চিৎকার করে উঠল, 'কে গো!' তখন আমার মুখ থেকে আপনা থেকে বেরিয়ে এল—'উনি জীবনকৃষ্ণ, যাকে মেয়েরা ঘরে বসেই দেখে।' ঠিক তার পরদিনই জীবনকৃষ্ণ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁরে,

বৌমা কিছু স্বপ্ন দেখেনি ?' কি আশ্চর্য! এতদিন কিন্তু উনি এই প্রশ্ন একবারও করেন নি।

একদিন ট্রামে বসে আছি। স্থূলেই দেখলাম আমার দেহ থেকে একটি ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এসে হাততালি দিয়ে তিনবার বলল, 'মুক্ত! মুক্ত! মুক্ত!'।

আর একটা স্বপ্ন মনে পড়ছে। দেখছি–গঙ্গার তীরে একটি কুটির। ভিতরে জীবনকৃষ্ণ বসে আছেন। শ্রীমও রয়েছেন। আমি সেখানে ঢুকে আবার বেরিয়ে এলাম। শ্রীমও আমার সঙ্গে বেরিয়ে এলেন। সামনে পড়ল একটি ফুটো নৌকা। বললাম, এ নৌকা তো চলবে না। উনি বললেন, 'তোর জন্য অন্য নৌকা আছে।' সঙ্গে সঙ্গে নতুন নৌকা এল। ভেসে চললাম নদীতে। তারপর সমুদ্রে গিয়ে পড়লাম। সেই সমুদ্রের মাঝে একটি মন্দির। মন্দিরের ভিতরে শ্রীজীবনকৃষ্ণ বসে রয়েছেন। তাঁর পিছনে রয়েছে বিরাট মাখনের পাহাড়।...

জীবনকৃষ্ণ স্বপ্ন শুনে বললেন, 'বলিস্ কিরে, মাখনের পাহাড়!' বলেই জীভ কেটে সমাধিস্থ হলেন।

সুধাংশুভূষণ দাস ছিলেন যথার্থ জীবনকৃষ্ণ পাগল মানুষ। হার্টের অসুস্থতা সত্ত্বেও বাড়ীর লোককে গোপন করে ছুটতেন বিভিন্ন স্থানে 'কথামৃত' ও 'ধর্ম ও অনুভূতি' পাঠের আসরে যোগ দিতে। সত্তর বছর বয়স্ক একজন হার্টের রোগীর পক্ষে প্রায়শঃই স্থূলে কুণ্ডলিনী জাগরণের তীব্র ঝাঁকানি সহ্য করা কিভাবে সম্ভব হত তা জানি না। তবে দ্রষ্টা মাত্রই ওই অবস্থা পর্যবেক্ষণে যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হতেন। হাসপাতালে স্নেহময় ওনার সাথে দেখা করতে গেলে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওনার স্ত্রীকে বললেন, 'দেখো গো, বোলপুর থেকে ঠাকুরের এক ভক্ত আমাকে দেখতে এসেছে। এসো বাবা এসো, বসো। সত্যি বলছি, আমি গত রাত্রেই তোমাদের কথা ভাবছিলাম। ভাবছিলাম, এবার কি বোলপুরের ছেলেরা পত্রিকা প্রকাশ করে নি ?' সঙ্গে সঙ্গে স্নেহময়ের কাছে মানিক পত্রিকার একাদশ সংখ্যাটি পেয়ে সে কী আনন্দ ওনার চোখে মুখে। ওনার স্ত্রী বললেন, '২৬শে জানুয়ারী তোমরা তো দেখেছ, তখনই উনি অসুস্থ ছিলেন। তখন থেকে যদি আমাদের কথা শুনতেন তাহলে আজ এই অবস্থা হত না।' একথা কানে যেতেই সুধাংশুবাবু বলে উঠলেন, 'ছি ছি ও কথা বলো না, ওসব বললে অপরাধ হয়। ঠাকুর যা করেন তা সবই মঙ্গলের জন্য।' দুদিন আগেই উনি ইমারজেন্সি রুমে ছিলেন। জ্ঞান ফেরা মাত্র চিৎকার করতে শুরু করেছিলেন, 'আমার কথামৃত কই, ধর্ম অনুভূতি কই' বলে। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার নার্সরা ছুটে এসে ওনার কাছে 'কথামৃত' এবং 'ধর্ম ও অনুভূতি' রাখার বিশেষ অনুমতি দিলেন।

সুধাংশুবাবু জি.পি.ও.তে কাজ করতেন। শ্রদ্ধেয় অরুণবাবু (ঘোষ) জানালেন

অফিসের বিরতি (টিফিন) পর্বে সকলে যখন টিফিন করতে ব্যস্ত, দিনের পর দিন সুধাংশুদাকে দেখেছি জি.পি.ও.-র সিঁড়িতে বসে কথামৃত পড়ছেন। একবার অরুণবাবু ওনাকে বলেছিলেন, দেখুন, জীবনকৃষ্ণ বলতেন, 'ঠাকুরকে (রামকৃষ্ণ) আর আমাকে পাঠ করে শোনাবি।' তা আপনি যে নানা জায়গায় পাঠ করে বেড়ান, ঠাকুর কি সেই পাঠ শোনেন ? সঙ্গে সঙ্গে সুধাংশুবাবুর কুণ্ডলিনী জাগরণ হল, হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন—'হ্যাঁ। আমি পাঠ শেষ করার পর দেখতে পাই আমার সামনে অসংখ্য জীবনকৃষ্ণ বসে আছেন।'

তুমিই ধন্য, ধন্য হে।

—মধুকর

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত স্মরণে

নরেন তখন একজন ফুটবল খেলোয়াড়। আমার থেকে বয়সে ৮/৯ বছরের ছোট ছিল। একদিন সন্ধ্যায় আমাকে বলল, আজ ধ্যান শিখে এলাম। তোমার স্বপ্ন হয় নাকি ? বললাম, খেলা ছেড়ে সাধুগিরি করবি নাকি ? আজ মাঠে এলি না ? আমার কথায় কান না দিয়ে বলল, একদিন শ্রীনিকেতনে চলো না, এক জ্যাঠামশায়ের সাথে আলাপ হবে আর অধ্যাত্ম বিষয়ে একটু জ্ঞান হবে। তোমার ভাল লাগবে। গুরুমন্ত্র নিতে হবে না, পূজা করতে হবে না, মালা জপা নাই, হরিনাম সংকীর্তন নাই–এ এক নতুন পথ। একদিন 'মৃন্ময়ী' বাড়ীতে গিয়ে সৌম্য দর্শন জিতেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জীর সাথে সম্পর্কে আবদ্ধ হলাম। আমাদের আধ্যাত্মিক নবজন্ম হল। দ্রুত একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করতাম নরেনের মধ্যে। ওর প্রভাব সকলের মধ্যে স্থান করে নিচ্ছিল। স্বপ্নে এবং চেতনায় সে সবার থেকে এগিয়ে গেল। একদিন স্বপ্নে দেখল–"এক মন্দিরের দরজা যুগ যুগ ধরে বন্ধ আছে। এক মাতৃরূপা মহিলাকে ঘিরে তীর্থযাত্রার ভীড় সেখানে। মহিলাটি বলল, কোন এক মহাপুরুষের স্পর্শে ঐ মন্দিরের দরজা খুলে যাবে। অনেকে দরজা খোলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। শেষে আমি মন্দিরে প্রণাম করে যেই দরজা ছুঁয়েছি, অমনি দরজা খুলে গেল সশব্দে। মহিলাটি বলল, বলতো বাবা, তুমি কে ? অমনি চারিদিক থেকে লোকজনেরা জোরে জোরে বলতে লাগল, 'ও মানুষ নয়, অবতার।' ওরা আমার কোন কথা শুনলো না। ঘুম ভাঙল।"

হৃদয় মন্দিরের বদ্ধ দুয়ার উন্মুক্ত হওয়ায় নরেনের আত্মিক জীবনে যে উত্তরণ ঘটেছিল স্বপ্নে তারই সগৌরব ঘোষণা 'ও মানুষ নয়, অবতার'—শ্রীরামকৃষ্ণ কথিত অসংখ্য অবতারের অন্যতম।

এই স্বপ্নের পর থেকে জ্যাঠামশাই বলতেন - নরেন 'অন্তঃসলিলা'। তখন থেকে নরেনকে আলাদা চোখে দেখতেন। গ্রামের ও পাঠচক্রের সবার মাঝে ওর একস্বরূপত্ব

বোধ অনুরণিত হতে লাগল। ওর নিঃস্বার্থ সমাজ সেবা নতুন এক মাত্রা পেল। শত কাজের মাঝেও সময় করে ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করে ৬/৭ মাইল সাইকেলে গিয়ে পাঠচক্রে নিয়মিত যোগ দিত নরেন। ১৯৮৬ সালে জ্যাঠামশাই হঠাৎ কলকাতায় চলে গেলেন। অনেকের মত নরেনও একলা বোধ করতে লাগল। পাঠে যাওয়া কমে গেল। আফসোস করতে লাগল যে আর দু'বছর জ্যাঠামশাই এখানে থাকলে ও নিজেকে গড়ে নিতে পারতো। তবে ওর অধ্যাত্মচর্চা থেমে যায় নি। কিন্তু ১৯৮৮ সালের ২২শে এপ্রিল ভোরে আকস্মিকভাবে হৃদরোগে নরেনের দেহাবসান হয় মাত্র ৩২ বছর বয়সে। অগণিত মানুষ সেদিন তাদের আকূলতা দিয়ে প্রমাণ করেছিল নরেনের প্রভাব গ্রামের মানুষের উপর কতখানি। এখনও ২২শে এপ্রিল দিনটি গ্রামবাসী শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। দীর্ঘ পাঁচ বছর অতিক্রম করেও আমাদের চেতনার মধ্যে তার অস্তিত্ব বর্তমান। পত্রিকায় সবার তরফ থেকে বিশেষ সংখ্যার মাধ্যমে এই তরুণ আধ্যাত্মিক চেতনা সম্পন্ন বন্ধুর জন্য শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করলাম।

শ্রী রামকৃষ্ণ ভদ্র
সুপুর, বোলপুর

স্মৃতি চয়ণ

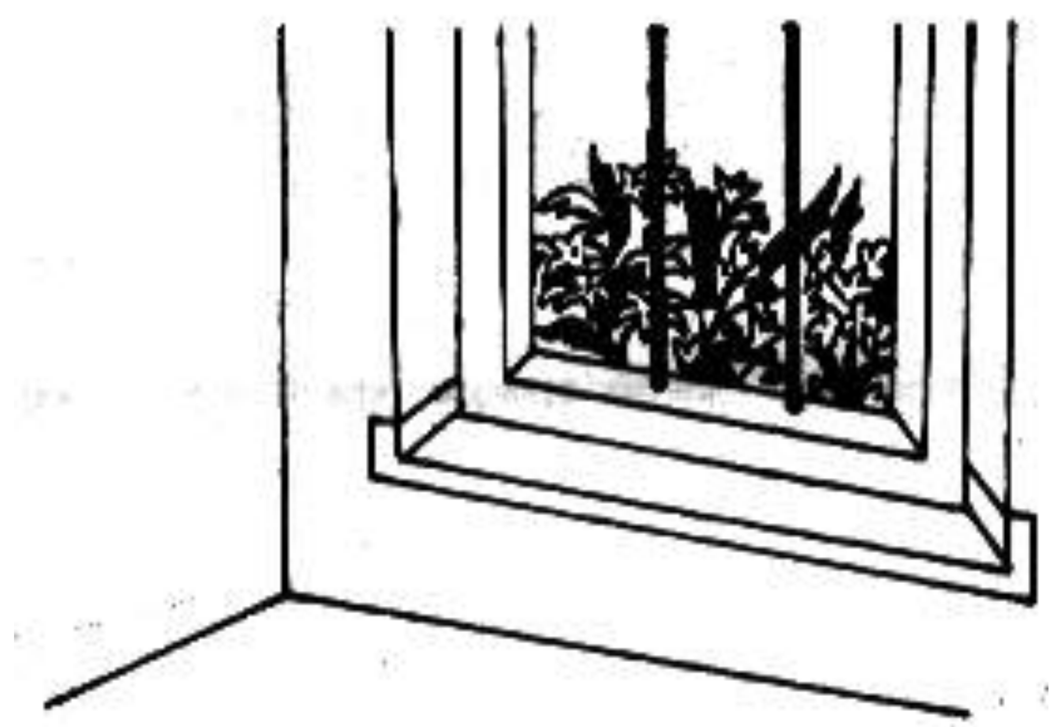

স্মৃতির বাতায়ন খুলে শ্রীজীবনকৃষ্ণের সঙ্গসুধা বিজড়িত সোনালী দিনগুলির দিকে ফিরে তাকিয়েছেন অনেকে– তারই কিছু বিবরণ এই অধ্যায়ে।

স্মৃতিকণা

শ্রীজীবনকৃষ্ণের পূতসঙ্গ লাভে ধন্য কিছু মানুষের বিক্ষিপ্ত টুকরো কিছু স্মৃতির এক সমাহার পরিবেশন করা হ'ল এখানে।

শ্রীশম্ভুনাথ সিন্‌হা ঃ

একদিন কদমতলা যাবার পথে এক টাকা দিয়ে লটারীর একটি টিকিট কাটলাম জীবনকৃষ্ণের নামে। অভাবের সংসার, যদি লটারীতে এক লক্ষ টাকা ওঠে তাহলে বেশ হয়। জীবনকৃষ্ণের ঘরে ঢুকে আমার প্রতিদিনের নির্দিষ্ট জায়গায় বসলাম। জীবনকৃষ্ণ মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে খুব চাপা গলায় কয়েকবার বললেন, 'আমার মাথার দাম এক লাখ টাকা। আমার মাথার দাম এক লাখ টাকা।' আমি চম্‌কে উঠলাম। বুঝলাম কথাটি আমাকে লক্ষ্য করে বলছেন। সম্ভবত ঘরের আর কেউ খেয়াল করেন নি উনি কি বলছেন। কথাটা শোনামাত্র আমার সারা শরীরে যেন জ্বালা করতে লাগল। তাড়াতাড়ি উঠে বাড়ীর বাইরে গিয়ে লটারীর টিকিটটি ছিঁড়ে ফেলে আবার ঘরে গিয়ে বসলাম। তখন দেহমন শান্ত হ'ল।

শ্রীসুধাংশুভূষণ দাস ঃ

একদিন সকাল ন'টার সময় স্থূলে দর্শন করলাম—আকাশে একটি বিরাট পাখী ডানা মিলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিকেলে জীবনকৃষ্ণের ঘরে গেলাম। উনি তখন ধ্যানস্থ। আমি মনে মনে আমার দর্শনটার কথা ভাবছি। ওনার ধ্যান ভাঙতেই বলে উঠলেন-'ওরে ও সুধাংশু ওটা আত্মাপাখী! নির্বিকল্প সমাধি অবস্থায় দর্শন হয়।' আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। আমার দর্শনের কথা উনি জানলেন কেমন করে!

আমি খুব ব্যায়াম করতাম। পাঞ্জা কষে আমাকে কেউ হারাতে পারত না। একবার জীবনকৃষ্ণের সঙ্গে পাঞ্জা কষেছিলাম। ওনার কাছে হেরে গেলাম। তখন বললাম, 'আপনি আমাকে হারিয়ে দিলেন, আমি কিন্তু কারও কাছে কখনও হারিনি।' উনি বললেন, 'হারবি না ? আমার হাতে এত শক্তি যে বনের সিংহকে গলা টিপে মেরে ফেলতে পারি জানিস!'

শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ ঃ

পাঠ তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। রাত্রি প্রায় ন'টা। ঘরে কয়েকজন মাত্র আছেন। খাটে ওনার পাশেই আমি বসে আছি। হঠাৎ আমার হাতটা ওনার গায়ে ঠেকতেই ছ্যাঁক করে উঠল। হাতটা সরিয়ে নিলাম। উনি বললেন, 'কি হ'ল ?' বললাম, 'আপনার শরীর কি গরম, ১০৫-৬^{0}F উত্তাপ হবে।' উনি হেসে বললেন, 'ও কিছু না।' দুপুর দুটো থেকে রাত্রি ন'টা পর্যন্ত সমানে পাঠ আলোচনা করতে করতে শরীর গরম হয়ে যেত। তাই দেখতাম সকলে চলে গেলে প্রায় রাত্রেই উনি স্নান করতেন।

শ্রীগৌতম চ্যাটার্জী ঃ

একদিন এক ভদ্রলোক ঘরে না ঢুকেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে জীবনকৃষ্ণকে বললেন, ‘আচ্ছা আমি কাল স্বপ্নে দেখলাম—মা কালীর পায়ে মল পরিয়ে দিচ্ছি। তাহলে কি কালীঘাটের মা-কে একটা সোনার মল গড়িয়ে দিয়ে আসব ?’ উনি বললেন, ‘সে কী রে! ওতো মল নয়, ও যে বেড়ী। তুই সংস্কারের পায়ে বেড়ী দিয়েছিস বাবা! এ খুব ভাল স্বপ্ন রে! পুরোন সংস্কার তোকে আর বাধা দিতে পারবে না।’

ঠাকুরের ঘরে সকলে যখন ভাগবত প্রণাম করত, আমি ছোট ছেলে বলে আমাকে বইটা প্রণাম করতে দেবার কথা কারও মনে আসত না। কিন্তু ঠাকুরের নজর এড়াত না। উনি নিজে বইটা নিয়ে বলতেন, ‘এসো তো বাবা, কাছে এসো।’ কাছে গেলে ভাগবত মাথায় ঠেকিয়ে দিতেন।

তখন গরম কাল। ঠাকুরের ঘরে বৈদ্যুতিক পাখা ছিল না। ভক্তেরা ঘরে ঢুকে জামা খুলে রাখত। জনৈক ভক্ত বাড়ী যাবার সময় তার জামাটা পড়তে গিয়ে পকেট থেকে কিছু পয়সা পড়ে যেতেই ঠাকুর রসিকতা করে বললেন, ‘যাঃ, তোর কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ হয়ে গেল।’ ভদ্রলোক জুতো পরে বারান্দায় জানলার এক ধারে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন মুখ কাঁচুমাচু করে। ঠাকুরকে কিছু বলতে পারছেন না। ভাবছেন কাঞ্চন ত্যাগ হয়ে গেলে তার জীবন চলবে কেমন করে, তিনি যে সংসারী মানুষ। ঠাকুর দেখতে পেয়ে ব্যাপারটা বুঝে হাসতে হাসতে বললেন, ‘ওরে যা বাবা, যা, ভয়ের কিছু নেই, যা।’

শ্রীস্মরজিৎ মণ্ডল (বনগাঁ) ঃ

প্রথম দিন গেছি কদমতলায়। ওনাকে প্রণাম করার পর উনি বললেন, ‘বল্, তোর দেহেতে ভগবান।’ আমি চুপ করে আছি। আবার জোর গলায় বললেন, ‘বল্, তোর দেহেতে ভগবান।’ তখনও চুপ করে আছি। তৃতীয়বার আবার ঐ কথা বলতে আদেশ করলেন। তখন আস্তে আস্তে বললাম—‘আমার দেহে ভগবান।’ উনি বললেন, ‘যাঃ’। অমনি মাথাটা হাল্কা হয়ে গেল। ঠিক যেন একটি ডাল থেকে অসংখ্য পাখী উড়ে গেল এই রকম ভাব।

ঠাকুর তখন বিবাহিত লোকেদের হাতে জলটুকুও গ্রহণ করতেন না। আমি একদিন ওনার ঘরে বসে মনে মনে ভাবছি—ঠাকুর কৃপা করে যদি কাছে টেনে নিলেন তবে এত বঞ্চনা কেন ? সংসারী হবার আগেই কেন টানলেন না, ইত্যাদি। উনি তখন জল খাচ্ছিলেন। জল খেয়েই হঠাৎ বলে উঠলেন, ‘চাঁদামামা—।’ অমনি আমার মুখ থেকে ফস করে বেরিয়ে এল ‘সকলকার মামা’ কথাটা। পরক্ষণে বুঝলাম কী অভিনব কায়দায় অন্তর্যামী ঠাকুর আমার মুখ দিয়েই আমার মনের প্রশ্নের উত্তর জানালেন।

একদিন পুরীর রাস্তায় ঠাকুরের সাথে হাঁটছি। উনি কথা প্রসঙ্গে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও

স্বামীজির সমালোচনা করছেন। আমি বললাম, 'আচ্ছা তাহলে ঠাকুর ও স্বামীজির আসার কি দরকার ছিল ?' উনি বললেন, 'আরে বলিস কিরে! ঠাকুরকে ভিত্তি (base) করেই তো আমি এই নতুন জিনিষ সৃষ্টি করে গেলাম। ঠাকুর না এলে base তৈরী করতেই যে আমার এ জীবনটা কেটে যেত।'

শ্রীমতী শোভনা চ্যাটার্জী ঃ

পুরীতে আছি। সকালে স্নান করে জগন্নাথ দর্শনে যাব। দরজায় দেখি আমার স্বামীর (জিতেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী) সঙ্গে কথা বলছেন ধীরেন বাবু। একটু দূরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন জীবনকৃষ্ণ। ননদকে বললাম, 'দ্যাখ, আমার জগন্নাথ দর্শন হয়ে গেল।' শুনলাম আগের দিন উনি এসে খোঁজ নিয়ে গেছেন আমরা এসেছি কিনা। কি আশ্চর্য! ওনাকে কোনও খবর দেওয়া হয়নি অথচ উনি জানলেন কী করে যে আমরা পুরী আসছি, আর এই বাড়ীতে এসে উঠব! ভাবতে অবাক লাগে। পরের দিন আবার ধীরনবাবু ও ঠাকুর রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছেন দেখে উনি (জিতেনবাবু) ক্যামেরা নিয়ে এগিয়ে গেলেন। খুব কাছ থেকে ওনাদের ফটো নিয়ে নিলেন। কিন্তু কলকাতায় ফিরে ওয়াশ্ করে দেখা গেল রীলের সব ফটো উঠেছে, শুধু ঐ ফটোটাই ওঠেনি। প্রসঙ্গত বলে রাখি, ঠাকুরের ফটো তোলা নিষেধ ছিল।

মেয়ের বিয়ে। ঠাকুরের হাতে কার্ড দিয়ে উনি (জিতেনবাবু) প্রণাম করলেন। ঠাকুর বললেন, 'আমি তো কারোর বাড়ী যাই না বাবা!' উনি বললেন, 'তাহলে এখান থেকেই আশীর্বাদ করবেন।' বিয়ের দু'দিন পর ভোরবেলা পাশের বাড়ীর এক ভদ্রমহিলা আমাকে বললেন, "আচ্ছা, আপনার স্বামীর নাম কি জিতু ? পরশু দিন স্বপ্নে দেখলাম এক ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে গেট খুলে আমার কাছে এসে বললেন, 'দ্যাখ, জিতুকে বলিস আমি ওর মেয়ের বিয়েতে এসেছিলাম।' আমি ওনাকে চ্যাটার্জীবাবু বলে জানি তাই সেকথা জানাতে আসিনি। আবার গতরাত্রে স্বপ্ন হ'ল সেই ভদ্রলোক বলছেন, 'কি রে তুই জিতুকে কথাটা বলিস নি ?' তাই আজ সকালেই বলতে এলাম।" স্বপ্নে দেখা মানুষটার বর্ণনা শুনে বললাম, 'আপনি ঠিকই দেখেছেন। ওনার কাছে আমার স্বামী যান। আর উনি (জীবনকৃষ্ণ) আমার স্বামীকে ঐ নামে (জিতু) ডাকেন।'

বড় ছেলের পৈতের সময় ঠাকুরকে আর ওনার ভক্তদের ২/৪ জনকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। কিন্তু সেদিন ঠাকুরের ঘরে যারা এসেছিলেন ঠাকুর তাদের প্রত্যেককে পাঠিয়ে দিলেন এখানে। বললেন, 'জিতুর ছেলের পৈতে, তোদের সকলকে যেতে বলেছে। সবাই যা।' তাদের অনেককে আমার স্বামী চিনতেনও না। প্রায় ৭৫/৮০জন বাড়তি লোক খেল। কিন্তু কি আশ্চর্য ঐ আয়োজনেই সকলকে খাওয়ানোর পরও অনেক খাবার বেঁচে গেল। পরদিন সেই খাবার ও মিষ্টি প্রতিবেশীদের মধ্যে বিলি করেছিলাম।

শ্রীপাঁচকড়ি দাস ঃ

আমাকে মানুষ করেছেন দাদা (মুরারি মোহন দে)। উনি খুব ছোট বয়সেই আমাকে জীবনকৃষ্ণের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। হাফ-প্যান্ট পরেই দাদার সাথে ওনার ঘরে গিয়েছি অনেকদিন। প্রথম দিন ওনার ঘরে যখন পৌঁছলাম তখন বিকেল শেষ। ঘর লোকে ভর্তি। তিল ধারণের জায়গা নেই। দরজায় আমাকে দেখেই বলে উঠলেন, 'আয় বাবা আয়। একেবারে সোজা চলে আয়।' অত ভীড় সত্ত্বেও সকলে পিঠ এদিক ওদিক বাঁকিয়ে হাঁটু সরিয়ে ওনার কাছে যাবার রাস্তা করে দিলেন। ওনার পাশে খাটের উপর আমাকে বসালেন। কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা চলতে লাগল। কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু বেশ ভাল লাগছিল। বিশেষত ওনার দেহের ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তন (মুহুর্মুহু সমাধি) আমাকে আকৃষ্ট করেছিল।

তখন আমার দর্শন অনুভূতি প্রচুর হ'ত। একবার ওনার বাড়ী থেকে বাসে করে ফিরছি। উনি আমার পাশে বসে গল্প করতে করতে এলেন। আমার সাথে এক সঙ্গে বাস থেকে নামলেন, পরক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। বুঝলাম উনি আমাকে কৃপা করে স্থূলে দর্শন দিলেন।

একদিন স্বপ্নে দেখলাম, আমি যেন গ্রীক সৈনিক। বিরাট চেহারা। মাথায় গ্রীক সৈনিকের সেই বিশেষ টুপী। শুনে জীবনকৃষ্ণ বললেন, 'হ্যাঁ বাবা, তুমি বিরাট মানুষ ছিলে। কোন এক জন্মে তুমি বীর গ্রীকসেনাদের একজন ছিলে।' পরে উনি বলতেন, পূর্বজন্ম নয় মানুষ জন্মায় আবহমানকালের পৃথিবীর সব সংস্কার নিয়ে। এখানে গ্রীক সংস্কার ফুটেছে।

একবার বেশ শরীর খারাপ হ'ল। আমার আগের ভায়েরা সকলে এইভাবে বড় বয়সে অসুখে ভুগে মারা গেছেন। তাই মা খুব ভয় পেয়ে গেলেন। ঐ সময় এক রাত্রে স্বপ্নে দেখলাম–একটি টিনের চালা বাড়ীতে গেছি। অমন সুন্দর মাটির বাড়ী আমি আগে কখনও দেখিনি। উঠোনের এক প্রান্তে একটি লেবু গাছ। তার একটি ডাল পাশের দিকে বেশ কিছুটা বেড়েছে। সেই ডালে দুটি লেবু ধরে রয়েছে, খুব চোখে পড়ছে। ...পরদিন এই স্বপ্ন জীবনকৃষ্ণকে জানালাম। উনি শুনে বললেন, 'আরে তোকে তো ওষুধ বলে দিয়েছে। ওটাই তোর ওষুধ। প্রতিদিন দুটি করে লেবু খাবি।' ওনার কথামত চলে আমার অসুখ ভালো হয়ে গেল। ডাক্তার দেখাতেও হ'ল না। আজ পর্যন্ত সুস্থ আছি।

শ্রীমুরারিমোহন দে ঃ

গোকুল হাজরার কাছে কাজ করতাম। উনিই আমাকে শ্রীজীবনকৃষ্ণের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমার আর্থিক সঙ্গতি বিশেষ ছিল না, তাই ওনার বেনারস যাবার সময় আমি মুখ ফুটে সঙ্গে যাবার কথা বলতে পারি নি। কিন্তু অন্তর্যামী ভগবান মনের কথা

বুঝেছিলেন। পরদিন ওনার ঘরে ঢুকতেই ঠাকুর বললেন, 'মুরারি, তুই আমাদের সাথে যাবি। হীরু স্বপ্ন দেখেছে যে তুই আমাদের সাথে যাচ্ছিস।' আমার তখন যে কী আনন্দ হ'ল তা বলে বোঝাতে পারব না। পরে তিনি কৃপা করে তার সাথে পুরী ও আলপুকুরও নিয়ে গিয়েছিলেন।

একদিন নৃসিংহ অবতারের কথা বলতে ওনার দেহের অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটল। লম্বালম্বিভাবে ওনার মুখের এক অর্ধে স্মিত হাসি ও অপরার্ধে বিভৎস বিকৃতি প্রকাশ পেল। অতি অদ্ভুত সে মুখভঙ্গী। নৃসিংহ অবতারের ব্যাখ্যায় বলেছিলেন যে সাধকের দেহে যখন অর্ধেক দেবত্ব ও অর্ধেক জীবত্ব প্রকাশ পায় তখন তিনিই নৃসিংহ অবতার।

কথামৃতে এক জায়গায় রামকৃষ্ণ বলেছেন–'ওরে ও যে লড়ে চড়ে'। এই কথা শুনে জীবনকৃষ্ণ বললেন, 'ঈশ্বর বস্তু কি জিনিষ দেখবি ?' এই বলে দেখালেন ওনার পেটের ভিতর কি যেন একটা বস্তু নড়া চড়া করছে, বেশ বড় সাইজের। শ্রীরামকৃষ্ণের এই প্রকার অনুভূতি হওয়ার দু'তিন মাসের মধ্যেই দেহ চলে গিয়েছিল। কিন্তু জীবনকৃষ্ণের ক্ষেত্রে তা হ'ল না। কিছু দিন পর ওনার একটি বিশেষ দর্শন হয়েছিল। উনি দেখলেন-–ওনার দেহ থেকে তীব্র জ্যোতি বেরিয়ে জগতে ছড়িয়ে পড়ল।

শ্রীঅমরনাথ বসু ঃ (শ্রীজীবনকৃষ্ণের মাসতুতো ভাই মানিকলাল বসুর কনিষ্ঠ পুত্র)

ছোট বেলায় একদিন জ্যাঠার (জীবনকৃষ্ণের) সঙ্গে ঠাকুর নিয়ে কী কথা বলতে বলতে হঠাৎ বলে ফেললাম, 'তুমিই তো ঠাকুর'। অমনি ওনার সমাধি হয়ে গেল। তখন শুধু অবাক হয়ে ওনার দেহের পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলাম। আজ কত পরে ঐ ঘটনার অর্থ বুঝতে পেরেছি। ছেলে বয়সের ঐ স্মৃতি মনে গভীর দাগ কেটেছিল।

শ্রীঅনিল মুখার্জী ঃ

একদিন শ্রীজীবনকৃষ্ণ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের তীব্র সমালোচনা করতে লাগলেন। আমি খুব বিচলিত হয়ে পড়লাম। খাটের যেখানে উনি বসেছিলেন ঠিক তার নীচেই আমি বসেছিলাম। ওনাকে প্রশ্ন করব মনে করে যেই মুখটা উপর দিকে তুলেছি অমনি উনি মুখটা ঝট্ করে নামিয়ে আমার কানের কাছে খুব আস্তে বললেন, 'ওরে সে আমার জিনিস, আমি বলতেই পারি'—বলেই পূর্বের আলোচনা চালাতে লাগলেন। আমি মাথা নীচু করে চুপ করে বসে থাকলাম। কথা ক'টি আমি ছাড়া ঘরের আর কেউ শুনতে পেল না।

শ্রীবোধিসত্ত্ব রায় (রবি) ঃ

প্রায়দিনই বেলা দু'টোর সময় যেতাম জীবনকৃষ্ণের ঘরে। ওখান থেকে বেরোতাম আটটা সাড়ে আটটায়। ক্ষিধে পেয়ে যেত। একদিন দুলাল ঘোষের দোকানে কিছু খেয়ে নিয়ে ওনার ঘরে ঢুকব ঠিক করেছি। খেতে খেতে খুব জোরে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। বৃষ্টি

ছাড়াবার কোন সম্ভাবনা নেই। চিন্তায় পড়ে গেলাম। এমন সময় দেখি ঠাকুরের ঘরের এক পাঠক সতীশদা ছাতা মাথায় এলেন। কাছে এসে বললেন, 'ঠাকুর পাঠিয়ে দিলেন আপনাকে নিয়ে যাবার জন্য।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমি যে এখানে আট্‌কা পড়ে গেছি তা উনি জানলেন কেমন করে ?' সতীশদা বললেন, 'কী জানি বাপু, ঠাকুর তো বললেন, ওরে একজন বলে গেল, রবি দুলালের দোকানে আছে। কেউ একজন একটা ছাতা নিয়ে গিয়ে ওকে নিয়ে আয় তো বাবা।' মনে করে দেখলাম ঠাকুরের ঘরের কোন লোক তো আমায় দেখে যায় নি! বেশ অবাক হলাম। তবে ঘটনার অলৌকিকত্বের চেয়ে অধমের প্রতি তাঁর অসীম ভালবাসার চিন্তাই বেশী করে আচ্ছন্ন করল আমার মনকে।

শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী মুখার্জী ঃ

খুব ছোটবেলা থেকেই আমি ওনাকে স্বপ্নে দেখতাম। কিন্তু তখন তো চিনতাম না। স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়ে কেঁদে উঠতাম। অবশ্য স্বপ্নে তিনি যে ভয় দেখাতেন তা নয়। বার বার একজন অপরিচিত মানুষকে স্বপ্নে দেখছি, এটাই ভয়। ঠাকুমা তাই মাদুলী বেঁধে দিয়েছিলেন। তবে তাতে স্বপ্ন দেখা বন্ধ হয় নি। আমার বিয়ে হয় চোদ্দ বছর বয়সে। ষোল বছরে বিধবা হলাম। বয়স যখন চল্লিশের কোঠায়, একবার ঠাকুর পুরী থেকে সোজা এসে উঠলেন আমাদের বাড়ীতে (শ্রীরামপুরে)। প্রথম দেখাতেই চিনতে পেরেছিলাম যে ইনিই ঠাকুর জীবনকৃষ্ণ। আমি যে স্বপ্নে তাঁকে খুব স্পষ্টভাবে দেখেছি। এমন কি পিঠের বাঁ দিকে একটা ছোট মাংসপিণ্ড উঁচু হয়ে ছিল তাও স্বপ্নে দেখেছিলাম। একদিন উনি খালি গায়ে কলে মুখ ধুচ্ছিলেন। তখন পিছন থেকে ওনার পিঠে ওই আবের উপর নজর পড়তেই চমকে উঠলাম।

তাঁর ভক্তেরা আমার হাতের রান্না খাবেন বলে জানিয়েছিলেন রবিকে (ভাই)। একদিনের জন্য হলেও তাঁকে নিজের হাতে রেঁধে খাওয়াবার সৌভাগ্য লাভ করে জীবন ধন্য হয়ে গেছে। সেদিন এক অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল। রবির কথামত আমি ১৯/২০ জনের মত রান্না করেছিলাম। কিন্তু যারা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এল তারাও তাঁর নির্দেশে এখানে খেয়ে গেল। ঐ রান্নাতেই ৪০/৫০ জন খেল। তবুও ভাত তরকারী থেকে গেল। আজও ভেবে পাই না কী করে এটা সম্ভব হ'ল।

শ্রীহীরু চ্যাটার্জী ঃ

শ্রীজীবনকৃষ্ণ নিয়মিত খবরের কাগজ পড়তেন না। কিন্তু জওহরলালের মৃত্যু সংবাদ শুনে উনি চঞ্চল হয়ে উঠলেন। একজনকে দিয়ে সেদিনের খবরের কাগজ কিনে আনা করিয়ে পড়তে লাগলেন। ঘরের মধ্যে অন্যান্যরাও জওহরলাল প্রসঙ্গেই আলোচনা করছেন। কে একজন বললেন, 'ভারতবর্ষের অবস্থা এবার কী হবে কে জানে ?' উনি বলে উঠলেন, 'কেন ? ওর মেয়েটাকে (ইন্দিরাকে) দিয়ে দিক না, তাহলেই দেশ ঠিক চলবে'—বলেই সমধিস্থ হলেন। ঐ সময় ইন্দিরার প্রধানমন্ত্রীর হওয়ার কোন সম্ভাবনা

কারও মনে উঁকি দেয় নি। কিন্তু শ্রীজীবনকৃষ্ণের মুখ নিঃসৃত দৈব ইচ্ছাই পরবর্তীকালে বাস্তব রূপ নিয়েছিল।

শ্রীবলদেব চ্যাটার্জী ঃ

সেটা ১৯৬১ সাল। কদমতলায় ঠাকুরের ঘরে বসে আছি। দু'জন ভক্ত ঢুকল। জামা খুলতে খুলতে বলল, 'শুনেছেন, আজ একটা বিরাট ব্যাপার হয়ে গেছে।' ঠাকুর বললেন, 'কী বাবা, কী বাবা!' একজন বলল, 'আজ গোয়া স্বাধীন হয়ে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হ'ল।' ঠাকুর শোনামাত্র আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন। বললেন, 'ওরে একটা খবরের কাগজ নিয়ে আয় তো রে! ওরে বাবা কী খবরই না শোনালি। ওটা যে ভারতের পক্ষে কত বড় শৃঙ্খল ছিল তা আর কি বলব! আহা কী আনন্দ যে হচ্ছে! কে স্বাধীন করল বাবা ?' ভদ্রলোক বললেন, 'সর্দার প্যাটেলের নির্দেশে জেনারেল জয়ন্ত চৌধুরীর নেতৃত্বে ভারতীয় সেনাবাহিনী বিনা রক্তপাতে গোয়াকে পর্তুগীজদের শাসন মুক্ত করেছে।' শুনে বললেন, 'আহা ও (জয়ন্ত চৌধুরী) খুব বড় মানুষ রে!' এ সব কথা বলছেন আর আনন্দে ওনার দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। সেই দৃশ্য আজও আমার চোখে ভাসে। অবাক হয়ে ভাবি কী গভীর দেশপ্রেম ছিল তাঁর।

শ্রীবাসুদেব রায় ঃ

একদিন কেদার দেউটি (কদমতলা) গিয়ে দেখি দরজায় তালা ঝুলছে। বাড়ীর ছেলেদের ডেকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম মানিকবাবুর মেয়ের বিয়ে বলে বাবা (জীবনকৃষ্ণ) আলপুকুরে চলে গেছেন। তখন উনি যেখানে যেতেন সেখানে সঙ্গে কিছু কুমার ভক্তদের নিয়ে যেতেন। বিবাহিতদের সেখানে ঠাঁই হ'ত না। আমি বাড়ীতে সাইকেল রেখে বেরিয়ে পড়লাম উলুবেড়িয়ার পথে। জিজ্ঞাসা করে করে অবশেষে আলপুকুরে মানিকবাবুদের টিনের ছাউনী দেওয়া মাটির ঘরের সামনে হাজির হলাম। দু'হাত দিয়ে দুদিকের দরজার ফ্রেম ধরে দাঁড়ালাম। উঁচু বারান্দায় ইজি চেয়ারে উনি বসেছিলেন। অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে থাকায় উনি আমাকে দেখতে পান নি। ছোকরা ভক্তরা রান্না করছিল। হঠাৎ আমাকে দেখে তাদের খুন্তী নাড়ার শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। উনি তখন শব্দ বন্ধ হবার কারণ খুঁজতে মুখ ঘোরালেন, দৃষ্টি পড়ল আমার উপর। আমাকে দেখেই চেয়ার ছেড়ে ঝট্ করে উঠে বললেন, 'বাসু এসেছিস, আয় আয়।' আমি বললাম, 'না'। উনি দ্রুত গতিতে কাছে এগিয়ে এলেন, বললেন, 'আয় বলছি, আয়।' বললাম, 'না'। উনি মুখোমুখি দাঁড়ালেন—'আসবি না কেন, আয় বাবা।' এবারও বললাম, 'না'। কেদার দেউটিতে গিয়ে আপনাকে দেখতে পাই নি। দেখতে না পাওয়ায় মনটা কিছুতেই শান্ত হচ্ছিল না। তাই এতদূর ছুটে এসেছি। আপনাকে দেখা হ'ল, এবার আমি আসি'- —বলে ঘুরে দাঁড়ালাম। পরক্ষণেই আবার ওনার দিকে তাকিয়ে বললাম একটিবার

আপনাকে প্রণাম করে যাই। আমি যখনই ওনাকে প্রণাম করতাম, তখনই পায়ের পাতা দুটি চেপে ধরতাম যাতে সেই দেহের স্পর্শানুভূতি বেশ কিছুক্ষণ থাকে। আমি ওনার পা দুটির গোড়ালী চেপে ধরে মাথা ঠেকালাম পায়ে। কান্নায় ভেঙে পড়লাম। উনি আমাকে টেনে তুলে দাঁড় করালেন। তারপর বললেন, 'কোথায় যাবি বাবা ? তোর যাওয়া হবে না। আমি যেদিন যাব সেদিন আমার সঙ্গে যাবি।' হাতে ধরে নিয়ে গেলেন ভিতরের দিকে। বারান্দায় উঠে বললেন, 'তুই ইজি চেয়ারটায় বস'। বললাম, 'না, চেয়ারে বসব না।' উনি ধমকে বললেন, 'নে বস্'। বাধ্য হয়ে বসলাম। একজনকে বললেন, 'ওরে দুটো ডাব কেটে দে'। আমি বললাম, 'না, না, দুটো নয়, একটা।' একটার জল খেলাম। তারপর বললেন, 'আর একটা কাট।' ওনার আদেশে দ্বিতীয় ডাবটির জলও খেতে হ'ল। কী করে যে পেটে ঢুকল জানি না। উনি আমার কাছে বসে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'মানিক আমার, সোনা আমার, ধন আমার...।' যেন দু'বছরের শিশুকে আদর করছেন। আমি তখন ছেলেমেয়ের বাপ, কিন্তু ওনার আদর খেতে খেতে ফিরে গেলাম শৈশবে, মনে হচ্ছিল বাবা আমাকে কোলে নিয়ে আদর করছেন।

সেই সোনামাখা আদরের স্মৃতি মনে ভেসে উঠলে ভিতর থেকে কান্না জেগে ওঠে। চোখের জল আর কোন বাধা মানে না। কিছুক্ষণ পর বললেন, 'তুই আমার গামছা নিবি, আমার কাপড় পরবি।' পুকুরে স্নান করে এলাম। উনি চিৎকার করে বললেন, 'ওরে শুনছিস, আমার পাশে বাসুর খাবার জায়গা করবি।' ওনার বাঁ পাশে খেতে বসেছি। ছেলেরা পরিবেশন করতে এসে প্রথমে বাবাকে দিতে যাচ্ছে, উনি অমনি বলে উঠলেন, 'দাঁড়া, দাঁড়া, আগে বাসুকে দে, তারপর আমাকে দিবি।' অগত্যা সবকিছুই প্রথমে আমার পাতে পড়ল। উনি কৈ মাছ খেতে ভালবাসতেন। সবচেয়ে বড় কৈ মাছটা ওনাকে দেবার জন্য তুলেছে অমনি বললেন, 'দে, ওটা বাসুর পাতে দে।' এবার আমি আর থাকতে পারলাম না। বললাম, 'না, না, ওটা আপনি খান। আমাকে অন্য একটা দিক।' আবার ধমক। পরিবেশনকারীকে নির্দেশ দিলেন, 'ওটা বাসুর পাতে দে বলছি।' আদেশ পালিত হ'ল। আমি লজ্জায় মরে গেলাম। উনি খেতে বসে সারাক্ষণ ওনার বাঁ হাতটা আমার ডান জানুর উপর আস্তে চাপ দিয়ে ধরেছিলেন। এইভাবে খুব আনন্দের মধ্যে দিয়ে ভোজন পর্ব সমাধা হ'ল।

বিকেলে একসময় দিলীপ আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, 'বুঝতেই পারছেন, কুমার ভক্তদের নিয়ে উনি এখানে থাকতে চান। আপনাকে মুখ ফুটে চলে যেতে বলতে পারছেন না। আমি বললাম, 'আমি আজই চলে যাব। তোমাদের চিন্তার কোন কারণ নেই।' দিলীপ আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে কিছু বলল, এটা

জীবনকৃষ্ণের দৃষ্টি এড়ায় নি। উনি বললেন, 'হ্যাঁ রে, দিলীপ কি বলল রে ?' বললাম, 'ও কিছু না।' কিন্তু ওনার কি তখনও জানতে বাকী আছে! বললেন, 'শোন, তুমি আমার কাছে থাকবে, আমার কাপড় পরবে, আমার বিছানায় শোবে, আমার বালিশে মাথা দেবে, আমার ব্রাশে দাঁত মাজবে। তবু তুমি যেতে পাবে না বাবা, তুমি আমার সঙ্গে একসাথে বাড়ী ফিরবে।' মনে মনে ভাবতে লাগলাম, নিজের বাবাও তো কখনো বলতে পারে না যে আমার ব্রাশে দাঁত মাজবে।

রাত্রে খাওয়ার পর বললেন, 'রাত্রে যদি পেচ্ছাব বা পায়খানা করতে ওঠ তাহলে আমাকে ডাকবে বাবা। নতুন জায়গা তুমি একা একা বাইরে বেরিয়ো না, অসুবিধা হবে।' তারপর শুয়ে পড়লাম। ভোররাত্রে স্বপ্ন দেখছি–কুয়াশার স্তর ভেদ করে ধীরে ধীরে আমার দিকে এগিয়ে এলেন এক জ্যোতির্ময় পুরুষ। কাছে এলে দেখলাম, তিনি শ্রীজীবনকৃষ্ণ। বললেন, 'তোর সাধন শেষ হয়ে গেল।' আমি শিউরে উঠলাম। ...ঘুম ভাঙল। ধীরে ধীরে কোন শব্দ না করে সাবধানে দরজা খুলে বাইরে গিয়ে প্রাতঃকৃত্য সেরে ফিরে এসে ওনার পায়ের কাছে বসলাম।

উনি জেগে উঠে বসলেন। বললেন, 'তোর ঘুম ভেঙে গেছে! রাত্রে কি ঘুম হয় নি বাবা ?' বললাম, 'ভালই ঘুমিয়েছি।' আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাইরে যাবে নাকি ?' বললাম, কাজ সেরে এসেছি। শুনে ব্যথা ভরা কন্ঠে বললেন, 'আমায় ডাকলি না কেন বাবা ? তোকে তো বারবার করে বলে দিয়েছিলাম আমাকে ডাকতে।' বললাম, 'আপনি ঘুমোচ্ছিলেন বলে ডাকি নি।' উনি বললেন, 'আঃ! তাতে কি হয়েছে ? তুই খুব অন্যায় করেছিস।' আস্তে আস্তে নীচু গলায় বললাম, 'জানেন, একটু আগে একটা স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙ্গে গেল।' 'কি দেখলি বল্, বল্'–ওনার ধৈর্য্য আর ধরে না। স্বপ্নটা শুনে খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন। তখন বললাম, 'বাবা, এবার আমাকে বাড়ী যাবার অনুমতি দিন।' বললেন, 'কেন রে ? বেশ! বলছিস যখন, তখন যাবি। তবে খেয়ে দেয়ে যাস। তুই কেন এসেছিলি এখন বুঝতে পারছি। এই স্বপ্নটা দেখবি বলে।'

একদিন বাইরে সাইকেল রেখে ওনার ঘরে ঢুকছি। জিজ্ঞেস করলেন, কিসে এলি ? বললাম, 'সাইকেলে'। বললেন, 'সাইকেল কই ?' বললাম, 'বাইরে'। উনি বললেন, 'না, বাবা, সাইকেলটা বারান্দায় তুলে রাখ, যাতে খাট থেকে দেখা যায়। সাইকেল তুলে বললাম, 'অনেকের জুতোর উপর রাখতে হ'ল।' উনি বললেন, 'তা হোক–তবু চোখের আড়ালে রাখা ঠিক নয়।' ব্যবহারিক জগতেও উনি ছিলেন এমনি সাবধানী।

শ্রীজীতেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী ঃ

শ্রীজীবনকৃষ্ণের ইচ্ছায় আমি ওনার লেখা বই 'ধর্ম ও অনুভূতি'র প্রচ্ছদের পরিকল্পনা করেছিলাম। উনি প্রচ্ছদ দেখে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিলেন, 'বাবা জিতু, এ

দেশটা যদি ফ্রান্স হ'ত তাহলে এর জন্য তুই একটা প্রাইজ পেতিস।' ব্যাস্, ঐ আমার প্রাইজ পাওয়া হয়ে গেল। বিশেষ করে ওনার আউট লাইনের ভিতরে 'ধর্ম ও অনুভূতি' কথাটা লেখার জন্য প্রশংসা করেছিলেন।

এক শনিবার অফিস থেকে ফিরে আর ঠাকুরের ঘরে যেতে পারলাম না, খুব ক্লান্তি বোধ করলাম। বাড়ীতেই বসে আছি। হঠাৎ খুব মৃদুভাবে রামনাম গানের সুর ভেসে আসতে লাগল কানে। ক্রমে স্পষ্টই শুনতে পেলাম। এদিক ওদিক দেখলাম কিন্তু কোনদিক থেকে ঐ শব্দ আসছে কিছুতেই বুঝতে পারলাম না। এ বিষয়ে বাড়ীর অন্যদের জিজ্ঞাসা করে জানলাম, ওরা কিন্তু কোন গান শুনতে পাচ্ছে না। বেশ অবাক হলাম। পরদিন সকালে ঠাকুরের ঘরে ঢোকামাত্র উনি বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ রে, কাল রামনাম শুনেছিলি ?' বললাম, 'হ্যাঁ। কিন্তু কোথায় হচ্ছিল তা বুঝতে পারিনি।' উনি বললেন, 'কাল এখানে রামনাম বেশ জমেছিল। তুই তো আসিস নি, তোর কথা মনে হতেই তোকে দর্শন করলাম। আমি জিতু হয়ে গেলাম। তাই জিজ্ঞেস করছি, তুই রামনাম শুনেছিস কিনা, এতক্ষণে রহস্যের কিনারা হল, আমার মত সাধারণ সংসারী মানুষের প্রতি শ্রীভগবানের অপরিসীম কৃপার কথা ভেবে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। একত্ব (Oneness) কি মুখের কথা ?

আমি যখন সপরিবারে দার্জিলিং-এ এক মাসের জন্য বেড়াতে গিয়েছিলাম সঙ্গে ছিলেন ঠাকুরের স্নেহধন্য সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা যে হোটেলে উঠেছিলাম তার নাম 'আনন্দ ভবন'। ওখান থেকে চিঠিতে তাঁর কৃপায় আনন্দের মধ্যে দিন যাপনের কথা লিখে জানিয়েছিলেন। তাঁর কাছ থেকে পাওয়া সেই চিঠির উত্তর আমার জীবনে পরম সম্পদ। ওনার বয়স তখন ৬৮; লিখতে গেলে হাত কাঁপত। চিঠিটির প্রতিরূপ পাশের পাতায় দেওয়া হ'ল।

একবার ওনার ঘরে অদ্ভুত একটা কাণ্ড হয়েছিল। কথামৃতে নিরাকার ধ্যানের প্রসঙ্গ পড়া হচ্ছিল। উনি বললেন, 'আচ্ছা এখন পাঠ বন্ধ থাক। তোরা সকলেই আজ নিরাকার ধ্যান কর তো।' ধ্যান শুরু হল। একে একে সকলের ধ্যান ভাঙ্গলে উনি সকলকে আলাদাভাবে জিজ্ঞেস করলেন কিছু দর্শন হয়েছে কি'না। কী আশ্চর্য সেদিন ঘরে উপস্থিত ছিলেন প্রায় ৬০/৭০ জন। সকলেই ধ্যানে ওনাকে (শ্রীজীবনকৃষ্ণকে) দর্শন করেছেন বলে জানালেন। জানা গেল ওনার চিন্ময়রূপ এখন নিরাকারের তথা অরূপের রূপ। তিনি নির্গুণ ব্রহ্মের সাথে এক হয়ে গেছেন।

ওনার রোগটা (ক্যানসার) তখন সবে শুরু হয়েছে। উনি একদিন বললেন, আমি তো নিজের শরীরের দিকে তাকাইনা। তিনদিন একটানা ধ্যান করলে হয়ত রোগটা সেরে যাবে। ভক্তেরা যারা শুনল তারা তিনদিন কেউ ও বাড়ীতে গেল না। কিন্তু পরে গিয়ে

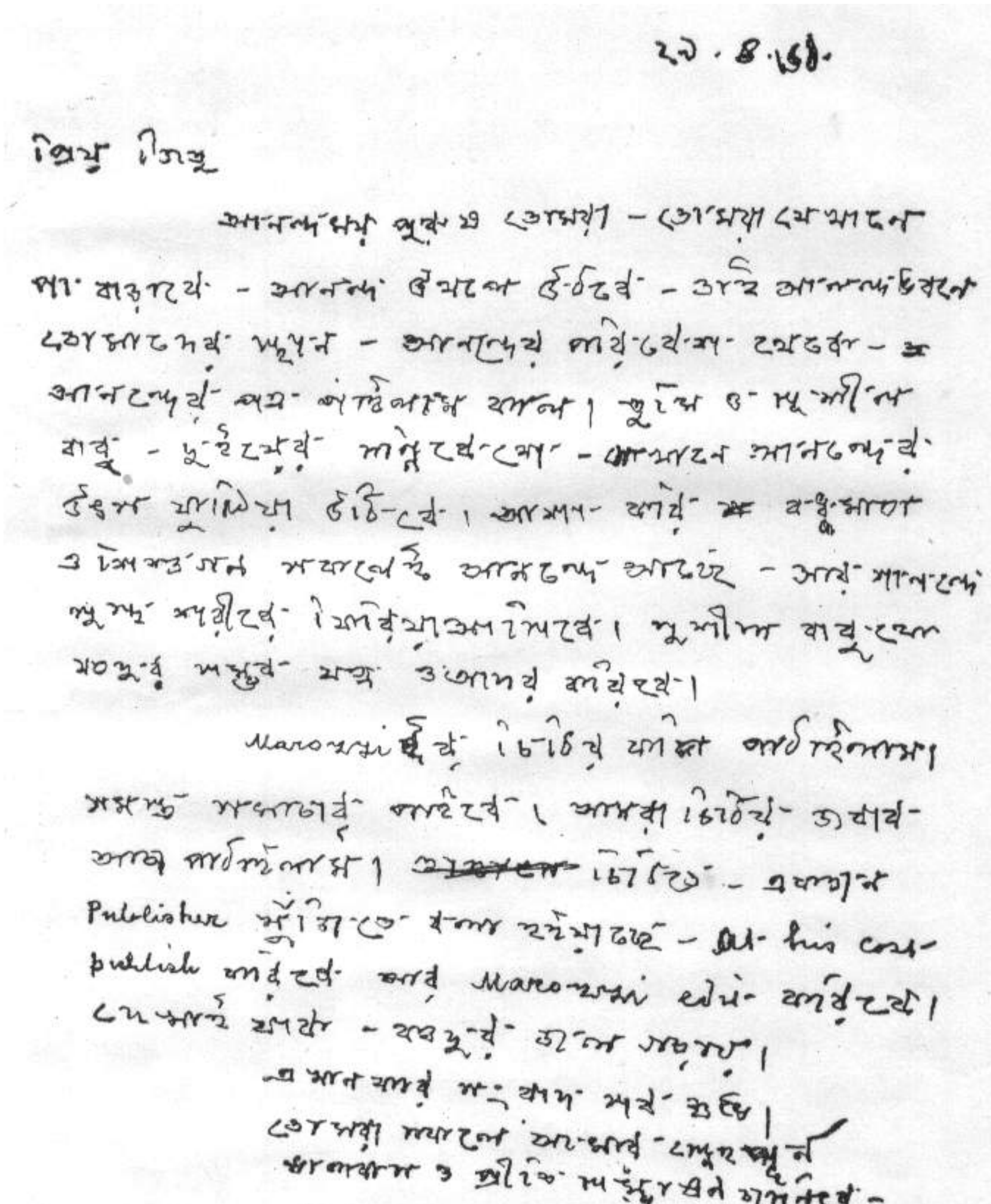

২৯.৪.৬৯।

প্রিয় জিতু

আনন্দময় পুরুষ তোমরা – তোমরা যে আসনে পা বাড়াবে – আনন্দ উপরে উঠিবে – তাই আনন্দ উপরে তোমাদের স্বপন – আনন্দের সাগরে ভেসে যেতে – আনন্দের সঙ্গ পাইলাম আজ। তুমি ও সুশীল বাবু – দুইজনে পাইবে যে – আমাদের আনন্দের উৎস খুলিয়া উঠিবে। আমাদের কাছে বন্ধুভাব ও নিজেদের সকলেই আনন্দে আছে – আর আনন্দে সুস্থ শরীরে বিরাজ করিবে। সুশীল বাবু-কে মেজদা-র মধুর স্বর ও জানাবে।

Marowari-দের চিঠির খবর পাইলাম। সমস্ত ব্যবস্থা করিবে। আমরা চিঠির উত্তর আজ পাঠাইলাম। [illegible] চিঠিতে – প্রকাশক Publisher খুঁজে বের করিয়াছে – At his cost publish করিবে আর Marowari edit করিবে। সেখানে থাকে – প্রভুর তাল সময়।

এখানকার সংবাদ সব ভাল।
তোমরা আমার অশেষ স্নেহপূর্ণ
ভালবাসা ও প্রীতি শুভেচ্ছা জানিবে –
ইতি
শ্রী জীবন কৃষ্ণ।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা শ্রীজীবনকৃষ্ণের স্বহস্তে লেখা চিঠির প্রতিলিপি।

জানলাম উটকো লোক এসে ওনাকে জ্বালিয়েছে এই ক'দিন। কবে কোথায় শুনেছে ওনার কথা, এখন তাদের সময় হয়েছে ঠাকুরের কাছে আসার। জগত তাঁকে তিনটে দিনও সময় দিল না।

শ্রীজীবনকৃষ্ণকে মাঝে মধ্যে বলতে শুনেছি–'আমি খুব নিষ্ঠুর, আমার দয়া নেই।' ১৯৬২ সালে পুরীতে একদিন ঠাকুর বসে আছেন বাইরের দিকে। রাস্তায় হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে এক ক্ষতগলিত বিকলাঙ্গ ভিখারী। দয়াময় ঠাকুরের চোখ পড়ল তার উপর। অন্তরে দেখতে লাগলেন তাকে, তারই রূপ ফুটে উঠল ভিতরে। এ কথা ঠাকুরের মুখ থেকে শুনে মনে হল জগতে কোথাও যার ঠাঁই নেই তার আশ্রয় করুণাঘন শ্রীজীবনকৃষ্ণের অন্তরে। হে ভগবান, হে দয়াময়, তুমি বল তোমার নাকি দয়া নেই!

শ্রীঅমূল্য ঘোষ ঃ

বন্ধুরা বলা সত্ত্বেও আমি কদমতলায় শ্রীজীবনকৃষ্ণের কাছে যেতে চাইনি। পরে একদিন স্বপ্নে দেখলাম—সস্ত্রীক কদমতলায় গেছি। একটি ঘরের সামনে গিয়ে স্ত্রীকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে আমি ভিতরে ঢুকলাম। ঘরে ঢুকতেই খাটের উপর বসে এক ভদ্রলোক 'আয় বাবা, আয়'—বলে ডাকলেন। এগিয়ে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলাম। দেহমন আনন্দে ভরে উঠল। ঘুম ভাঙল। পরদিন বন্ধুদের বললাম, 'চল্ যাব কদমতলায়।' গিয়ে তো হতভম্ব হয়ে গেলাম। স্বপ্নে দেখা রাস্তা, বাড়ী, বাড়ীর লোক, সব হুবহু মিলে যাচ্ছে বাস্তবের সঙ্গে। শ্রীজীবনকৃষ্ণকে স্বপ্নটি বললাম। উনি বললেন, 'কী বুঝলি ?' বললাম, 'কিছুই বুঝিনি। শুধু অবাক হচ্ছি এই ভেবে যে স্বপ্নে যা দেখলাম তা বাস্তবে পুরোপুরি মিলে গেল কী করে ?' উনি বললেন, 'স্বপ্ন যে সত্য বাবা।' ক'দিন পর আবার গেছি। ঘরে ঢোকামাত্র বলে উঠলেন, 'Why have you come here again ?' আমার মুখ থেকে সহসা উত্তর ছিটকে বেরিয়ে এল যেন। গলা চড়িয়ে বললাম, 'Because I have been continuously attracted by the world personality.' নিজের কথা শুনে নিজেই অবাক হয়ে গেলাম। উনি শান্ত গলায় বললেন, 'বস্'।

একদিন জীবনকৃষ্ণ বললেন, Bachelor মানে কি জানিস ? Bachelor মানে শুধু অবিবাহিতকে বোঝায় না, Bachelor মানে যে কারও কোন সাহায্য নেয় না, সেবা নেয় না। বাবা, মানুষের দেহ এমনই যে একটা সেবা নিলে পরক্ষণে আর একটা সেবা নেবার ইচ্ছা জাগে।

জীবনকৃষ্ণের ঘরের কোনও লোকের (ভক্ত) সঙ্গে জীবনকৃষ্ণ নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা করলেই কদমতলায় ওনার কাছে ছুটে যেতে ইচ্ছা হত। একদিন একথা ওনাকে বলেছিলাম। উনি শুনে বললেন, শুদ্ধ মনে একমাত্র ব্রহ্মের চিন্তা জাগে। যখন এখানে আসার ইচ্ছা জাগবে, জানবি শুদ্ধমন হয়েছে।

শ্রী অরুণ ঘোষ ঃ

ব্যষ্টির সাধনকালে শ্রী জীবনকৃষ্ণ শ্রীরামকৃষ্ণকে কঠোরভাবে অনুসরণ করতেন। জগন্নাথের আট্‌কে প্রসাদ না খেয়ে উনি ভাত খেতেন না। যেহেতু রামকৃষ্ণদেব তাই করতেন। একবার আট্‌কে ফুরিয়ে গেল। রাতারাতি রঘুদা রেলের পাশ নিয়ে পুরী গিয়ে আট্‌কে প্রসাদ এনে দিলেন তবে রক্ষা!

আমার ভাইপো (গোবিন্দ) তখন ক্লাস টেনে পড়ে। মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। কিন্তু আমার সাথে একদিন কদমতলায় গিয়ে শ্রীজীবনকৃষ্ণের দর্শন লাভ করার পর থেকে ও পড়াশুনো ছেড়ে শুধু শ্রীজীবনকৃষ্ণের চিন্তা ও ধ্যান করে সময় কাটাতে লাগল। আমি বোঝাতে গেলে আমাকে উত্তর দিল, 'ভগবান এত করেছেন আর দু'মুঠো ভাতের যোগাড় করে দেবেন না ?' সব শুনে জীবনকৃষ্ণ বললেন, 'ওকে বলিস এত কিছু থাকতে ভগবানের কাছে দু'মুঠো ভাত চাইবে ?' জীবনকৃষ্ণের এই কথা শুনে ভাইপোর মনে বিরাট পরিবর্তন এল। মন দিয়ে পড়াশুনো করতে লাগল। সেই ছেলে এখন পাস করে বড় চাকরী করছে আর অবসর সময় কাটায় জীবনকৃষ্ণ অনুধ্যানে।

একবার এক ভদ্রলোক তার মেয়েকে নিয়ে এসেছেন। দু'জনে ঘরে ঢুকে পূর্বদিকের কোণে চুপচাপ বসেছেন। কিছুক্ষণ পর দেখলাম ঐ শীতেও জীবনকৃষ্ণ ঘামতে শুরু করলেন। চাদর খুলে ফেললেন। তারপর জামা খুলে ফেললেন। রঘুদা কারণটা বুঝতে পেরে হাত ঈশারা করে ঐ ভদ্রলোককে চলে যেতে বললেন। ভদ্রলোক উঠলেন। মেয়েটি দরজার কাছে এসে হাতজোড় করে জীবনকৃষ্ণকে প্রণাম জানাল। উনি কেঁপে কেঁপে উঠলেন আর বুকের কাছে হাত দুটি জোড় করে বললেন, 'অপরাধ নিস নি। কি করব মা, ঠাকুর আমায় এই অবস্থায় রেখেছেন।' আবার ওরা চলে যেতেই অন্য মূর্তি ধরলেন। গম্ভীর গলায় বললেন, 'এসব কি আমার জন্য নাকি ? ওরে এ সব তোদের জন্যে।'

শ্রীরবীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী ঃ

হীরুবাবুর সাথে ওর বাড়ীওয়ালার ঝগড়া হয়েছিল। শেষে মামলা শুরু হ'ল। উনি সেকথা শ্রীজীবনকৃষ্ণকে বলেন নি। একদিন ওনার ঘরে হীরুবাবু একটি স্বপ্ন বললেন। তিনি নাকি এক ইউরোপীয়ান জজকে উৎফুল্ল হয়ে কথা বলতে দেখেছেন। জজের চেহারার বর্ণনা শুনে শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, 'তুই international judge ড্যানিয়েলকে দেখেছিস। তোর কি কোন মামলা চলছে রে ?' হীরুবাবু বললেন, 'হ্যাঁ'। উনি বললেন, 'মামলায় তুই জিতবি।' বাস্তবে তাঁর কথা সত্যি হয়েছিল।

তখন ঠাকুর এ বাড়ীতে আছেন (শ্রীরামপুরে)। একদিন বিকেলে ওনার প্রচণ্ড পেটে যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। যন্ত্রণায় মুখ কালি হয়ে গেছে। কিন্তু যতক্ষণ ভক্তেরা ছিল

ততক্ষণ কিছু প্রকাশ করেন নি। সকলে চলে গেলে আমাকে ডাক্তার ডাকতে বললেন। বললাম, 'এতক্ষণ বলেন নি কেন ?' উনি বললেন, 'বললে সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ত, তাই বলিনি।' স্থানীয় এক ইয়ং (তরুণ) ডাক্তারকে ডেকে আনলাম। নাম শিশির দত্ত। ওর ওষুধ খেয়ে ওনার যন্ত্রণার দ্রুত উপশম হ'ল।

ওনার অসুখে বেশ খরচা হতে লাগল। ওনার টাকা জমা থাকত জিতেনবাবুর মাধ্যমে হাওড়া মোটর কোম্পানীতে। উনি জিতেনবাবুকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন খুব বেশী টাকা আর জমা নেই। গম্ভীর হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। বললেন, 'হ্যাঁরে শেষ বয়সে কি অন্যের কাছে হাত পাততে হবে নাকি রে ? ঠাকুর এ কী করলেন! এর চেয়ে হাজার পাঁচেক টাকা খরচ করে অপারেশন টেবিলে দেহটা যায় তো যাক্। বাস্তবে অপারেশনের পর মাত্র দেড় মাস তার দেহ থাকল।

শ্রী হিমাংশুভূষণ দাস ঃ

ওনার কাছে যাবার কিছুদিন পর দারুনভাবে কুণ্ডলিনী জাগরণ শুরু হ'ল। স্থূলে কুণ্ডলিনী জাগরণের ধাক্কা সামলাতে না পেরে কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়লাম। উনি বললেন, তুই এখন পাঠে আসিস না। সংসারে কাজের মধ্যে ডুবে থাকবি। মাঝে মাঝে সিনেমা দেখবি। তবে ইংরাজী বই দেখবি। আমার কাছে এখন আসবি না। কিছুদিন পর ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলাম। হঠাৎ একদিন স্বপ্নে একটা দর্শন হয়ে প্রচণ্ড জোরে কুণ্ডলিনী জাগরণ হ'ল, দেহ তোলপাড় করতে লাগল। ঘুম ভাঙল। ভয় পেয়ে গেলাম। আবার মাথায় গণ্ডগোল হয়ে যাবে নাকি ? জল খেয়ে শুয়ে পড়লাম। এবার স্বপ্নে শ্রীজীবনকৃষ্ণের দেখা পেয়ে ওনাকে বললাম, 'জানেন, একটা অনুভূতি হয়ে আবার দেহ তোলপাড় হতে লাগল। আবার কি আগের মত হয়ে যাব নাকি ?' উনি তখন শিরদাঁড়া বরাবর হাত বুলিয়ে দিলেন। বললেন, 'যা, সব ঠিক হয়ে যাবে।' পরদিন ওনার ঘরে গিয়েছি, দেখি উনি বলছেন, 'স্বপ্নে যদি আমি কাউকে সুস্থ হবার কথা বলি তাহলে তা হয়ে যাবে।' অমনি আমার গতরাত্রের অনুভূতির কথা মনে পড়ল। কিন্তু কিছু প্রকাশ করলাম না।

জিতেনদা, ভোলাদা ও কালীবাবুর পর পাঠ করতে বেরোবার জন্য আমাকে আদেশ করলেন। আমি ভয় পেয়ে বললাম, 'আমি কি পারব ?' উনি বজ্রগম্ভীর কন্ঠে বললেন, সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়, আমি আছি না!' পরদিন ঘুম থেকে উঠে ভোরবেলা দেখছি আপনা হতে আমার মুখ দিয়ে বৈদিক শ্লোক বেরোচ্ছে। আমি পাঠে বেরোবার পর উনি বললেন, 'আর আমার পাঠকের অভাব হবে না।'

ধীরেনদা (রায়) খুব বড় চাকরী করতেন। উনি কলকাতা থেকে দিল্লী বদলী হয়ে গেলেন। একদিন শ্রীজীবনকৃষ্ণকে বললেন, 'ভাবছি চাকরিটা ছেড়ে দেব। তা না হলে

আপনার সঙ্গ করার সুযোগ পাচ্ছি না।' শ্রীজীবনকৃষ্ণ তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'আমি তো বাবা অত বড় চাকরী দিতে পারব না।'

শ্রীরামপুরে শ্রীজীবনকৃষ্ণ আছেন। আমি দেখা করতে গেছি। দেখি সিঁড়িতে মানিকবাবুর মেজ নাতনী ও নাত জামাই দাঁড়িয়ে। নাতনী বলল, দাদুর সংগে দেখা করতে এসেছি একটু বলে দেবেন ? উপরে উঠে (দোতলায়) শ্রীজীবনকৃষ্ণকে সব জানালাম। উনি বললেন, 'না, হবে না। ও আমার বড় আদরের, কিন্তু ও বড় হয়েছে এখন।' একথা শুনে নাতনী কাঁদতে লাগল। নাতনী কাঁদছে শুনে একটু নরম হয়ে বললেন, 'তবে জামাইকে আসতে বল্।' শুধু জামাইয়ের সঙ্গে দেখা করলেন। কী কঠিন জীবন।

একদিন জীবনকৃষ্ণ বাইরে পেচ্ছাব সেরে ঘরে ঢুকতেই গম্ভীর স্বরে বললেন, দ্যাখ, আমি অষ্টমভূমি দেখেছি। অষ্টমভূমি থেকে আমি গোটা পৃথিবী তোলপাড় করে দিতে পারি।'

শ্রীভোলানাথ মুখোপাধ্যায় ঃ

একবার আমি ট্রামে চড়ে যাচ্ছিলাম সিনেমা দেখতে। চলন্ত ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে পড়ে গেলাম। এমন শব্দ হ'ল যে আমি ভাবলাম আমার নিশ্চয়ই পা ভেঙে গেছে। কিন্তু পড়ার মুহূর্তে কে একজন আমাকে জড়িয়ে ধরল বলে মনে হল, তাই ধাক্কাটা জোরে লাগেনি। লাগলে হয়ত মারাই যেতাম। তারপর স্পষ্ট জীবনকৃষ্ণের কন্ঠস্বর শুনতে পেলাম, 'বাবা, এমনি করে নামিস না।' কিছুক্ষণ পর যখন উঠে দাঁড়ালাম তখন পাশে কাউকে দেখতে না পেয়ে সিনেমার টিকিটটি ছিঁড়ে ফেলে সোজা জীবনকৃষ্ণের ঘরে চলে গেলাম। উনি বিছানায় শুয়েছিলেন। আমি গিয়ে ওনার পা টিপতে গেলাম। উনি পা সরিয়ে নিলেন, বললেন, 'তোর কি হয়েছে ?' আমি বললাম, 'আমাকে ওভাবে বাঁচাতে গিয়ে আপনার লাগেনি তো!' উনি বললেন, 'আমি তো ঘুমোচ্ছিলাম বাবা! এইমাত্র উঠলাম। আমি তো কিছুই জানি না। কী হয়েছে তাই বল!' সব খুলে বললাম। শুনে বললেন, 'ঠাকুর যে কী লীলা করছেন তোদের নিয়ে, তা আর কী বলব বাবা।'

কদমতলায় জীবনকৃষ্ণের কাছে যাচ্ছি। পথে বাসে এক সুন্দরী মহিলার দিকে দৃষ্টি পড়ল। যথার্থই সুন্দরী। ভাল লাগল। তবে সে ঐ মুহূর্তকালের জন্য। পরে ভুলে গেছি। ঘরে ঢোকা মাত্র জীবনকৃষ্ণ গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন, 'ভোলা, পথে যাতায়াতের সময় এদিক ওদিক তাকাবি না। নে বস্। আমি তো ভেবে পাচ্ছি না, কেন উনি এরকম বললেন। অনেক পরে ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। তখন আর বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা রইল না। প্রসঙ্গত বলে রাখি জীবনকৃষ্ণ সর্বদা ঘাড় নামিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে সোজা হনহন্ করে পথ হাঁটতেন।

শ্রীঅনিলকৃষ্ণ নাথ ঃ

একদিন স্বপ্নে দেখলাম মানিকবাবু যেন হৃদয় মুখুজ্জে, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগনে। আমি ওনাকে বলছি—'আগের জন্মে আপনি রামকৃষ্ণকে অনেক কষ্ট দিয়েছেন এ জন্মেও জীবনকৃষ্ণকে কষ্ট দিচ্ছেন। আগের জন্মের মতো এ জন্মেও আপনাকে শাস্তি পেতে হবে।' পরদিন এই স্বপ্ন আমি শ্রীজীবনকৃষ্ণকে বলেছিলাম। উনি খাটে বসেছিলেন। শুনে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। পরে ভাবজড়িত ব্যথিত কন্ঠে ক্রমাগত বলতে লাগলেন, 'না বাবা, ওকথা বলিস নি বাবা, ও কথা বলিস নি...।'

শ্রীক্ষিতিশ রায় চৌধুরী ঃ

চাকরীটা এমন ছিল যে ঘন ঘন অফিসিয়াল ট্যুরে (official tour-এ) যেতে হ'ত। একদিন আমার অনুপস্থিতিতে রাধুদাকে উনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'হ্যাঁ রে, ক্ষিতীশের খুব কষ্ট না রে! প্রায়ই তো tour-এ যায়। বাইরে ভাল খাওয়া দাওয়া হয় ?' রাধুদা বলেছিল, 'তাই কি হয় ? কিন্তু কি করবে, চাকরী তো ছাড়া যায় না।' উনি শুনে বললেন, 'আহা রে, ওর খুব কষ্ট।' পরদিন রাধুদা আমাকে বলল, 'খুব তাড়াতাড়ি তোমার ট্রান্সফার অর্ডার আসবে দেখো।' আমি হেসে বললাম, 'তাই আবার হয় নাকি ? অসম্ভব ব্যাপার।' কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই সেই অসম্ভব সম্ভব হ'ল। এক অফিসারের কুনজরে পড়ায় ডিপার্টমেন্টের একজনকে আমার পোস্টে ট্রান্সফার করে আমাকে তার পোস্টে পাঠিয়ে দিলেন ঐ অফিসার। তারপর থেকে আর অত ঘুরতে হ'ত না।

উনি তখন পুরীতে ছিলেন। আমি গেলাম ওনার কাছে দু'দিন বেড়াতে। আমাকে দেখে কী আনন্দ ওনার। বিকেল বেলা বেড়াতে নিয়ে গেলেন। উনি হলেন গাইড। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রতিটি জায়গা দেখাতে লাগলেন প্রাসঙ্গিক ইতিহাস বিবৃত করে। একটি বড় পাতকূয়ো, মাঝখানে পার্টিশান। এদিকে যে চান করবে সে অপরদিকে যদি কেউ চান করে তাকে দেখতে পাবে না। বললেন, 'এই হ'ল ভাসুর-ভাদরবৌ ঘাট। একই কুয়ো থেকে ভাসুর ও ভায়ের বৌ একসাথে চান করতে পারে। আমি বললাম, 'এমন ট্যুরিস্ট গাইড পাওয়া বহু ভাগ্যে হয়।' উনি হেসে উঠলেন।

শ্রীআনন্দমোহন ঘোষ ঃ

একবার জীবনকৃষ্ণের ঘরে বাইরের রকে দাঁড়িয়ে ভক্তদের দু'একজন বাজার দর ইত্যাদি নিয়ে কথা শুরু করেছেন। জীবনকৃষ্ণের কানে দু'একটা কথা যেতেই উনি হাতমুখের এক অপূর্ব ভঙ্গী করে বললেন, 'বাবা, আলু পটল হাঁ করেই আছে, এই ঘর থেকে বেরোন মাত্র গপ্ করে গিলে ফেলবে।'

জীবনকৃষ্ণ তখন অসুস্থ। হাসপাতালে আছেন। আমি কিছুতেই অফিসের কাজে

মন বসাতে পারছি না। দুপুর বেলা, দেড়টা দুটো হবে। বাইরে রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে। আমি অফিস ছেড়ে হাঁটতে হাঁটতে হাসপাতালে গেলাম। সুশীলবাবুর নির্দেশে রামকৃষ্ণবাবু কাউকে ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে দিতেন না। উনি যে কেবিনে ছিলেন তার দরজার সামনে দাঁড়াতেই রামকৃষ্ণবাবু ঈশারায় আমাকে চলে যেতে বললেন। এমন সময় একটা দমকা বাতাসে দরজার পর্দা উপরে উঠে গিয়ে আটকে গেল। ঠাকুর জীবনকৃষ্ণ তখন বিছানায় বসেছিলেন। ওখান থেকে সরাসরি আমাকে দেখতে পেয়ে গেলেন। বললেন, 'আয় বাবা, আয়'। উনি স্বয়ং ডেকেছেন, সুতরাং রামকৃষ্ণবাবু আর আটকাবার চেষ্টা করলেন না। ওনার কাছে গিয়ে বসলাম। কি কি ওষুধ খেয়েছেন, কি ইঞ্জেক্সন্ নিয়েছেন সব বললেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা পেনিসিলিন ইঞ্জেক্সন্ কিভাবে কাজ করে বলতে পারিস ? বললাম, 'রক্তের মধ্যে দিয়ে গিয়ে ক্ষতস্থানের জীবাণু নাশ করে। এর আয়ুষ্কাল মাত্র বারো ঘন্টা। তারপর এরা মারা যায়।' উনি বললেন, 'ঠিক তাই! এক ঘন্টা আগে আমার দেহের যে অবস্থা ছিল এখন তা বদলে গেছে। যোগ মানে এই ক্রমাগত পরিবর্তন। কি অপূর্ব এই যোগ বলতো!' এইভাবে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে উনি আলোচনাকে আত্মবিদ্যার গভীরে নিয়ে গেলেন।

শ্রীরঘুনাথ সেন ঃ

খাটের এককোণে পা গুটিয়ে বসে দীর্ঘক্ষণ ধরে প্রায় ৭/৮ ঘন্টা একটানা ব্যাখ্যা আলোচনা করার পর যখন খাট থেকে নামতেন তখন সহজে পা সোজা করতে পারতেন না, বেশ কষ্ট হত। মাঝে মাঝে বলতেন, 'ওরে, দেহটা পাথরের হলে ফেটে যেত। নেহাৎ মাংস আর চামড়া বলে এখনও বেঁচে আছি।'

তিনমাস ধরে একটানা একজন বুড়ো মানুষের সেবা করছি দেখে একদিন একজন নার্স আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, 'উনি আপনার কে হ'ন ?' আমি উত্তরে বললান, 'উনি আমার বন্ধু!' নার্সটি বলল, তাই আবার হয় ? জীবনকৃষ্ণ হরলিক্স খাচ্ছেন–এই সময় কথাপ্রসঙ্গে ওই কথাগুলি আমি ওনাকে বললাম। শোনামাত্র ওনার সারা শরীর দুলতে লাগল। হাতে গ্লাসটা ধরা আছে। আর উনি আবেগভরা কন্ঠে বলতে লাগলেন, ''হ্যাঁ বাবা, বন্ধুই তো, এমন বন্ধু কোথায় পাবি ?''

দীর্ঘ ৩ মাস হাসপাতালে ছিলেন। এর মধ্যে বেশ কিছু ডাক্তার, নার্স এমনকি লিফ্টম্যানও স্বপ্নে জীবনকৃষ্ণকে দেখতে লাগল।

একদিন একজন নার্স বলল, 'বাবা, আপনাকে একটু স্তোত্র শোনাব ?' উনি বললেন, 'শোনাবি, বেশ শোনা মা।' নার্সটি ওনার দিকে মুখ করে হাঁটু গেড়ে হাত জোড় করে স্তোত্রপাঠ করতে লাগলেন। খুব জোরে জোরে বলছেন অথচ উনি তখন on duty, স্তোত্র আওড়াচ্ছেন আর অঝোর ধারায় দু'চোখ বেয়ে জল পড়ছে নার্সটির।

ঠাকুর ঐ অসুস্থ অবস্থায় হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রইলেন—যতক্ষণ স্তোত্র পাঠ হ'ল—সে প্রায় আধ ঘন্টা ধরে। পাঠ শেষ হলে নার্সটি কাঁদতে কাঁদতে চলে গেলেন। উনি বলে উঠলেন, 'এ কি করলি মা, এ কি করলি! তুই যে এটা মন্দির বানিয়ে দিলি!'

কাশীতে মাসখানেক থাকার পর ওনার খুব শরীর খারাপ হ'ল। খেতেও পারছেন না ভাল করে। একদিন রাত্রে বিছানায় শুয়ে ছটফট করছেন। বাবা! আঃ! উঃ- করছেন। আমি ঐ একই ঘরে আছি। উনি খাটে আর আমি মেঝেতে বিছানা পেতে শুয়েছি। ওনার কাতরানি শুনে আমারও ঘুম হচ্ছে না। বললাম, 'একটু মাথাটা টিপে দেব ?' উনি সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'না বাবা, আমার কিছু হয় নি, আমি ঠিক আছি! তুই ঘুমো।' পরদিন হ'ল কী, আমার পেট ছাড়ল। ৪-৫ বার পায়খানা হ'ল। উনি আমাকে ডেকে বললেন, 'আয় বাবা, এখানে আয়'। নিজের বিছানায় আমাকে শোয়ালেন। তারপর মাথার কাছে বসে অনেকক্ষণ ধরে আমার মাথা টিপে দিলেন, গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন।

একবার ডাক্তার বলল, দেখুন, উনি সবসময় চিৎ হয়ে রয়েছেন, এক কাজ করুন, মাঝে মাঝে ওনাকে পাশ ঘুরিয়ে দেবেন, উপুড় করে দেবেন। আমি হাসি-গল্প করতে করতে ওনাকে কথাটা বলতেই উনি যেন ভূত দেখার মত চমকে উঠলেন। বললেন, 'কী বললি ? জানিস, আমি জীবনে কখনো উপুড় হইনি, ও আমি পারব না।' ওনার ভাবান্তর ও এই মন্তব্যে আমি বিহ্বল হয়ে পড়লাম। ঘটনাটা ধীরেনদাকে (রায়) বলেছিলাম। উনি বললেন, 'আরে! এ তো অদ্ভুত কথা!' তারপর একটা বই খুলে আমাকে দেখালেন যে হিন্দুশাস্ত্রে বলছে- শিব কখনও উপুড় হন না!

———— : ————

শ্রীজীবনকৃষ্ণ বন্দনাগীতি

প্রেমমুদিত মনসে কহ জীবনকৃষ্ণ নাম।
জীবনকৃষ্ণ নাম, জীবনকৃষ্ণ নাম, জীবনকৃষ্ণ নাম॥
পাপ কাটে দুঃখ মেটে লহত মধুর নাম।
মাতা পিতা বন্ধু ভ্রাতা পরম ভগবান॥
জীবনকৃষ্ণ পরশে পাইবি শান্তিনিকেতন।
জ্ঞান নেত্রে ভাতিবে আপনি স্বয়ং ভগবান॥
আনন্দ মূরতি জীবনকৃষ্ণ পরম করুণাবান।
ব্রহ্মানন্দ লভিতে স্মরণ করহ মধুর নাম॥
ভব সমুদ্র পারের মর্শি দয়াল ভগবান।
দরশ পরশ কারণে স্মরহ জীবনকৃষ্ণ নাম॥
ভ্রান্তি ঘুচিবে শান্তি লভিবে লহত মধুর নাম।
পরম শান্তি সুখদায়ক জীবনকৃষ্ণ নাম॥
মন্দির মসজিদ মাঝে নাইরে ভগবান।
লীলাময়ের লীলাধার মানব দেহধাম॥